রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা

(AN INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE)

[কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর ত্রি-বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।]

সুব্রত গুপ্ত
(যোগমায়া দেবী কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

এস. গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৫৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

আর. গুপ্ত

এস্. গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স

বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৬০

মুদ্রাকর

বঙ্কিমবিহারী [illegible]য়

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৭।এ [illegible]লাই সিংহ লেন,

কলিকাতা-৯

THREE-YEAR DEGREE COURSE

Syllabus in Political Science

Political Theory

Paper—I

Definition and scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences—Methods of Political Science—Definition of State—Differences between State, Government and other Associations.

Leading Theories of the origin and nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of Force—Theory of Social Contract—Views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary theory of the origin of the State—Organic Theory about the nature of the state.

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De jure and De facto Sovereignty, Doctrine of Popular Sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of limited Sovereignty—Attacks on the Monistic Theory of Sovereignty.

Definition and Nature of Law—Different kinds of law—Sources of Law—Distinction and relation between law and morality—Relation between law and liberty—the concept of liberty—Safeguards of liberty in a modern state—concept of Natural law and Natural Right.

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential elements of Nationality—Right of self-determination—Mononational stae vs. Poly-national State—Danger of Nationalism and Internationalism.

Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—Rights and duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and Duties. Unions of States and Forms of Governments—Personal and Real Union—Confederation and Federal Union—Nature and types of Federation—Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance—Distinction between unitary and Federal Governments.

Forms of Governments—Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy—Types of Democracy—Strength and weakness of Democracy—Comparison between Democracy and Dictatorship—conditions essential to the success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governmets—Their Strength and Weakness.

Structure of Governments—Organisation and functions of Legislature—Executive and Judiciary—Bi-cameralism—its merits and defects—Separation of Powers. Functions of Government—Individualism and Socialism—their comparative merits and defects—Types of Socialism. Constitution—Different kinds of constitutions—their strength and weakness. Party system—Its advantages. Two-Party system vs. Multiple Party system—one Party Rule.

Public Opinion--Its nature and importance in Popular Government—Agencies for formation of Public Opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of minority representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and his constituency.

***For North Bengal University students.**

League of Nations—Its organs—Its working.

United Nations—Its organs—Its purposes and principles—Its working.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Subject-Matter of Political Science and Methodology of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject-matter of Political Science)—আধুনিক লেখকগণ 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Political Theory) এবং 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র (Political Science) মধ্যে পার্থক্য লইয়া প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন; এই দুইটির মধ্যে কোথায় পার্থক্য তাহা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। আমরা ইহা বলিতে পারি যে রাষ্ট্রতত্ত্ব হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা কতিপয় সাধারণ নীতি নির্ধারণের কাজে ব্যাপৃত। এই নীতি নির্ধারণের কাজে রাষ্ট্রতত্ত্বের বিশেষজ্ঞকে অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের উপরও নির্ভর করিতে হয়। কোন কোন লেখক ক্ষমতা-বিশ্লেষণের (Power-analysis) মাধ্যমে রাষ্ট্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,[১] এই লেখকদের মধ্যে ম্যারিয়াম (Merriam), লাসওয়েল (Lasswell) এবং ক্যাট্‌লিন (Catlin) অন্যতম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) একটি শাখা। সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে রাজনৈতিক জীবন তাহা আলোচনা করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। সাম্প্রতিক ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র ছাড়াও যে সকল বিষয় মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।[২] রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত যোগাযোগ আছে মানুষের জীবনের এই জাতীয়

১। "Politics as Power consists fundamentally of relationships of superordination and subordination of dominance and submission of the governors and the governed. The study of politics is the study of these relationships." V.O. Key, Jr. "Politics, Parties, and Pressure Groups." P.5.

২। "Political Science concerns itself with the life of men in relation to organised States, we cannot omit from the field of relevant interest whatever may affect that life."

—H. J. Laski. On Study of Politics

কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করা চলে না। শুধু রাষ্ট্রই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইবে তাহা নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের সম্পর্ক, সবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান কালের কোন রাষ্ট্রের কাঠামো বিশ্লেষণ করিতে হইলে অথবা রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অতীত যুগের এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থারও আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা হইতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই নীতি বহির্ভূত হইতে পারে না। দেশের পরিবর্তনশীল জনমত এবং অভীপ্সার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া রাষ্ট্রতত্ত্বগুলিকেও পুনর্মার্জিত করিতে হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বিবর্তনশীল, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কখনই স্থির থাকে না বলিয়া সমকালীন ধারা ও নীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের উচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত। আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া জানিতে পারি তাহা কিভাবে সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে মানুষের অনেক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যারও সুমীমাংসা করা যায়। রাজনৈতিক জীবনের সহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নিবিড় সম্পর্কের কথা সুবিদিত। সামাজিক জীবনে একটি মানুষ কিভাবে আদর্শ নাগরিক হইতে পারে এবং কিভাবে দৈনন্দিন বহুবিধ সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গে কিভাবে সুন্দর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে—তাহা আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক অনুশীলন করিয়া জানিতে পারি। সুতরাং শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করাই নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার যে একটা বাস্তব উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সার্থকতা

সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়া যে বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাহাকেই আমরা বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি, এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দিক্ অনুশীলন করে। ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্র কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতি এবং অনুসৃত কর্মসূচী, অতীতের

রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা ও তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। অতীতকে বাদ দিয়া বর্তমান সম্পর্কে তো কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়-ই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না।[১] সেইজন্য ইতিহাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা দরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করিবার সময় আমাদের তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে ; যথা—(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমান অবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করিবে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করিবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি—অতীত ও বর্তমানের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি (Politics) শব্দটির উৎপত্তি গ্রীস দেশে। গ্রীক্ শব্দ "Polis" হইতে এরিস্টটল "Politics" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। "Politics" শব্দটির অর্থ শহর। তখন প্রতিটি শহর একটি রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি রাষ্ট্রশাসনের রীতিনীতি। রাষ্ট্রনীতি আবার তত্ত্বগত (theoretical) অথবা ব্যবহারিক (Practical) হইতে পারে। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, মূলভিত্তি, প্রকৃত ক্ষমতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রের কাজ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা ছাড়াও কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্ক যুক্ত। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানরূপে অভিহিত করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) এক জিনিস নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিক হইতে রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা ব্যাপক। রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক আছে এই প্রকার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করাই রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু, রাষ্ট্রদর্শন বলিতে আমরা নিছক রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা বুঝিয়া থাকি। রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শও (Political ideologies) রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (Political ideals) এবং রাষ্ট্রতত্ত্বও (Political theories) এক জিনিস নয়।

রাষ্ট্রদর্শনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের শাসননীতি সম্পর্কিত আলোচনাও করিয়া থাকে।

১। "One cannot properly grasp the meaning of the present—still less can one chart a course of action for the future—without dealing with the past : Lipson" The Great Issues of politics.

প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। রাষ্ট্রদর্শন এবং তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাব অন্তর্ভুক্ত। আবার, যেসব নীতি এই ভিত্তির মূলে থাকে সেইগুলি গবেষণা রাষ্ট্রদর্শনের অংগীভূত। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি, ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন—সব কিছুই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন করে। রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা; সেই ধারণাগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে। রাষ্ট্রদর্শনে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির দার্শনিক তাৎপর্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা কতিপয় আদর্শ এবং ধ্যান-ধারণার সহিত যুক্ত থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ননীতি আলোচিত হয়। কোন অবলম্বিত নীতি ভাল অথবা মন্দ কিনা, কিংবা কিভাবে কোনও অনুসৃত নীতি আরও ভাল করা যাইতে পারে, কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক নীতি অথবা সিদ্ধান্ত আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে, ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনও ইহাদের কর্মসূচী মানুষকে কতটা সুখী করিতে পারিয়াছে তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মানবজাতির ভবিষ্যৎ বহুলাংশে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী ও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন আলোচনায় সেইগুলি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। এইভাবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষ ব্যাপক হইয়াছে।

ফরাসী চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত না করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি (Political Sciences) হিসাবে অভিহিতকরিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় অনেকগুলি শাস্ত্র আছে ;— যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন (International Law) এবং শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাস (Constitutional History) ইত্যাদি। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকগুলি শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? (Is Political Science a Science ?)

যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ কতিপয় নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করে সেইজন্য অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আমরা প্রকৃতই 'বিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি

কিনা এই বিষয়ে পূর্ব রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এরিস্টটল রাষ্ট্রনীতিকে একটি বিজ্ঞান মনে করিতেন। হব্‌স্ (Hobbes), গোডইন (Godwin), মেরী ওলষ্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecrafts), সিজ্‌উইক (Sidgwick) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ এই মত পোষণ করিতেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতই বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু, কোন কোন লেখক "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" শব্দটি গ্রহণ করিতে এবং রাষ্ট্রসম্পর্কিত আলোচনাকে "বিজ্ঞানের" পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহে না। এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।[১]

প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি, কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই একমত পোষণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতি এবং প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্যের-অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি যে সকল উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব আছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমেই আমরা সুশৃংখলভাবে বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করি। ঠিকভাবে যখন উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন আরম্ভ হয় সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। ইহার সাহায্যে আমাদের সুসম্বন্ধ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম অনুমান করিতে পারি। এই অর্জিত জ্ঞানকেই বলা হয় বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব উপকরণ তাঁহারা ঠিকভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা

১। কম্‌ট (Comte) নিম্নলিখিত তিনটি কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করেন না।

"...(1) there is no consensus of opinion among experts as to its methods, principles and conclusions ; (2) it lacks continuity of development ; and (3) it lacks the elements which constitute a basis of provision."
—Quoted from Garner's book, "political Science and Government." P. 10.

জি, মস্‌কা (G. Mosca) বলেন, "A Science is the product of a system of observation made on a given order of phenomena, with special care, appropriate methods, and so co-ordinated as to raise them to the level of an indisputable truth not apprehensible by ordinary, superficial observation. We do not think that Political Science in its present condition has as yet genuinely entered upon the scientific stage."

—Quoted from Garner's book. P 10

করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় জীবনের নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু উপাদান হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহাকে রসায়ন বিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার ন্যায় বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা চলে না।[১] অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট (Prof. Gilchrist) বলেন, যদিও পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার গবেষণা পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায় না, তবু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব একটি গবেষণা পদ্ধতি আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা নির্ভুল এবং যথানির্দিষ্ট হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের অধীনে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনশীল হইবেই। মানুষের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং সমাজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। উপকরণ যদি পরিবর্তনশীল হয় তবে সেই উপকরণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, তাহা পরিবর্তনশীল হইবেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে একটি বিজ্ঞান বলিয়া হয়ত অভিহিত করা যায় না। কিন্তু এইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান (social science)। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। বার্নার্ড শ-এর (Bernard Shaw) ভাষায় ইহা হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান শুধু যাহা দ্বারা সভ্যতাকে রক্ষা করা যাইতে পারে। ("...the science by which alone civilisation can be saved.")

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Methodology of Political Science)—যে কোন বিজ্ঞানেরই একটি বিশ্লেষণ-পদ্ধতি থাকে; ইহা আরোহমূলক (Inductive) অথবা অবরোহমূলক (Deductive) হইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি লইয়া অগাষ্ট কম্‌টি, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, কর্ণওয়াল লুইস (Cornwall Lewis) আলেকজাণ্ডার বেইন (Alexander Baine) এবং লর্ড ব্রাইস প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। অগাষ্ট কম্‌টি (Auguste Comte) পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং তুলনা, এই তিনটি

১। "However widely and carefully the materials may be gathered, their character makes it impossible that political science should ever become science in the sense in which Mechanics or Chemistry or Botany is science."
—Bryce—Modern Democracies, vol. I. P. 16.

বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি লইয়া বিতর্কের সূচনা হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যাহারা গবেষণামূলক বিজ্ঞান (experimental science) বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণামূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (experimental method) গৃহীত হওয়া উচিত।

গবেষণামূলক পদ্ধতি (Experimental Method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার যতগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেইগুলির মধ্যে অনেকেই গবেষণামূলক পদ্ধতি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতি ইহা বুঝায় না যে, রসায়নশাস্ত্র অথবা পদার্থবিজ্ঞানে যেরূপ গবেষণা হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও সেইরূপ গবেষণা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিখুঁত গবেষণা করার পথে অসুবিধা হইতেছে এই যে বিভিন্ন ব্যক্তির গবেষণার ধারা কখনও একপ্রকার নহে অথবা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিকার গবেষণার শর্তগুলি কখনও স্থির নহে; তবুও বিভিন্ন ধরণের সরকার অথবা শাসন ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয়। বর্তমান যুগে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে বিভিন্ন ধরণের সরকার গঠন করা সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে। কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিতর গবেষণা হইতেছে এক ধরণের পর্যবেক্ষণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন গবেষণার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণার পুনরাবৃত্তি হয় না। অভিজ্ঞতা আমাদের ধারণাকে পরিবর্তিত করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন গবেষণা করার ক্ষেত্রে পুরাতন অভিজ্ঞতা বিশেষ কার্যকর হয়।

মেরিয়াম (Merriam) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণামূলক পদ্ধতির সীমিত প্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] গবেষণামূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কিছুটা সারবত্তা আছে সন্দেহ নাই; তবুও ইহা ভুলিলে চলিবে না শুধু গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আলোচিত অথবা গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণা চালাইবার পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ।

পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Observational Method)—গবেষণামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার পরিধি সীমিত বলিয়া লোয়েল (Lowell) এবং ব্রাইস (Bryce) পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। অনেক সময়

১। "Certainly the state has more material available for such observation than any other institution. The army, the schools, the public personnel and an array of public institutions are directly under its management and may be utilised for purposes of experiment if so desired."

—Merriam—New Aspects of Politics Page 55

আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা অথবা বিশ্লেষণ করি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আমরা একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান ("an observational science") বলিতে পারি। রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত কার্য পরিচালনার গবেষণাগার; ইহা পাঠাগারের মধ্যে আবদ্ধ নহে।[১] ব্রাইস-ও মনে করেন, বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে একটি বিশেষ শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা অথবা অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর। ব্রাইসের লিখিত "American Commonwealth" এবং "Modern Democracies" বইগুলি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি অসুবিধা আছে। তাহা হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং সেই অবস্থায় সব ঘটনার সঠিক পর্যবেক্ষণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা সর্বদা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সংমিশ্রণ

তবে অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র সর্বদা বজায় রাখিতে হইলে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত। অনেকের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণমূলক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা একদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অপরদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমীক্ষা হইতে শিক্ষা গ্রহণ। কিন্তু, এই দুইটি বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আরও কতিপয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, এবং ইহার বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকা জানা না থাকিলে কোন কিছুর সঠিক বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এরিষ্টটলের আমল হইতেই ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানেও বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বে রূপ পায়।[২] সব কিছুর ইতিহাস না জানিলে সঠিকভাবে কোন রাষ্ট্রনৈতিক

১। লোয়েলের (Lowell) মতে "The main laboratory for the actual working political institutions is not a library but the outside world of political life."

২। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় "The study of Politics must be an offer to codify results of experience in the history of States."

সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা সম্ভব নয়; ভবিষ্যতের কর্মধারাও অতীতের লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনীতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশী। ফ্রেডারিক পোলকের (Frederick Pollock) মতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ এবং সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে—ইহা দেখাইবার চেষ্টা করে কিভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।[১]

এই পদ্ধতির মাধ্যমে অতীতে কী ঘটিয়াছে তাহার ভিত্তিতে বর্তমানে কী ঘটিতেছে অথবা ভবিষ্যতে কী ঘটিতে পারে তাহার বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। তবে অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেক যুগেরই কতিপয় নিজস্ব সমস্যা আছে; সেইগুলি হইতে যে শিক্ষালাভ করা হয় তাহা যে অন্য একটি যুগে প্রয়োগ করা যাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।[২]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রাজনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই চলিবে না; সেইগুলির রাষ্ট্রদর্শনের সহিত যুক্ত থাকা চাই। রাষ্ট্রদর্শনের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে ঐতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক নষ্ট হইয়া যাইবে। অধ্যাপক বার্কার (Prof. Barker) মনে করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূল বাস্তবতার সহিত অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ণের সহিত যতটা সম্পর্কযুক্ত, ইতিহাসের সহিত ততটা সম্পর্কযুক্ত নহে।[৩]

তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন করিবার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতিপয় নীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর তুলনা করা যাইতে পারে। এরিস্টটল প্রথমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালে মণ্টেস্কু এবং ব্রাইস এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিলে দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিয়া কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে

১। "The Historical Method seeks an explanation of what institutions are and are tending to be, more in the knowledge of what they have been and how they come to be what they are, than in the analysis of them as they stand." —Frederick Pollock

২। সেইজন্য সিজউইক (Sidgwick) বলেন, "I do not think that the Historical Method is the one to be primarily used in attempting to find reasoned solution of the problems of practical politics"

৩। "............the State is.........concerned less with historic processes than with the fundamental realities—essence, purpose and value—which transcend the category of time."—Barker—The Study of Political Science and its relation to Cognate Sudies P. 18.

কতিপয় ক্ষেত্রে হয়ত ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে; আবার হয়ত এমন কতিপয় উপাদান আছে যেগুলি ভারতে আছে অথচ ইংলণ্ডে নাই। ইংলণ্ডেও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা দেখা যায়; অথচ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান হইতেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের রাণী এবং ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হইতেছেন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। অথচ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় উভয় দেশের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যগুলি হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আমরা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি।

দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Philosophical Method)—রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা বিভিন্ন ধরণের তত্ত্ব দেখিতে পাই এবং সেইগুলি কতিপয় যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটো এবং এরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেল, কাণ্ট, রুশো এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই প্রখ্যাত দার্শনিকের পর্যায়ে পড়েন এবং তাঁহারা নিজেদের যুক্তি দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্লেটো, হেগেল, কাণ্ট, রুশো, এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহা কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে; রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতির যে নিয়ত পরিবর্তন হইতে পারে তাহা এই পদ্ধতি বিশেষভাবে বিবেচনা করে না।

অন্যান্য পদ্ধতি—রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের অন্যান্য পদ্ধতি হিসাবে আমরা মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological Method), পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি (Statistical Method), আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method), জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method), এবং সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method) প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের অন্যান্য পদ্ধতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করিবার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, **মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি** অনুযায়ী মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ মানুষের প্রকৃতিকে কতটা প্রভাবিত করে, রাষ্ট্রনৈতিক দলব্যবস্থা কতদূর মানুষকে প্রভাবিত করে, এবং কি ভাবে জনমত গঠন করা যায় প্রভৃতির বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বেশী নহে। **জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি** অনুযায়ী রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কিন্তু

এই পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। **সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি** জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। যাহাদের সমবায়ে সমাজদেহ বা রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাদের ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে ধরিয়া লইয়া সেই ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের গুণাগুণ বিচার করা হয়। **পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি** অনুযায়ী রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য গণনা, পরিমাপ ও সংগ্রহের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারী নীতির নির্দেশক হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ভোটদান পদ্ধতি, জনমতের প্রাবল্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয়। বর্তমানে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে এবং ইহাতে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়াছে। **আইনমূলক পদ্ধতি** অনুযায়ী রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক প্রতিষ্ঠান (legal body) হিসাবে কল্পনা করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতেছে আইন প্রণয়ন এবং আইন কার্যকর করার জন্য। এই পদ্ধতি অনুযায়ী আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাষ্ট্রের কোন কর্মসূচী অথবা ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষিত হয় না। এইদিক হইতে আইনমূলক পদ্ধতি অত্যন্ত সংকীর্ণ। একদিকে বর্ণনা এবং অপরদিকে আর্থিক আলোচনা উভয়ের সংমিশ্রণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হয় এবং সেইভাবেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিরূপিত হয়।

উপসংহার :—উপরোক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি আলোচনার পর প্রশ্ন হইতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত? রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার পথে পদ্ধতি মনোনয়ন (choice of method) একটি বিরাট সমস্যা। লিপসন (Lipson) বলেন "Two choices are open to the student of Politics. He may fit the subject to the method or the method to the subject"। যদি বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্বাচিত করা হয়, তবে বিশ্লেষণের কাজ বিশেষ সহজ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমাদের আরোহমূলক (Inductive) এবং অবরোহমূলক (Deductive) উভয়বিধ যুক্তির প্রয়োগ চলিতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোচনা করিয়া কোন্ পদ্ধতিটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কঠিন। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়। তবে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিটি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় তাহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে

তত্ত্বের যোগাযোগ বজায় রাখিয়া বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, গবেষণামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি,— ইত্যাদি সবগুলি পদ্ধতিরই প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরকার হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন তত্ত্ব অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়ণ নিরূপণ করিতে হইলে বর্ণনার সহিত তত্ত্বের সংমিশ্রণ দরকার। লিপসনের (Lipson) ভাষায় ".. Summed up in a sentence, the method of Political Science is an evaluation analysis uniting description with theory"

Exercise

1. **Discuss the scope of Political Science. Is Political Science really speaking, a Science ?** (১-৬ পৃষ্ঠা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান ?

2. **Examine the methodology of Political Science.** (৬-১২ পৃষ্ঠা)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরীক্ষা কর]

(C. U., B. A Part I 1965 old Regulation. 1966)

3. **Is Political Science an "experimental science" ?** (৭ পৃষ্ঠা)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান ?]

4. **Discuss the methods of study in Political Science Which of them do you consider to be the most desirable and why ?** (৬ ১২ পৃষ্ঠা)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনটি তুমি সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে কর এবং কেন ?]

(B. A. Part I—1962, 1968)

5. **Discuss the nature of Political Science and distinguish it from Political Philosophy.** (১৪ পৃষ্ঠা) **(C. U. B. A. Part I—1964 and 1967)**

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা কর এবং রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে ইহার পার্থক্য দেখাও।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক
(Political Science as related to History and different Social Sciences)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। ইহা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার সহিতও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Political Science and History)—ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। স্যর জন সিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি।[১]

মানবসমাজের বিভিন্নদিকের আলোচনা এবং ইহার ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের কাহিনী ইতিহাসে আলোচিত হয়। রাজনৈতিক জীবনের বিকাশে কালের স্বাক্ষর থাকে এবং তাহা আমরা ইতিহাস পাঠ হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা অপরিণত রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় তাহা হইতেই আমরা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি জানিতে পারি। শুধু, রাজনীতির ইতিহাসই নহে,—রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে সামাজিক, আর্থিক এবং কৃষ্টিগত জীবন তাহাও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি।

লিপসন (Lipson) মন্তব্য করিয়াছেন, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তনের সময়ানুক্রমিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।[২]

আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার অবদান মোটেই সামান্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিবার সময় আমরা ইতিহাস হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করি এবং সেইগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকর করিবার চেষ্টা করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় আমরা ইতিহাসের উপর নির্ভর করি। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের পরিণতি ; কেননা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং নীতি সম্পর্কিত অনুশীলন করি।[৩]

আবার ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের কেন্দ্র নহে। ধর্মের ইতিহাস অথবা চারুকলার ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নাই। সেই প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় অথবা রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে

১। "History without Political Science has no fruit while Political Science without History has no root."

২। "With its chronological treatment, history offers to the student of Politics a sense of growth and development and thus affords insight into the processes of social change." Lipson.

৩। উইলোবির (Willoughby) ভাষায়,—"History gives us, as it were, the third dimension to Political Science."

ইতিহাসের সম্পর্ক হইতে মুক্ত।[১]

যেমন, ধরা যাক, হব্‌স্‌ সামাজিক চুক্তি (social contract) সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে একটির আলোচনা অপরটির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক (Relation between Political Science and Ethics). প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেন। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে রাজার সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি রাজার কর্তব্য অথবা রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য কতিপয় নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইটালীর প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক আদর্শের উপর স্থাপন না করিয়া সুবিধাবাদ আদর্শের উপর স্থাপন করেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শনীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা এবং সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করাই শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের বহির্জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে,—তবে অনেক সময় ইহা নৈতিক নিয়মের অনুরূপ হইতে পারে। তাহা দেখা যাইবে শুধু মানুষের বাহ্যিক জীবন সম্পর্কিত নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে। মানুষকে হত্যা করা নীতিশাস্ত্রের মতে ঘোরতর অপরাধ,—আবার রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ীও ইহা মারাত্মক অপরাধ। আবার আমাদের দেশে কোন গাড়ী রাস্তার বাঁদিকে না যাইয়া ডান দিক দিয়া যাইলে অনেক সময় ইহা বে-আইনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নীতিশাস্ত্র মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হয় না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্জীবনের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।[২] রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

১। বার্কারের মতে, "We must admit the possibility of a great and influential theory of Politics which has no definite basis in history."

২। ম্যাক আইভারের মতে (Mac Iver) ..."Law does not and cannot cover all the ground of morality. To turn all moral obligations into legal obligations would be to destroy morality." Mac Iver, The Modern State

বিধান করাই রাষ্ট্রীয় আইনের এবং ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

কিন্তু, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে। বিশেষতঃ উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অল্প ; কারণ, উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। রাষ্ট্রের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশাস্ত্রের সংস্রব হইতে বিবর্জিত হইলে চলে না। আইভর ব্রাউনের[১] মতে (Ivor Brown) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ; মানুষ কোনো অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে একা বা নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। নৈতিক মূল্য এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া উঠে তাহা মানব সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। নীতিশাস্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের সম্পর্ক (Relation between Political Science and Economics,—প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের যুগ পর্যন্ত একটি ধারণা ছিল যে, অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি শাখা, অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

রাষ্ট্র যখন মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের আইন শুধু ধনিক শ্রেণীর অর্থ নৈতিক স্বার্থ এবং চাহিদাকেই বাস্তবে রূপায়িত করে।[২] অর্থ নৈতিক কায়েমী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্রীয় নীতির মূল ভিত্তি হইতেছে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা। অর্থ নৈতিক নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানকালে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধি অনেক ব্যাপক হইতেছে। সামাজিক জীবনের মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদা থাকে।

১। "Ethical Theory is incomplete without Political theory because is an associated creature and cannot live fully in isolation ; Political theory is idle without ethical theory because its study and its result depend fundamentally on our scheme of moral values, our conceptions of right and wrong." —Ivor Brown. The Meaning of Democracy.

২। "The State, as a legal order, is a mask behind which some dominant economic interest secures the benefit of political authority". Laski—Introduction to Politics.

সেই অভাব দূরীকরণের জন্য উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বলা হয় এবং এই প্রকার কাজকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (economic activity) বলা হয়। এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টনের উপর। সুতরাং ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পর্কিত মানুষের বিভিন্ন কাজ অনুশীলন করাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। অর্থনৈতিক জীবনে সাম্প্রতিক জটিলতার বৃদ্ধির দরুণ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পৃথকীকরণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রকে বর্তমানে আমরা একটি পৃথক শাস্ত্ররূপে মনে করি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ধনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করা। দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান বাড়াইয়া দেওয়া আধুনিককালের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের শান্তি ও শৃংখলা এবং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব খুবই বেশী। বর্তমানে বিশ্বে দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনীতি, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, শুধু দুইটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ Laissez Faire নীতিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে (Individualism) বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কোন দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সেই দেশের সরকারের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগে "কল্যাণ-রাষ্ট্র" (Welfare State) বলিতে আমরা বুঝি, রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণের সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ, কল্যাণ রাষ্ট্র' অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণ, জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত জয় করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জন্য সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখিতে পাই,—ইহার অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করা। সুতরাং রাষ্ট্র এবং মানুষের সম্পর্কের দিক

হইতে চিন্তা করিয়াও বলা যাইতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (**Relation between Political Science and Sociology**)—সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি মৌলিক বিজ্ঞান। মানুষের সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ করা,—শুধু তাহাই নহে, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানবজাতির জীবনযাত্রার বিশ্লেষণ করা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। ইহার পরিধি সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ ব্যাপক নহে। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের শুধু একটি দিক আলোচনা করে। নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার, মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান আমরা পাই সমাজবিজ্ঞান হইতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করিতে হইলে সমাজবিজ্ঞানী হইতে হইবে।[১] রাজনৈতিক চেতনার পূর্বেই মানুষের সামাজিক চেতনার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়;—ইহা সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখা। ধনবিজ্ঞানও সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব (Political Science and Anthropology): রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের মধ্যেও আমরা একটি সম্পর্ক দেখিতে পাই। *Encyclopaedia of the Social Sciences* নৃতত্ত্বের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছে তাহা অনুযায়ী নৃতত্ত্ব সামাজিক প্রাণী হিসাবেই মানুষকে বিবেচনা করে।[২] বিভিন্ন স্থানে জাতি, উপজাতি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং কালের যাত্রায় ইহাদের পরিবর্তন নৃতত্ত্বে আলোচনার বিষয়-বস্তুর প্রধান বিষয়। নৃতত্ত্ব হইতে রাষ্ট্র-

১। গিডিংস (Giddings) মন্তব্য করিয়াছেন, "......To teach the theory of the State to men who have not learned the first principles of Sociology, is like teaching Astronomy or Thermodynamics to men who have not learned the Newtonian Laws of Motion."

২। "Anthropology deals with man as a social being. The races, languages and cultures found in different localities and following one another in the course of time are the material and contain the problems, of anthropological study."—"Encyclopaedia of Social Sciences." F. Boas কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ-য়

বিজ্ঞান বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে। এই উপাদানগুলি সামাজিক ব্যবস্থার ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার গঠন এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণে কাজে লাগে। কোন জাতির জাতীয় চরিত্র অনুধাবন করিতে হইলে আমাদের যে সকল উপাদান ও তথ্যের প্রয়োজন সেইগুলি সংগ্রহ করিবার এবং ব্যাখ্যা করিবার পদ্ধতির সহিত নৃতত্ত্ব জড়িত। এইজন্য নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ক্যাটলিন (Catlin) বলিয়াছেন "It is...fundamental to Politics in the sense that it collects the data, so far as the human genus is concerned."

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র (**Political Science and Juris prudence**): রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আইনশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতাকে কার্যকর করে, এবং সেই আইনের ব্যাখ্যা করা, ইহার বৈধতা বজায় আছে কিনা দেখা এবং আইনভঙ্গ জনিত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রে আইনের কার্যকারিতা তত্ত্বাবধান করা প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত আইনশাস্ত্র জড়িত। অষ্টিন, জেলিনেক (Jellinek) এবং ষ্ট্যাম্লার (Stammler) প্রমুখ আইনশাস্ত্র-বিশারদগণ আইনশাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা এবং তত্ত্বগুলির যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "আইন সার্বভৌমের আদেশ" ("Law is the command of the Sovereign")—অষ্টিনের এই যুক্তিটি রাজনৈতিক তত্ত্বের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। এই মতবাদই আইনানুগ সার্বভৌমত্বের (legal sovereignty) ভিত্তি। আইনশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ফলে এবং সরকারের পরিবর্তনের ফলে, আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে সমকালীন ধারারও পরিবর্তন হয়। গণতান্ত্রিক দেশে আইনশাস্ত্রকে যেভাবে পরিবর্ধিত করা হয়, তাহা একনায়কতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সর্বদা প্রযুক্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিটলারের আমলে জার্মানীর আইন ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইনশাস্ত্র অনুযায়ী সরকারের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে আইনশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পন্থা স্বতন্ত্র। আইনশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বিবর্জিত হইতে পারে না। ভাল-মন্দ বিবেচনা করা আইনশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকে মুখ্য গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহাতে বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি বোধ উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা কিংবা বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত বহুল পরিমাণে সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের একাংশের মধ্যে মনোবিজ্ঞান প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। ফ্রান্সের টার্ডে (Tarde) এবং লে বঁ (Le Bon), ইংলণ্ডের ম্যাগডুগাল (Mc Dougall), গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas)

ও স্পেন্সার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ প্রয়োগ করা হয়। জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও বিশ্বাস যদিও রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিতে প্রতিফলিত না হয় তবে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের উপর আস্থা হারাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ, দলীয় কর্মসূচী গঠন, জনমত সংগঠন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেনাবাহিনী নিয়োগ, রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ, বিচারালয়ের ক্রিয়া পদ্ধতি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ধারণার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অনেক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানেও মনোবিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ করা হয়।[৬] মানুষের মনস্তত্ত্ব (Human Psychology) সমাজের মনস্তত্ত্ব (Social Psychology) গঠনে সহায়ক ; কিন্তু ইহাও ঠিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কযুক্ত ইহার ভিত্তিতেই বার্কার বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল রহিয়াছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে। ("Political Science has its roots in Psychology.)

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
(The State, the Society and other Associations)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের সহিত জড়িত। গ্রীক এবং রোমান শাসকগণের লেখায় রাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহৃত হইত না। গ্রীক এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুঝাইতে যথাক্রমে "পোলিস্" এবং "সিভিটাস্" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'রাষ্ট্র' কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক 'রাষ্ট্র' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটলের মতে' যখন স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অনেক পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হইয়া একটি শাসনব্যবস্থার আওতায় আসে, তখনই ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য এরিষ্টটল মানবজীবনের নৈতিক চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন। আদর্শবাদের অন্যতম উদ্গাতা হেগেলের (Hegel) মতে রাষ্ট্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। মার্কসের (Marx) মতে রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণী শোষণের একটি প্রধান হাতিয়ার। হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই।

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন; নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হইল। হল্যাণ্ডের (Holland) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে দলের ইচ্ছার উপরে স্থান দিতে পারিবে। ফিলিমোরের (Phillimore) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহার স্থায়ী ভূখণ্ড থাকিবে, যেখানে লোকেরা সাধারণ আইন, আচার ব্যবহার এবং রীতি-নীতির সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সুসংগঠিত সরকারের সাহায্যে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা' নিজের আয়ত্তাধীন অপর লোকের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ এবং শান্তি-চুক্তি করিবার ক্ষমতা ভোগ করিবে) ব্লুন্টস্লির (Bluntschli) মতে যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ভূখণ্ডে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বার্জেসের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টির একটি অংশ।[২]

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিভাবে প্রদান করা উচিত সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ম্যাক আইভার (Mac Iver) মন্তব্য করিয়াছেন, "In no attitude of worship as did Hegel, and in no attitude of belittlement as did Spencer, but in the spirit of scientific exactitude must we seek the criterion of the state."

২। Mac Iver—The Modern State, P. 4.

উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে। ("The state is a people organised for law within a definite a territory"—Wilson)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্তু উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডক্টর গার্ণার (Dr Garnar) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক অথবা বহুসংখ্যক জনসমষ্টি—যাহারা স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকারের নির্দেশ ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।[২]

গার্ণার প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of State): অধ্যাপক গার্ণারের সংজ্ঞা হইতে আমরা রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত উপাদানগুলি আলোচনা করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধানতঃ চারিটি উপাদান; যথা—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসন প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা। বাস্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন প্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমত্ব।

(১) **জনসমাজ** (Population)—জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, যেমন পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক (অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই) বিদেশী ও প্রজা। জনসমাজ রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু, একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এরিস্টটলের মতে একটি শহর-রাষ্ট্রে (City state) যতজন লোক থাকা উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। রুশোর (Rousseau) মতে একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা দশ হাজারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমানে জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। আমরা চীন, রাশিয়া এবং ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি অল্পসংখ্যক

১। "The State is a particular portion of mankind viewed as an organized unity"—Burgess.

২। "The State as a concept of Political Science and Constitutional Law, is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience"—Garner.

জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে উক্ত জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে।

(২) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** (Definite Territory)—স্যার জন সিলির (Sir John Seely) মতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তাঁহার মতে সরকারই হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ এবং ইহার মাধ্যমে একটি যাযাবর জাতিও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।[১] কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহা সঠিকভাবে স্থির করা যায় না। রাষ্ট্রের আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

তবে সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সাত মাইল উর্ধস্ত এবং উর্ধ্বেও কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্র দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ অর্থ।

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকা এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। তাহা না হইলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভারসাম্যের অভাব হইতে নানাবিধ দুর্গতি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

(৩) **সরকার** (Government)—শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ একটি ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের একটি সুসংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই,—এই সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।[১] জনসমষ্টিরই কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, দেশে যাহাতে শান্তি ও শৃংখলা অব্যাহত থাকে সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারের। সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে—আইনসভা (legislature), শাসন বিভাগ (executive) এবং বিচার বিভাগ (judiciary); সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্তু সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং গঠন হইতে পারে না।

১। **Seely—Introduction to Political Science Pages 81-87.**

(৪) **সার্বভৌমত্ব** (Sovereignty)—রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র জনসমষ্টির নিকট হইতে একক এবং পূর্ণ আনুগত্য লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে না। যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথবা যে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্য করিতে পারে না; ইহাকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব (internal sovereignty) বলা হয়। আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক প্রকাশ (external sovereignty)। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলেও প্রায় মুক্ত হইলেই (independent, or nearly so, of external control) কোন দেশ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইবে।

রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমানাধিকার

রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে; সেইগুলি হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (permanence and continuity) এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা (equality of status)।

বর্তমানকালের রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (international recognition)। বর্তমান পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য যে কোন রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের সমুদয় সদস্য-রাষ্ট্রই সার্বভৌম। এইজন্য যে কোন নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্রই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়া বর্তমানকালে যে কোন রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন। তবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চীন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে স্বীকৃত না হইয়াও অনেক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই সংজ্ঞাটির সহিত যদি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শর্তহিসাবে বিবেচিত হয় তবেই আমরা রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি ধারণা করিতে পারি।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

আমাদের দেশের রাজ্যগুলিকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহাদের সকলেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও

১। "Government is the agency of machinery through which common politics are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted.'—Garner. Political Science and Government, P. 93.

সার্বভৌমত্ব নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও কোন সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজসহ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য (component State) হিসাবে এইগুলিকে ভদ্রতাসূচকভাবে রাজ্য (State) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন আমাদের দেশে বহু দেশীয় রাজ্য ছিল তখনও ইহাদিগকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ, তখনও ইহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না।

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাজ্য (component State) এবং ইহাকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, যদিও সেখানে আমরা নির্দিষ্ট ভূভাগ, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বলা যায় না।

বর্তমানকালে, বিশেষতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (League of Nations) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জাতিসংঘ অথবা রাষ্ট্রসংঘ একটি রাষ্ট্র নহে। কারণ, রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকেরই যে কোন সময়ে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নাই। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের জন্য নির্দিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের আইনগত কোন ক্ষমতা নাই। সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আনুগত্য জানাইবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাষ্ট্রের বাস্তব ধারণা ও কল্পিত ধারণা (Idea vs. Concept of the State)—রাষ্ট্রের দুইটি দিক আছে। একটি দিক হইতে চিন্তা করিলে রাষ্ট্রকে একটি বাস্তব ধারণা (State as an idea) বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি বাস্তব রূপ আছে। অপর দিকে, রাষ্ট্রকে আমরা অনেক সময় একটি কল্পিত ধারণা (State as a concept) বলিয়া মনে করি। রাষ্ট্রের দুইটি বাস্তব উপাদান (নির্দিষ্ট ভূভাগ এবং একটি জনসমাজ) ছাড়াও আমরা রাষ্ট্রের একটি কল্পিত ধারণা করিতে পারি। কিন্তু রাষ্ট্র বাস্তব রূপ ধারণ করে জনসমাজ এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকিলে।

অনেক আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের মধ্যে। বর্তমানে কোন কোন চিন্তানায়ক এই অভিমত পোষণ করেন যে বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হইলে বিশ্ব-শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রাষ্ট্র সেখানে আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু ইহা একটি কল্পিত ধারণা মাত্র। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের আমল হইতে টমাস মুর পর্যন্ত প্রত্যেকেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র একটি অবাস্তব ধারণা হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটল শহর-রাষ্ট্রের (City-State) ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র হইতে পারে নাই, কারণ ইহা সম্পূর্ণ জনসমাজের (ক্রীতদাস সমেত) সুখ-সুবিধার জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। শহর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পর বিভিন্ন যুগে আমরা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস দেখিয়াছি। কিন্তু সেই প্রয়াসের ভিত্তি ছিল শক্তি। গত এক শতাব্দী যাবৎ, বিশেষতঃ, বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রেরণায় বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা চলিতেছে। কিন্তু এখনও ইহা একটি অবাস্তব ধারণা। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) মাধ্যমে একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক পরিবার (Family of Nations) গঠন করিবার পরিকল্পনা আমরা দেখিতে পাই। এই আন্তর্জাতিক পরিবারের মাধ্যমেই বিশ্বরাষ্ট্র সংগঠনের একটি প্রয়াস আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু, ইহাও রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি অবাস্তব ধারণা।

রাজা কর্তৃক শাসিত রাষ্ট্র অবাস্তব ধারণা নহে। যদিও ইংলণ্ডের রাণী নিছক শাসনতান্ত্রিক প্রধান, তবুও অনেক দেশেই আমরা এখনও বংশপরম্পরায় রাজা শাসন দেখিতে পাই,—যেমন, ইথিওপিয়া, সৌদী আরব, নেপাল প্রভৃতি। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাও বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তাহা একটি বাস্তব ঘটনা, অবাস্তব ধারণা নহে। তবে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন হইলে রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে রাজ্যশাসন করেন, তাহাতে তাঁহার সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় না। যেমন, ইংলণ্ডে আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজাসমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament)।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)—তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও অধ্যাপক লাস্কি, জি, ডি, এইচ্, কোল প্রমুখ লেখকগণ বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং সরকারকে একই পর্যায়ে চিন্তা করিয়াছেন।[১] কার্যক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেকেই রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য স্বীকার করিতে চাহেন না। তবুও তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :

১। লাস্কি বলেন, "The state is, for the purpose of practical administration, the government". Laski—Grammar of Politics. P. 181.

জি. ডি এইচ. কোল (G D. H Cole) বলেন, "A state is nothing more or less than the political machinery of government in a community."

G. D. H. Cole—Self-Government in Industries. P. 119.

(১) সরকার হইতেছে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র। সুতরাং সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। অর্থাৎ, আইনসভার সদস্য, শাসনবিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন বিচারক ও অন্যান্য কর্মীদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয়।

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠিত হয়। আবার পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে যদি কখনও আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়।

(৩) রাষ্ট্র বলিতে প্রথমেই আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করি। কিন্তু সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের কর্মীদের একটি সমষ্টি বুঝায়।

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু, সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। সরকারের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম এবং সরকার শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে।

(৫) সব রাষ্ট্রেরই আমরা প্রধানতঃ চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই; যথা,—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূভাগ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। কিন্তু, বিভিন্ন দেশে সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে; কোন দেশে হয়তো সরকার প্রজাতন্ত্রী, আবার কোন দেশে হয়তো দায়িত্বশীল সরকার। আবার, সরকার গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক হইতে পারে।

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট্র, সরকার নহে। সরকারের দায়িত্ব সেই অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকগণের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে,—কিন্তু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

(৭) রাষ্ট্র রূপহীন একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (The State and other Associations): একটি সংঘ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কতিপয় সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকদ্বয় ম্যাক আইভার এবং পেইজ (Mac Iver and Page) সংঘের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন…

"a group organised for the pursuit of an interest or a group of interests in common."

রাষ্ট্রের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমরা অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই না। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্যান্য সংঘের নির্দিষ্ট ভূভাগের দরকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের বহির্জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘগুলি দুই একটি উদ্দেশ্য অথবা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে এবং তাহাতে মানুষের বহির্জীবনের সামগ্রিক উন্নতি হয় না। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পঞ্চমতঃ, মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা কোন সংঘেরই সভ্য না হইতে পারে। কিন্তু, তাহাকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে এবং সে একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না।

রাষ্ট্র নিজের কাজ সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। একটি সংঘের সহিত অপর কোন সংঘের কি সম্পর্ক হইবে, অথবা একটি সংঘের সহিত ইহার সদস্যদের কি সম্পর্ক হইবে, তাহাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।[১]

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)—রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে আমরা যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও তাহার একটি সাদৃশ্য আছে।[২] রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। সমাজের পরিধি রাষ্ট্রের পরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের

১। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক বার্কারের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য—"The state as a general and embracing scheme of life, must necessarily adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own members."

Berkar—Political Thought in England P. 156.

২। রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বার্কার বলিয়াছেন, "Society is indeed a contract...... but the state ought not to be considered nothing better than a partnership agreement in a trade."

Barker—Reflections on the Revolution in France. Pages 105-106.

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই। কিন্তু, সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যক নহে। আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌমত্ব। সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইন প্রয়োগ করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখে। কিন্তু সমাজ জীবনের কতিপয় উদ্দেশ্যকে (Purposes of life) কেন্দ্র করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। স্যাবাইনের (Sabine) মতে আইনগত, নৈতিক কিংবা দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর দিক হইতে বিবেচনা করিলেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র হইতেছে সমাজের একটি বিশেষ দিক, ইহার উপ-বিভাগ নহে।[১] সর্বশেষে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষাও ব্যাপক। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, সমাজের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাংগীন উন্নতিসাধন করা।

সমাজের মধ্যে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেইগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের দিক হইতেও ইহা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর এবং ব্যক্তি-নির্বিচারে ভূখণ্ডের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ—রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা। কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা স্থান-নির্বিচারে (extra-territorial) ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয় অথবা ব্যক্তি-নির্বিচারে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রযোজ্য হয়। যদি স্থান-নির্বিচারে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তবে রাষ্ট্র দেশে এবং বিদেশে সমানভাবেই ইহার নাগরিকদের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অপরদিকে যদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু নির্দিষ্ট ভূভাগকে কেন্দ্র করিয়া থাকে, তবে রাষ্ট্র দেশের ভিতর নাগরিক এবং বৈদেশিকগণের উপর সমানভাবে ইহার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে এবং ইহাদের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। নির্দিষ্ট

১। "Writers strongly motivated by considerations of valuation, whether metaphysical, ethical or justice, are inclined to distinguish state and society as a matter of point of view rather than of grouping. The State would then be an aspect of society rather than a subdivision of it" Sabine,—'State", in selections from the Encyclopaedia of the Social Sciences.

ভূখণ্ডের মধ্যে যাহারা বসবাস করিবে তাহারা সকলেই এই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। আধুনিককালে এই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য, এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অথবা যুদ্ধজাহাজ যখন সাময়িকভাবে অন্য একটি রাষ্ট্রে অবস্থান করে, তখন তাহাদের উপর সেই রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে এই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বাহ্যিকভাবে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে।

বর্তমানকালে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা কার্যকরী হইতে আমরা বিশেষ দেখিতে পাই না। বিগত শতাব্দীতে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি (যেমন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ) অন্য দেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডের আইন ইংলণ্ডের বাহিরে চীনদেশে কার্যকর হইত। বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের স্থানগত অধিকার-বহির্ভূত সার্বভৌম ক্ষমতার (extra-territoral jurisdiction) অবসান হইয়াছে। তবে একটি ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক প্রয়োগ এখনও কিছু পরিমাণে আমরা দেখিতে পাই। তাহা হইতেছে বিদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে। Jus Sanguinis আইনের প্রয়োগে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবী করিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

১। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি: যথা, জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে সমানাধিকার। রাষ্ট্র ও সরকার এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য আছে।

২। রাষ্ট্রের দুইটি দিক আছে। ইহাকে একটি বাস্তব ধারণা এবং একটি কল্পিত ধারণা, উভয় দৃষ্টিভংগী হইতেই চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তি-বাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা অথবা স্থানবাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমানকালে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা কার্যকরী হইতে আমরা বিশেষ দেখিতে পাই না। আবার রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের স্থানগত অধিকার-বহির্ভূত সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হইয়াছে।

Exercise

1. Define the State. Distinguish between
   (a) the State and Government, and
   (b) the State and other Associations.

Is the U. N. O. State ? (২০-২৪ পৃষ্ঠা ; ২৫-২৭পৃষ্ঠা)

[রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান কর। (ক) রাষ্ট্র ও সরকার এবং (খ) রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। রাষ্ট্র সংঘ কি একটা রাষ্ট্র ?]

2 What do you mean by the idea and the concept of the State ?

[রাষ্ট্রের বাস্তব ধারণা এবং কল্পিত ধারণা বলিতে তুমি কি বুঝ ?]

(২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

8. What do you mean by 'territory' in Polititical Science ? What do you mean by exclusive and *extra-territorial jurisdictions* of a State ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে "ভূখণ্ড" বলিতে তুমি কি বুঝ। রাষ্ট্রের অনন্য এবং স্থান নিবিচারে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ বলিতে তুমি কি বুঝ ?

(২১-২২ পৃষ্ঠা ; ২৮ ২৯ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ
(Theories of the origin of the State)

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; কতিপয় মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টি (origin) লইয়া আলোচনা করে এবং কতিপয় মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি (nature) লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু এমন কতিপয় তত্ত্ব আছে যেগুলি মূলতঃ রাষ্ট্রের সৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করে, যেমন ঐশ্বরিক মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক মতবাদ। তবুও এই মতবাদগুলি প্রধানতঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করে।

রাষ্ট্রসৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State): রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের মতই প্রাচীন। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। প্রাচীনকালে, ভারত, চীন. এবং মিশরে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পর হইতে অনেক গোঁড়া খৃষ্টান পোপকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে থাকায় এই মতবাদের বহুল প্রচার হয়। বাইবেলে বলা হইয়াছিল যে ঈশ্বরই সকল শক্তির একমাত্র

উৎস। রাজার ক্ষমতারও উৎস হইতেছেন ঈশ্বর। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেন্টের যে বিবাদ হয় তাহার কারণ ছিল এই মতবাদ। ষ্টুয়ার্ট রাজারা মনে করিতেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহারা রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা কোন পার্থিব শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন এবং প্রজাদেরও বিনা দ্বিধায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা উচিত।[১] প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং শক্তিশালী করিবার জন্যই ষ্টুয়ার্ট রাজারা এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি সর্বেসর্বা

রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কিত ঐশ্বরিক মতবাদটি নিম্নলিখিত চারিটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত:—(১) একমাত্র রাজতন্ত্রই হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি। কারণ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্য করেন। (২) রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন। (৩) রাজা তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি তাঁহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। (৪) প্রজাদের উচিত বিনা বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই মতবাদ

রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় স্যার রবার্ট ফিলমারের (Sir Robert Filmer) 'পেট্রিয়ার্কা'য় (Patriarcha)। এই পেট্রিয়ার্কার অর্থ হইতেছে রাজার স্বভাবজাত ক্ষমতা (Natural power of Kings)। এই মতবাদের চরম সমর্থকের মতে রাজা কোন অবস্থায়ই প্রজাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন। রাজা ও প্রজার মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। প্রজারা যদি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা লাভ করেন তবুও পুত্র যেমন পিতার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না প্রজারাও সেইরূপ রাজার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। বাইবেল হইতে এই জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এই মতবাদটির প্রভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখা যায়। এমনকি ১৮১৫ সালে প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের

১। প্রথম জেম্‌স্ তাঁহার "The Law of Free Monarchies" বইয়ে বলিয়াছেন, "As it is atheism and blasphemy to dispute what God can do, so it is presumption and high contempt in a subject to dispute what a king can do or to say that a king cannot do this or that."

নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিব্বতেও এই মতবাদটি আমরা দেখিতে পাইয়াছি। বর্তমানে এই মতবাদের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

সমালোচনা—রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক সৃষ্টির মতবাদের কোন মূল্য বর্তমান কালে নাই। যতক্ষণ যুক্তির উপর ভিত্তিশীল হইয়া আমরা কোন কিছু গ্রহণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত এই মতবাদ মূল্যহীন।

এই মতবাদ অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই মতবাদ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে। ভগবান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না।

মানুষের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র অল্প দেখিতে পাই। কিন্তু কোন রাজাই বর্তমানে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন না। অবশ্য দালাই লামা বৌদ্ধ ধর্ম-গুরু হিসাবে পূজিত হন। এখনও অনেক দেশে নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রভৃতি যেখানে গৃহীত হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক সৃষ্টির মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃত সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় আমরা নূতন নূতন রূপ দেখিতে পাই এবং সেইগুলির উৎপত্তি বিচার উপরের মতবাদে সম্ভবপর নয়।

প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র এখন অল্প

তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাজা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। বিশেষতঃ, যে রাজা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাঁহার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তিনি প্রজাদের পূর্ণ আনুগত্য পাইবার একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি প্রকৃতই রাজা নিজেকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা এবং নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রজাদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। কিন্তু উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী শাসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। বরং অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অত্যাচারী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারের সমর্থক। আধুনিক কালে সব মানুষই গণতান্ত্রিক সরকার কামনা করে।

এই মতবাদ মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক

ইহা স্বৈরাচারিতার সমর্থক

এই মতবাদে রাজা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। স্বাধীনতাকামী মানুষ এই যুক্তি কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। এই মতবাদ অযৌক্তিক। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে মন চায় না। ঈশ্বর কখনও মানুষকে শাসন করিবার জন্য এক অত্যাচারী প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, এই ধারণা অযৌক্তিক। ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের কল্পনা করি; কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে টানিয়া আনা বিজ্ঞানসম্মত নহে। রুশো তাঁহার "Social Contract" বইয়ে বলিয়াছেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের কথা" ("Voice of the people is the voice of God")। কিন্তু এই মতবাদে বলা হইয়াছিল, জনসাধারণের কথা ঈশ্বরের কথা নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথা—সভ্যযুগে এই মতবাদ একেবারে অচল।

ইহা অযৌক্তিক

তবে এই মতবাদটির একটি দিক আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মোটেই সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের একটি অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে জনসমাজকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেই জন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার ব্যাপারে তাঁহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, তবে শাসনব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়। এই মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য হইতেছে এ যে প্রাচীনকালের মানুষের নিকট মানুষের প্রণীত আইন অপেক্ষা ধর্মীয় বিধানের গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। এই মতবাদ রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষা দিয়াছিল।[১] কেননা, রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এই ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মনে রাষ্ট্র সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই মতবাদের নৈতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal theory)—রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনে পরিবার সর্বদাই প্রথম যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে। এরিষ্টটলের লেখায় আমরা পরিবারের যিনি প্রধান, পরিবার গঠনে ও পরিচালনায় তাঁহার প্রাধান্যের ভূমিকার উল্লেখ দেখিতে পাই।

১। Gilchrist—Principles of Political Science P. 74.

অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, "To regard the state as the work of God is to give it a high moral status, to make it something which the citizen may revere and support something which he may regard as the perfections of human will"

এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবারের সম্প্রসারিত পরিণতি বলিয়া মনে করা হয় যেখানে পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই (অথবা Patriarch) সব কর্তৃত্বের অধিকারী। স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine)[১] এই মতের সমর্থনে প্রাচীনকালের রোমক, হিন্দু এবং অন্যান্যদের সমাজব্যবস্থার নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে তিনি কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠীর নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া একটি উপজাতির সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই সব পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের প্রত্যেকের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। পরিবার হইতে যখন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, তখন গোষ্ঠিপতি হইতেন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। অবশেষে যখন গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তখন যিনি পিতৃশ্রেষ্ঠ তিনিই রাষ্ট্রনায়কের পদ গ্রহণ করিতেন। এরিষ্টটলও পরিবার হইতে যে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

স্যার হেনরী মেইন এই মতের প্রধান সমর্থক

এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন ম্যাকলীনান (Mc Lennan), মর্গান, প্রভৃতি পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ। তাঁহাদের মতে প্রাচীন রোম এবং আরও কয়েকটি দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা গেলেও একথা বলা যায় না যে, ইহাই রাষ্ট্রগঠনের আদি এবং সার্বজনীন রূপ। অনেকক্ষেত্রেই প্রাচীনকালে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাহা ছাড়াও অনেক লেখক এই মত পোষণ করেন যে, অনেক জাতি আছে যাহারা পরিবার গঠন না করিয়া এমনিতেই দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীনকালে বাস করিত। পরিবারের সম্প্রসারণহেতু যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য নহে। সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনৈতিহাসিক। অনেকে মনে করেন, সমাজ সংগঠনের আদিরূপ হইতেছে উপজাতি, পরিবার নহে। আবার অপর একটি দল মনে করেন উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল গোষ্ঠী সৃষ্টি হইবার পর। দেখা যাইতেছে রাষ্ট্র সৃষ্টির আদিমতম রূপ কি ছিল তাহা লইয়াই মতভেদ আছে। তাহা ছাড়া, এই মতবাদটি

এই মতবাদের সমালোচনা

১। Sir Henry Maine—*Ancient Law and Early History of Institutions.*

নিম্নলিখিত তিনটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর হেনরী মেইন তাঁহার যুক্তিকে ভিত্তিশীল করিয়াছেন :

(i) "accounts by contemporary observers of civilisations less advanced concerning their primitive history" ;

(ii) "records which particular races have preserved conserving their primitive history ; and

(iii) „ancient law„.

একদিক হইতে অতি সরল,—যত সহজভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, রাষ্ট্র তত সহজে সৃষ্ট হয় নাই। সেই জন্য এই মতবাদটি অসম্পূর্ণ।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory)—ম্যাকলীনান, মর্গান; জেংক্স্ (Jenks) প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের সমর্থক।

এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাচীনকালের পরিবারগুলি ছিল মাতৃতান্ত্রিক,—অর্থাৎ, মাতার দিক দিয়াই পরিবারের পরিচয় প্রকাশ পাইত। তৎকালীন যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং মাতৃশ্রেষ্ঠাই (matriarch) পরিবারের প্রধান বলিয়া বিবেচিতা হইতেন। প্রাচীনকালে বহু পতি গ্রহণ প্রথাও (polyandry) দেখা যাইত। পরিবার হইতে ক্রমে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠীর এবং তাহার পরিচয়ও হয় মাতার দিক হইতে। গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে হয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ম্যাকলীনান, জেংক্স্ এবং এই মতবাদের অন্যান্য সমর্থকগণ মনে করেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন সন্তানসন্ততিদের অভিভাবিকা। বিবাহ-প্রথার বহু পূর্ব হইতেই মাতার সম্বন্ধ দিয়া সন্তানের পরিচয় নিরূপিত হইত।

ম্যাকআইভার মন্তব্য করিয়াছেন যে "matriarchal" এবং "matriarchate" প্রভৃতি শব্দগুলি নারীর শাসন কিংবা মাতাব শাসন বুঝাইতে যাইয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন যুগে নারী ছিলেন পরিবর্তনের ধারক ও বাহক, ক্ষমতার সক্রিয় প্রয়োগকারী নহে।[১]

রাষ্ট্রগঠনের এই রূপটিও যে সার্বজনীন নয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, রাষ্ট্রের সৃষ্টি পিতৃতান্ত্রিক অথবা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে হইয়াছে। রাষ্ট্র গঠনের কারণ হইতেছে বহুবিধ। সুতরাং, রক্তের সম্পর্কহেতু অথবা স্বগোত্রীয় মানুষের বন্ধনহেতুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতেছে, একথা বলা ঠিক নহে। রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনেকক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব মাত্র একটি কারণ হইয়াছে—কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে।

এই মতবাদের সমালোচনা

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)—রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং ভিত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলপ্রয়োগ মতবাদ মানুষের প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল হইয়াছে। জেংক্সের (Jenks) মতে আধুনিককালের সমুদয় রাজনৈতিক সমাজের সৃষ্টি যুদ্ধের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল।[২] রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখ্যা

১। "......the agent of transmission, not the active wielder or even the participant of power." —Mac Iver—The Modern State, P. 29.

২। জেংকস্ বলেন, "Historically speaking, there is not the slightest difficulty in that all political communities of the modern type owe their existence to successful warfare." Jenks—A History of Politics. P. 71.

করিবার জন্য এই মতবাদ বলবান কর্তৃক দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার জন্যই নহে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার পক্ষেও এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য এবং বিদেশী আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। ক্ষমতা প্রয়োগের বাসনা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। আমরা এই মতবাদের দুইটি তাৎপর্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়,—তাহা হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কোন্ জিনিস ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহার নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা উপজাতি যথাক্রমে দুর্বল লোক অথবা দুর্বল গোষ্ঠী বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে।[১] প্রাচীন মানবসমাজে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভেদ দেখিয়াছি। গোষ্ঠী, উপজাতি এবং জাতির মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টির পরিণতিই হইল দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য। এইরূপে কোন দলপতি যখন তাঁহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টির অন্যতম উপাদান।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

বলপ্রয়োগ হইতেছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি

বলপ্রয়োগ মতবাদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে মধ্যযুগে চার্চের বিশপগণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। মার্ক্সের (Marx) মতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় সমাজের একটি শ্রেণী কর্তৃক অপর একটি শ্রেণীকে বিজয়ের দ্বারা। ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যেই ধনতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করিবার চেষ্টা করেন।[২] জার্মান লেখকগণের

এই মতবাদের অন্যান্য ব্যাখ্যা

১। The State "completely in its genesis, essentially and almost completely during first stages of its existence is a social institution forced by a victorious group af men on a defeated group".—Franz Oppenheimer.

২। কার্ল কট্স্কি (Karl Kautsky) বলিয়াছেন, "The modern state is pre-eminently an instrument to guard the interest of the ruling class.„

যেমন বার্ণহার্ডি (Bernhardi), নীটসে (Nietzsche), ট্রিট্স্কে (Treitsche) প্রভৃতি লেখকগণের লেখায় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপে সামরিক শক্তির বিশেষ প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আমরা দেখিতে পাই।[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই আমরা জার্মানী এবং ইটালীতে যথাক্রমে হিটলার ও মুসোলিনী কর্তৃক এই মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা (Criticisms of the theory of Force): বল প্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে জনগণের সাধারণ ইচ্ছাকে (General will) উপেক্ষা করে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের যে ভূমিকা নাই তাহা নহে, অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্যও বলপ্রয়োগ যে গুরুত্বপূর্ণ তাহাও নহে। কিন্তু এইজন্য সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয়। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথবা সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক সদাসতর্ক এবং সচেতন জনমতেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণ ইচ্ছা। সুসংগঠিত এবং সচেতন জনমত অপেক্ষা বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ বলপ্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরাক্রান্ত রাজারাও সাম্রাজ্যের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ মতবাদ গ্রহণ করিতেন। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় নহে; রাষ্ট্র মানুষের অনেক চাহিদা পুরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যন্তই সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। রুশো বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুবল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসকের প্রতি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন।

রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা।

১। বার্ণহার্ডির মতে "Might is the supreme right and the dispute as to what is right is decidsd by the arbitrament of war.

ট্রিট্স্কে তাঁহার *Politik* বইয়ে বলিয়াছেন, The State is identified with power and power is moralised by the assumption that it is the condition of upholding and spreading a national culture."

Quoted from Sabine's *A History of Political Theory*. 754.

শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিন্ন যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে যেমন বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী, অপরদিকে তেমনি ইহা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিবর্তন উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ, সামরিক শক্তির সমাপ্তি একদিন হইবেই; তখন এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে। কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে বলপ্রয়োগ মতবাদ সত্য নহে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু "জোর যার মুল্লুক তার" এই মতবাদে কোন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না।

বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্রবিরোধী : ইহা রাষ্ট্রের বিবর্তনকে উপেক্ষা করে

ইহা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস ভিত্তিক নয়

এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই

তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এইজন্য পশুবলই রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণ নহে। গ্রীণ তাঁহার "Principles of Political Obligations" বইয়ে লিখিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়"। (Will, and not Force, is the basis of the State") রাষ্ট্রের ক্ষমতা শর্তাধীনে প্রদত্ত,—ইহা সর্বদাই অছি স্বরূপ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। জনসাধারণের শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইলেও, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। জনগণ যে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহার কারণ সর্বদাই বলপ্রয়োগ নহে। জনগণ কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে না।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বদাই অছি স্বরূপ

হিটলারের আমলে জার্মান রাষ্ট্রদর্শনকে এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বলপ্রয়োগের দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা এবং প্রভুত্ব বিস্তার করা, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধবাদ এবং বলপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা দমন করা, প্রভৃতি নীতি হইতেছে বলপ্রয়োগ মতবাদের বিভিন্ন বিকাশ।[১]

১। It is "........a creed of dominance by intimidation—military in international relations and forcible suppression of political dissent in domestic Government." Quoted from Coker's "Recent Political Theory."

বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে সর্বদাই থাকে। কিন্তু জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করাই প্রকৃত সমস্যা। রাষ্ট্রকে যখন নানাবিধ সমস্যায় সম্মুখীন হইতে হয়, তখন গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হয় জনগণকে একটি বিশেষ আইন গ্রহণ করার জন্য সাফল্যজনকভাবে প্রণোদিত করা। বর্তমানকালে প্রণোদনই (persuasion) জনগণের আনুগত্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত রাখিতে পারে, বলপ্রয়োগ নহে।[১] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রভাবে বিশ্বজনমত বর্তমানে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের উপর বলপ্রয়োগের বিপক্ষে খুবই সচেতন। যদি কোন রাষ্ট্র অনর্থক বলপ্রয়োগ করে তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল, হিটলার ও মুসোলিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা। পৃথিবীতে যেখানেই অবাঞ্ছিত বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অনিবার্য হইয়াছে। অতীতে ইহার প্রমাণ বহু পাওয়া গিয়াছে।

জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলপ্রয়োগ নহে

বলপ্রয়োগের মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির প্রতিবন্ধক

গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের "গৌরবময় বিপ্লব", ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করিয়াছে যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory): রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, সেইগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তবুও ইহা সর্বাংশে গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর নয়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে চুক্তির ফলে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিলেও, প্লেটো এবং এরিষ্টটল ইহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। রোমান আইন বিশেষজ্ঞ উল্‌পিয়ান (Ulpian) মন্তব্য করিয়াছিলেন, সম্রাটের ইচ্ছা যদি আইনরূপে

১। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় "The State always acts in an atmosphere of contingency. Successful to coerce, it must know how to persuade successfully,"

Laski—An introduction to Politics. Ch. 2.

পরিগণিত হয় তবে ইহার কারণ হইতেছে জনসাধারণই তাঁহাকে সেই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।[১] একাদশ শতাব্দীতে ম্যানেগোল্ড (Manegold) নামে একজন লেখক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে রাজা চুক্তির মাধ্যমে সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন এবং যদি তিনি চুক্তিভঙ্গ করিতেন তবে প্রজারাও তাহাদের আনুগত্য হইতে মুক্তি পাইতেন। পরবর্তী যুগে স্পিনোজা (Spinoza) নামে আরেকজন দার্শনিক মনে করিতেন যে চুক্তির ফলে শেষ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সকল দিক দিয়াই আদর্শের পরিচায়ক। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণই বিশ্লেষণ করে না,—ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের বিশেষ সহায়ক। এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন হব্‌স (Hobbes), লক্ (Locke) এবং রুশো (Rousseau)। সমষ্টিগতভাবে এই তিনজন দার্শনিককে "চুক্তি মতবাদী" (Contractualists) বলা হয়।

তিনজনের মতেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল, এবং স্বাভাবিক আইন প্রচলিত ছিল

তাঁহারা তিনজনেই এই বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) ছিল এবং সেখানে কোন সুসংগঠিত সমাজ ছিল না। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত। তবে এই যথেচ্ছচারিতার নিয়ামক ছিল কতিপয় স্বাভাবিক আইন (Natural Laws)। স্বাভাবিক আইনের প্রভাবে মানুষের কলহপ্রিয়তা, জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি কিছুটা দমিত হইত। তবে প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। এই তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি চুক্তি সম্পন্ন করে

সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ করে। প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শুধু জনসাধারণই যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে সেই বিষয়ে এই তিনজন লেখক একমত। এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সংসদের সহিত জনগণের। তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা হব্‌স্, লক এবং রুশোর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই।

১। **"The will of the emperors is law only because the people confer supreme power upon him." Quoted by Gilchrist in "Principles of Political Science." P. 55.**

হব্‌সের (১৫৮৮—১৬৭৯) অভিমত (Views of Hobbes): "লেভিয়াথান" নামক পুস্তকে হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল দুর্বিষহ। মানুষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির পরিবেশে খুবই নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুসুলভ এবং স্বল্পায়ু ("Solitary, poor, nasty, brutish and short.") ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী একজন শাসক নির্বাচিত করে।[1] আমরা হব্‌সের মতবাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, (১) শাসক এই চুক্তির একটি পক্ষ ছিলেন না। তিনি চুক্তি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিতেন।[2] রাজা সর্বদাই চুক্তির উর্দ্ধে। শাসকের হস্তে জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা বিনা সর্তে অর্পণ করে। (২) রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন ; কিন্তু নিজের কাজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি দায়ী থাকিতেন না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিত না। সুতরাং রাজার পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ অরাজকতা এই দুইটির মধ্যে বিকল্প গ্রহণীয় কোন পন্থা ছিল না। রাজা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন চুক্তির ফলে, চুক্তির পূর্বে নহেন।[3] (৩) এই চুক্তিপত্র চিরকালের জন্য প্রযুক্ত। কারণ এই চুক্তি ভঙ্গ করিলেই যে হিংসা, হীন, কদর্য ও পশুসুলভ প্রকৃতির রাজত্ব হইতে জনসাধারণ মুক্তি চাহিয়াছিল তাহাতেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। প্রজারা কোন অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। (৪) সার্বভৌমের ইচ্ছা বা আদেশই আইন হিসাবে বিবেচিত হইত। রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজাও হইতে পারেন অথবা রাজার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি-সংসদ হইতে পারেন। কিন্তু যিনিই

রাজা চুক্তির পক্ষ নহেন

হব্‌স্ গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে চাহিয়াছিলেন

প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে যাইতে পারিত না তাহারা চুক্তিভঙ্গ করিতে পারিত না

১। হব্‌সের লেভিয়াথান বইয়ে বলা আছে যে চুক্তি প্রণয়নের সময় একজন অপর একজনকে বলিত, 'I authorise and give up my right of governing myself to this man, or to this assembly of men, on this condition, that thou give up the right to him, and authorise all his actions in like manners." Hobbes. *Leviathan*,

২। "A superior or Sovereign exists only by virtue of the pact not prior to it". —Dunning.

৩। স্যাবাইন (Sabine) তাঁহার "A History of Political Theory" বইয়ে এই জাতীয় মন্তব্য করিয়াছেন; For Hobbes, "there is no choice except between absolute power and complete anarchy. between an omnipotent sovereign and no society whatever." তাঁহার বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সার্বভৌম হইলেন, তাঁহার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে। জনগণের অধিকার ছিল আইনের উপর, অর্থাৎ সার্বভৌমের আদেশ বা ইচ্ছার উপর, নির্ভরশীল।

হব্‌সের মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। হব্‌সের উদ্দেশ্য তাঁহার মতবাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই। চরম রাজতন্ত্রের সমর্থন করিতে যাইয়া তিনি সমর্থন করিয়াছেন চরমতন্ত্রকে যাহা কোন কোন ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রও হইতে পারে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্রও হইতে পারে। কার্যক্ষেত্রে তিনি চরম সাধারণতন্ত্রকেই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, কার্যক্ষেত্রে মানুষ চুক্তি করিয়া সব ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে তুলিয়া না দিয়া ব্যক্তিসংসদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে।

হব্‌স্ চরম সাধারণ-তন্ত্রেরও সমর্থক, শুধু চরম রাজতন্ত্রেরই নয়।

সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করিলেই যে-কেহ ঐ শক্তির অধিকারী হইবে তাহা নহে। এই ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য। উইলোবির (Willoughby) মতে তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই "লেভিয়াথান" (Leviathan) পুস্তক গণশক্তিকে অস্বীকার করেন। যাহারা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল সেই জনসাধারণকে হব্‌স্ একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব হিসাবে চিত্রিত করেন। লেভিয়াথান নামক সুবৃহৎ সামুদ্রিক জীবনের ক্ষমতা যেমন অবাধ এবং অপরিমেয় তেমনি "লেভিয়াথান" পুস্তকে হব্‌স্ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে করিয়াছেন।

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচিত হয় নাই

হব্‌সের কল্পিত চুক্তি অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রকৃতির রাজত্বের আদিম অধিবাসীদেরই শুধু একটি পক্ষ ধরিতে হইবে; অথচ রাজা চুক্তির ঊর্দ্ধে। শুধু একটি মাত্র পক্ষ থাকিলে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় না। অধ্যাপক লাস্কি[১] বলেন, জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে হব্‌সের আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গী বা ব্যাখ্যা রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহা ছাড়া, তিনি গণ-সার্বভৌমত্বকে কোন অবস্থায় স্বীকার করেন নাই। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বশক্তিমান রাজশক্তিও জনসাধারণের মধ্যেই একটি চুক্তি অথবা ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলতঃ হব্‌স্ ছিলেন আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (legal sovereignty) বিশ্বাসী। যুক্তির দিক দিয়া চিন্তা করিলে হব্‌সের চিন্তাধারার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই একটি স্বচ্ছ চিন্তাধারা। হয়ত তাঁহার ধারণাগুলি ভুল, কিন্তু সেই ধারণা-

১। Laski—Grammar of Politics, P. 91.

গুলির ভিত্তিতে হব্‌স্‌ যে ভাবে তাঁহার মতবাদটিকে দাঁড় করাইয়াছেন সেই পদ্ধতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এইজন্য আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলিয়াছেন, হব্‌স্‌ হইতেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম দার্শনিক।[১] উইলোবি[২] মনে করেন, প্রাকৃতিক আইন ও পৌর আইনের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া বিশ্লেষণাত্মক আইনশাস্ত্রের (Analytical Jurisprudence) গোড়া পত্তন করেন হব্‌স্‌। পরবর্তীকালে বেন্থাম এবং অষ্টিন ইহা পরিবর্তিত করেন।

লকের (১৬৩২-১৭০৪) অভিমত (Views of Locke)—জন্‌ লক্‌ও এই সমাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার "Two Treatises of Government" বইয়ে তিনি রাজাকে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিবার চূড়ান্ত অধিকার যে মানুষের আছে তাহা প্রচার করেন। লকের সহিত হব্‌সের সাদৃশ্য ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা,—মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত, জীবনযাপনের জন্য তাহাদের একটি সুশৃংখল রাষ্ট্রের এবং সুসংগঠিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা অথবা শাসক নির্বাচিত করিত এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু হব্‌সের সহিত লকের পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পাই :—

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশুসুলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না। প্রকৃতির রাজত্বেও একটি নিয়ম ছিল যাহা সকলেই মানিয়া লইত। প্রকৃতির রাজত্বে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত মানুষ কেহ কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিত না[৩] এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে সাম্যভাবও বিদ্যমান ছিল। লকের মতে মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) ছিল। সুতরাং লক যে প্রকৃতির রাজত্বের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষের কতিপয় স্বীকৃত অধিকার থাকায় ইহা এমনিতেই একটি রাষ্ট্রনৈতিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছিল।[৪] তবে এই অবস্থা ছিল প্রাক্‌-রাজনৈতিক অবস্থা, প্রাক্‌-সামাজিক নহে। প্রাক্‌

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব পশুসুলভ এবং কদর্য ছিল না

১। "Hobbes is the first philosopher of The discipline."—Ivor Brown.

২। Willoughby—*The Nature of the State*, P. 6.

৩। "The State of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone ; and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions."—Locke,—Two Treatises of Government. Book 2, Ch. 2.

৪। "Lock's state of nature, with its regime of recognised rights, is already a political Society."—*Social Contract, edited by Barker*,—Introduction.

রাজনৈতিক পরিবেশে সুন্দর এবং সুশৃংখল জীবনযাত্রার কতিপয় বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই অনুভূতি হইতেই মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি চুক্তি করিয়াছিল এবং এই চুক্তি অনুযায়ী রাজা বা শাসকের হাতে শর্তাধীনে মানুষ ক্ষমতা প্রদান করিল।

নিয়ম তান্ত্রিক রাজ-তন্ত্রের প্রতি সমর্থন

লকের উদ্দেশ্য ছিল সসীম রাজতন্ত্র বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমর্থন করা। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) অন্যতম সমর্থক। লকও প্রচার করেন যে রাষ্ট্র শক্তির ভিত্তি কোন একটি ব্যক্তি বা রাজার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে ইহা শাসিতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাজা চুক্তির একটি পক্ষ

দ্বিতীয়তঃ, লকের মতে রাজা অথবা শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ এবং সামাজিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার কাজের জন্য দায়ী। সাধারণতঃ রাজাকে অবাধ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়া হইত না। কারণ, রাজা যদি চুক্তি ভঙ্গ করিতেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকিত। সরকার ছিল চুক্তির একটি পক্ষ। সুতরাং সরকারের দিক হইতে চুক্তিভঙ্গ হইলে অথবা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হইলে জনগণ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বলিতে শাসকের সার্বভৌমত্ব বুঝায় না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা শাসকের ইচ্ছাকে সীমিত করিতে পারে।[১]

লকের মতে দুইটি চুক্তি

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর একটি রাজনৈতিক চুক্তির (political or government compact) মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সরকারী চুক্তি (Governmental Contract) বলা যায়। অবশ্য দ্বিতীয় চুক্তিটির কথা লক্ পরিস্কারভাবে কিছু বলেন নাই। বার্কারের মতে লক্ কোন সরকারী চুক্তির কথা চিন্তা করেন নাই, একমাত্র সামাজিক চুক্তির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লেখকদের মতে সরকারী চুক্তি দ্বারা জনসমাজ বা সম্প্রদায় স্বাভাবিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিবার এবং সেই আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য লকের মতবাদে পরিস্ফুট

১। **Sovereign of the State is not sovereignty of the ruler and "......the will of the State may limit the will and actions of a ruler,"**

হয়। লক পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নহে", এবং "রাষ্ট্রের ইচ্ছাই শাসকের ইচ্ছা ও ক্রিয়াকলাপকে সীমিত করিতে পারে"। লকের মতবাদে সরকার হইতেছে চুক্তির একটি পক্ষ, সুতরাং সরকার যদি ইহার পক্ষের কাজ না করিতে পারে, তবে সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইতে পারে।[১]

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য

লক আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (Legal Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন না ; তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (Political Sovereignty) বিশ্বাসী। লক্ হব্‌সের ন্যায় গণশক্তিকে নীচ এবং ছোট করিয়া দেখেন নাই। ইংলণ্ডের রাজনীতিতে জনসাধারণের সম্মতি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসন অলংকৃত করিয়াছে তাহার গোড়া পত্তন করেন লক। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের যে ক্রমিক প্রসার লক্ষ্য করা গিয়াছিল, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে. মানুষ নিঃশেষে এবং বিনাশর্তে তাহাব সমুদয় ক্ষমতা রাজাকে অর্পণ করে নাই। হব্‌সের মতবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু লক্ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। তবে লক যেভাবে সরকার গঠনের কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের স্থায়িত্ব অল্প ছিল।

লক রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন

উইলোবির মতে লকের মতবাদের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ছিল এই যে তিনি একটি সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregate) এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Political Body) এই দুইটির পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা ভাবে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গণতন্ত্রের যুগে সব সরকারেরই স্থায়িত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে,—কেননা, গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। লক তাঁহার মতবাদ অনুযায়ী ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সমর্থন করেন।

লকের মতবাদেব সমালোচনা

লক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বকে (Political Sovereignty) সমর্থন করিয়াছেন এবং আইনগত সার্বভৌমত্বকে (Legal Sovereignty) কিছু পরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছেন। আইনগত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ কোন কোন ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য হইলেও আইন সঙ্গত হইতে পারে না।[২]

আইনগত-সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা-করা কাম্য নহে

১। "In Locke's form of doctrine...the Government is a party to the contract, and can be justly resisted if it fails to fulfil its part of the bargain.„ Bertrand Russell : Locke's "Political Philosophy."

২। Locke 'failed.........to see that revolution, however desirable, is never legal." Gettell.

রুশোর (১৭১২-৭৮) অভিমত (Views of Rousseau)—রুশো মানুষের উপর আস্থা রাখাকে বিচার এবং বিজ্ঞান অপেক্ষাও বেশী উঁচুতে স্থান দিতেন। মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই ছিল তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; রুশো তাঁহার একটি ব্যক্তিগত ধারণাকেই নিজস্ব মতবাদ রূপ দিয়াছেন, এবং এই ধারণা হইতেছে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার। তাঁহার ধারণার একটি বিশেষ দিক হইতেছে সামাজিক চেতনা (social consicousness) এবং অপর মতে হইতেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করা ও বজায় রাখার আগ্রহ। তাঁহার মতে সার্বভৌমত্ব থাকে চূড়ান্তভাবে সাধারণ মানুষেরই হাতে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়

হব্‌স্‌ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন। ("Rousseau tried to combine the views of Hobbes and Locke.") ১৭৬২-সালে "Social Contract" বইয়ে রুশো তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌স্‌ এবং লকের মতবাদের সংগে তাঁহার মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। তিনিও মনে করতেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল। কিন্তু হব্‌সের ন্যায় তিনি সেই প্রকৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুর্বিষহ বলিয়া বিচিত্র করেন নাই। রুশোর মতে তাহা ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। কিন্তু রুশো সম্পর্কে অনেক সময় এই অভিযোগ করা হয় যে প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনায় রুশো সঙ্গতি বজায় রাখিতে পারেন নাই। মর্লির (Morley) মতে তখন সব প্রচলিত তত্ত্ব প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে শুরু করিয়া আলোচিত হইত বলিয়াই রুশো প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ দিয়াছিলেন।[১] লকের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে সেই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাম্যভাব। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতেই প্রকৃতির রাজত্বে ক্রমশঃ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক নির্বাচন করিল। এই চুক্তির ফলে ব্যক্তির কোন ক্ষতি হইত না। রুশো মন্তব্য করিয়াছিলেন, *"who so gives himself to all gives himself to none"* হব্‌সের মত রুশোও মনে করিতেন যে, শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা

হবস ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য

১। **Rousseau thought about the state of nature "because all his world was thinking and talking about it." (Morley)**

নিজেদের হাতে রাখিল। কিন্তু হব্‌স্‌ মনে করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার। সার্বভৌমের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে। এই বিষয়ে হব্‌সের এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য ছিল না; তবে হব্‌সের মতে সার্বভৌম ছিলেন রাজা, রুশোর মতে সার্বভৌম ছিলেন জনসাধারণ। উভয়েরই ক্ষমতা ছিল অসীম। রুশো বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছার (General will) উপর ভিত্তিশীল ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে—ইহাই ছিল রুশোর অভিমত। সাধারণ ইচ্ছা জনগণেরই সমবেত ইচ্ছা হওয়ায় ইহা ছিল সর্বদাই ন্যায়ের উপর ভিত্তিশীল, কেহ যদি সাধারণ ইচ্ছাকে পালন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত তবে তাহাকে জোর করিয়া ইহা পালন করাইতে হইত যাহাতে সে স্বাধীন হইতে পারে ("forced to be free")।[১] সামাজিক জীবন সম্বন্ধে রুশো ছিলেন প্লেটোর মতই সচেতন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত করিবার আগ্রহে তিনি লককেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন।[২] রুশোর মতে আইন হইতেছে সাধারণ ইচ্ছারই প্রকাশ। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষের হাতেই থাকিবে। ইহা ছিল রুশোর যুক্তি। 'ক্ষমতা' একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে প্রদান করিতে পারে, কিন্তু 'ইচ্ছা' কোন অবস্থায় হস্তান্তরিত করা চলে না।[৩] সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ সাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। রুশোর মতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইল হব্‌সের অভিমত অনুযায়ী রাজার নিকট নয়, অথবা লকের অভিমত অনুযায়ী সংসদের নিকট নয়,—ইহা প্রয়োগ করা হইল সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল সুবিপুল গণশক্তির আধার। রুশো গণসার্বভৌমত্বের যে শক্তির কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হব্‌সের লেভিয়াথানের মস্তকহীন হইলে যাহা হয় তাহারই সামিল।[৪]

১। "Coercion is not really coercion because when a man individually wants something different from what the social order gives him, he is merely capricious and does not rightly know his own good or his own desires". Sabine, "*A History of Political Theory.*" P. 59.

২। "His sense of community was keen as Plato's and his love for individual freedom was more consuming than Locke's.—Hearnshaw.

৩। "The legislative or politional power must always remain with the people, or while power may be delegated, *will* cannot". Willoughby—*The Nature of the State*, p. 81.

৪। এইজন্য বলা হয়, "Rousseau's general will is Hoobbes's Leviathan with its head chopped off............The headless Leviathan of Rousseau is as formidable as the complete monster of Hobbes"—Hearnshaw, *The Development of Political Ideas.*

রুশোর মতবাদে রাজতন্ত্রের স্থান নাই,—রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের প্রয়োজনীয়তা। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে; সুতরাং সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। সরকার গণসার্বভৌমের নিকট প্রাপ্ত ক্ষমতা জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করিত মাত্র। গণসার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের অদল-বদল করিতে পারিত। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে রুশোর ছিল একটি গভীর উন্মাদনা। তিনি মনে করিতেন যে মানুষের স্বাধীনতা নিহিত থাকে 'সাধারণের ইচ্ছা' অনুযায়ী কাজ করিবার মধ্যে। 'সাধারণের ইচ্ছা' প্রতিফলিত হয় স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর মধ্যে। রুশোর মতবাদে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর (liberty, equality and fraternity). বাণী প্রচারিত হয়। রুশো বলিতেন, "জনসাধারণের কথাই, ঈশ্বরের বাণী" ("Voice of the people is the voice of God") এবং "মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাশে বদ্ধ"। ("Man is born free, but everywhere he is in chains"). মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্য কোন রাজনীতিবিদ্ করিতে পারেন নাই। হব্‌সের মতবাদের সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হব্‌সের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহা সমাজের হাতে, হস্তান্তরের অযোগ্য। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য; কিন্তু তাহা রাজার হাতে নহে, তাহা সমাজের হাতে, সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে।

শাসক ও সরকার চুক্তির একটি পক্ষ নহে

মানুষের স্বাধীনতাই বড় জিনিস

লকের মতবাদের সঙ্গেও রুশোর মতবাদের একটি সাদৃশ্য আছে। লকের মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে না; তবে রুশোর ন্যায় লক কখনই জনসাধারণের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণের ("all powers to the people") কথা বলেন নাই। লকের মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার গণপ্রতিনিধিদের আছে; কিন্তু রুশোর মতে তাহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বে (Popular Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন। লক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty) তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

লক এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য

লকের ন্যায় রুশোও বিশ্বাস করিতেন যে জনসাধারণের অধিকার শাসকের

নিকট নহে, সমাজের নিকট সমর্পিত হওয়া উচিত। রুশো রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছিলেন।

সাধারণের ইচ্ছা (General Will) : রুশো বর্ণিত "সাধারণের ইচ্ছা" মতবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা সার্বভৌম বলিয়া হস্তান্তরযোগ্য নহে। সরকার যে ক্ষমতার ব্যবহার করে তাহা অর্পিত ক্ষমতা (delegated powers)। এই ক্ষমতার দ্বারা মৌলিক আইন প্রণয়ন করা যায় না। জি. ডি. এইচ্ কোল (G.D H. Cole) তাঁহার "Rousseau's Political Theory" বইয়ে বলিয়াছেন যে রুশো এই জিনিসের উপরেই জোর দিতেন যে মৌলিক আইন প্রণয়নের কাজ কখনই ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্য কাহারও উপর অর্পণ করা যায় না।[১] সার্বভৌম জনসাধারণের ইচ্ছার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা চূড়ান্ত এবং অভ্রান্ত। সব কিছুর উপরে "সাধারণের ইচ্ছার" স্থান। সাধারণের ইচ্ছা হইতেছে সকল ব্যক্তির "প্রকৃত ইচ্ছার" (real will) সমন্বয়। যদি ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার অমিল হয়, তবে বুঝিতে হইবে ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার কোন ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধিলে সাধারণের ইচ্ছাই বজায় থাকিবে অথবা কার্যকর হইবে।

সাধারণের ইচ্ছার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সম্পর্ক

রুশোর "সাধারণের ইচ্ছা" নীতির মূল্যায়ন (**Evaluation of Rousseau's doctrine of General Will**) : সার্বভৌমত্ব কোন অবস্থায়ই বিভক্ত অথবা হস্তান্তরিত করা যায় না বলিয়া রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাজার স্থান নাই।

কিন্তু "সাধারণের ইচ্ছা" যদি প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা হয়, তবে বুঝিতে হইবে "সাধারণের ইচ্ছা" প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রেও বল প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর জোর করিয়া চাপানো যাইতে পারে। অতএব, রুশোর "সাধারণের ইচ্ছা" মতবাদের মধ্যেও বল প্রয়োগের এবং স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা দেখা যায়। হব্‌স্ যেখানে ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, রুশো সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে রুশোর "সাধারণের ইচ্ছা" মতবাদ একটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক

রুশোর সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের সৃষ্টি করিতে পারে

১। "Rousseau asserted that the function of.........fundamental legislation ....could never be legitimately delegated".—G.D.H. Cole—"Rousseau's Political Theory".

রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক।[১] একদিকে রুশো মানুষের অধিকার সম্বন্ধে উদাত্ত ঘোষণা করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি সর্বকর্তৃত্বময় রাষ্ট্রের সমর্থন করিয়াছেন।[২]

যদিও রুশো কর্তৃক 'সাধারণের ইচ্ছা' মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়, তবুও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রুশো একটি উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন এবং ইচ্ছার উপরেই ভিত্তিশীল ; ইহা জনগণের নিষ্ক্রিয় ইচ্ছা এবং আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে—রুশো ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই কার্যকর হয়। কিন্তু সেজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠকে যে উপেক্ষা করা হয়, তাহা নহে। রুশো এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে প্রতিটি ব্যক্তিই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছার সমষ্টিই সাধারণের ইচ্ছার রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণের স্বার্থে এই ইচ্ছা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়।

অধ্যাপক লাস্কি রুশোর "সাধারণের ইচ্ছা" (General will) নীতিটির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রুশো বর্ণিত সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যা গরিষ্ঠের (will of the majority) ইচ্ছা ; এবং ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয়দান করে, সেইদিক দিয়া বিচার করিলে রুশো বর্ণিত 'সাধারণের ইচ্ছা' হব্‌সের 'লেভিয়াথানের' ন্যায় অমিত-শক্তিশালী এবং স্বেচ্ছাচারী। রুশো বর্ণিত "সাধারণের ইচ্ছা" প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে ছিল রাষ্ট্রের হাতে। কেননা জনসাধারণ রাষ্ট্র গঠন করিত। ইহাতে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল যদিও সেই রাষ্ট্র জনগণেরই রাষ্ট্র। এইজন্য বার্কার বলিয়াছেন, যে রুশোর সম্পূর্ণ গণতন্ত্র হইতেছে বহু মানুষের স্বৈরাচার, এবং এই গণসার্বভৌমের সবকিছু করার অধিকারের বিপক্ষে কোন রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রুশো রাখেন নাই।[৩] রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সমন্বয় আনিবার জন্য, কিন্তু তাঁহার সেই

"সাধারণের ইচ্ছা" নীতিটির সমালোচনা

১। **Rousseau's doctrine, though it pays lip-service to democracy tends to be the justification of totalitarian State. —Bertrand Russell.**

২। **"Rousseau is equally the father of the Declaration of Rights and of the Authoritarian State. —Lloyd : *Democracy and its Rivals.***

"Rousseau's problem of combining State sovereignty with the freedom of the subject remained unsolved." —Hearnshaw.

৩। **"Rousseau's perfect democracy is still a multiple autocrat. He leaves no safeguard against the omnipotence of the sovereign." —Barker.**

প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, বর্তমানকালের রাষ্ট্রীয় জীবনে "সাধারণের ইচ্ছা" মতবাদের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

রুশো বর্ণিত প্রাথমিক গণতন্ত্র—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক আইন প্রণয়ন আধুনিক কালের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কোন রাষ্ট্রের আয়তন খুব বড় হইয়া গেলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালানো সম্ভবপর নয়। আইন প্রণয়নের জন্য যে বিচার বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার, সাধারণ মানুষের তাহা সর্বদা নাও থাকিতে পারে। এইজন্য বাস্তবে রুশোর তত্ত্বটি গ্রহণ করিবার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা—সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। স্যার হেনরী মেইন সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, "Nothing could be more worthless than this theory." এই মতবাদের যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তাহা রুশো নিজেও অনুভব করিয়াছিলেন।[১] ১৬২০ সালে ইংলণ্ড হইতে ১০১ জন দেশত্যাগীর মধ্যে সম্পাদিত রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মে-ফ্লাওয়ার চুক্তিকে আমরা কখনই এই মতবাদের সমর্থনে গ্রহণ করিতে পারি না।[২] কারণ সেই চুক্তি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের সৃষ্টির হয় নাই অথবা সেই চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে কোন প্রকৃতির রাজত্বও আমরা দেখিতে পাই নাই। এই চুক্তি অনুযায়ী যে সকল ইংরেজ দেশত্যাগী চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সরকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন ; সুতরাং তাহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে একটি অবস্থা হইতে অন্য একটি অবস্থায় পরিবর্তন।[৩]

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদটি অযৌক্তিক। যাহারা আদিমকালের প্রকৃতির

১। Rousseau saw "clearly that the state of nature and the social contract are not historical facts but logical abstractions." Mabbott : The State and the Citizen.

২। মে ফ্লাওয়ার চুক্তি (Mayflower compact) অনুযায়ী চুক্তিকারীগণ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন, "We do solemnly and mutually, in the presence of God and one another, covenant and combine ourselves together into a civil body politic for our better ordering and preservation."

৩। গিল্‌ক্রাইষ্ট ইংরাজ দেশত্যাগীগণ সম্বন্ধে বলেন, "They were already familiar with government ; what they did was to institute among themselves what they were familiar with under different conditions." Gilchrist—Principles of Political Science, p. 66.

রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হব্‌সের ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও পশুসুলভ, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল,—তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। এরিষ্টটল অনেক আগেই বলিয়াছিলেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী। সুতরাং ভূস্বর্গ হোক অথবা একেবারে কদর্য ও পশুসুলভই হোক,—প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং "স্বাভাবিক" অধিকার ছিল, ইহা অসম্ভব। কেননা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ সেখানে ছিল না—সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক

তৃতীয়তঃ, তাহা ছাড়া, এরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই অভিমত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, রাষ্ট্রকে কখনই তৈয়ার করা হয় না; রাষ্ট্র নিজ হইতে গড়িয়া উঠে। কেননা রাষ্ট্র একটি প্রকৃতিদত্ত প্রতিষ্ঠান (a natural institution)। রাষ্ট্র কখনই চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। কাণ্ট (Kant) অভিমত পোষণ করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী না হইলেও, এই মতবাদ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু কাণ্টের অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক যে সর্বদাই চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাহা ঠিক নহে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহার জন্য ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিবর্তন হইতে পারে এবং এই পরিবর্তন চুক্তি দ্বারা পূর্ব হইতেই স্থির নাও করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট নহে; এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক চুক্তির উপর ভিত্তিশীল নাও থাকিতে পারে

চতুর্থতঃ, সর্বশেষে, এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে, মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্তুতে পরিণত করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট করিয়া দিতে পারে। কারণ, জনমত যে সর্বদাই বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা নহে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিপজ্জনক দিক

মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলা ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে,—ইহা অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত; সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে আছে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্যায়ন এবং গণতন্ত্রের বিকাশে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভূমিকা (Evaluation of the Social Contract Theory and its role in the evolution of Democracy) :

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও ইহার ভাল দিকটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণের সম্মতি,—এই সত্যটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং এইদিক হইতে ইহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক।[1] একটি চুক্তি বলিতে আমরা বুঝি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় বাধ্যবাধকতা। আধুনিককালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার একটি শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারকে কাজ করিতে হয়।

রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার উৎস হইতেছে গণশক্তি

সামাজিক মতবাদে ইহাই বলা হইয়াছে যে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার শর্ত থাকিবে এবং শাসককে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূলকথা। কারণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (General will) উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি "সামাজিক" চুক্তি ; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার। এখানেই সামাজিক চুক্তির মতবাদ গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। আমরা এক্ষেত্রে ডক্টর ফ্রিড্‌ম্যানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস যে গণশক্তি,—ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গণতান্ত্রিক মতবাদগুলির অগ্রণী করিয়াছে।[2]

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য

১। "Social contract theory was the first attempt to reconcile government and consent, by the assertion that government was founded on men's mutual consent to set it up."

—A. D Lindsay. *The Modern Democratic State* P. 231.

২। "What links all protagonists of the social contract theory is that they find the source of political power in the people. In that sense, the whole theory of social contract is a forerunner of democratic theory."

—Friedmann

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এবং রাজা অথবা শাসককুলকে যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য যাঁহারা তাঁহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে তাঁহাদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়, গণতন্ত্রের এই সত্যটি স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে লকের মতবাদ প্রচারের সময় হইতে। লক্ বলিয়াছিলেন, সরকার হইতেছে জনসাধারণের একটি নৈতিক অছি (moral trust) স্বরূপ। যখনই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক অস্বীকৃত হইবে, তখনই জনসাধারণ সরকারের উপর হইতে তাহাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবে এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিবে।[১]

শাসকগণ নিজেদের কাজের জন্য প্রজাগণের নিকট দায়ী

১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব,—ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লক এবং পরবর্তীকালে রুশোর মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী চিরকাল নিপীড়িত মানবাত্মাকে সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছে। নিজেদের সরকার নিজেদেরই প্রতিষ্ঠা করা, সাধারণ ইচ্ছার উপর সরকারের স্থায়িত্ব—ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মতবাদ হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক হইলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ইহার অবদান খুবই বেশী। সমাজের প্রত্যেককেই সমান সুযোগ এবং অধিকার প্রদান করা আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু রুশো এই মতবাদ পূর্বেই প্রচার করিয়াছেন। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সার্বিক ভোটাধিকারের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর রুশোর মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হইত সমাজের সব লোকের মধ্যে। মূলতঃ ইহা যে একটি চুক্তি, অর্থাৎ ইহার পিছনে যে চুক্তিকারীদের প্রত্যেকেরই সমর্থন

বিশ্বের বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিপ্লবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভূমিকা

এই মতবাদ গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক

১। "...........the trust must necessarily be forfeited and the power must devolve into the hands of those that gave it."

—Locke · Two Treatises on Government.

আছে এবং সর্বোপরি ইহা যে একটি সামাজিক চুক্তি, তাহাই এই মতবাদকে গণতান্ত্রিক করিয়াছে। যদিও হব্‌স্ আইনানুগ সার্বভৌমত্বের সমর্থক ছিলেন, তবুও পরবর্তীকালে লক্ এবং রুশোর মতবাদ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছে ইহার ফলে এই মতবাদ এবং গণতন্ত্রের ক্রমপরিণতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের উপরেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। আইন অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অষ্টিন এবং অন্যান্য লেখকগণ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হব্‌স্ প্রদত্ত তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, লকের 'Civil Government বইয়ে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের (Separation of Powers) প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষতঃ লক্ বিচারবিভাগের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তীকালে মণ্টেস্কু (Montesquieu) তাঁহার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর এই মতবাদের প্রভাব

হব্‌স্, লক্ এবং রুশো, তাহারা তিনজনেই সার্বভৌমত্বের তিনটি বিশেষ রূপ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এইভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সার্বভৌমত্বকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণ চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে এবং চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক আশাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। লকের মতে যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গঠন করা হয়, তাহা যদি কোন অবস্থায় ব্যর্থ হয়, তবে জনসাধারণ রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। রুশোর মতে জনসাধারণকেই সর্ব অবস্থায় রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রসারণে জনসাধারণের যে সর্বদাই একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকিবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সেই আশার বাণী প্রচার করিয়াছে। সর্বশেষে, সামাজিক চুক্তি মতবাদই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। লক্ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রগঠন এবং সরকার গঠন এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা ব্যাখ্যা করেন। যাঁহারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়েই সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। দেখা যাইতেছে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোর সঠিক ব্যাখ্যাও সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়া যায়।

(১) সার্বভৌমত্বের রূপদান.
(২) রাষ্ট্রনৈতিক আশাবাদের সৃষ্টি
(৩) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ, প্রভৃতি হইতেছে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যান্য অবদান

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্বের কতটা প্রতিষেধক ? (How far is the Social Contract Theory an antidote to the Theory of Divine Origin ?) সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য হইতেছে এই যে ইহা 'রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে' এই মতবাদের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করিয়াছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্বে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সামাজিক চুক্তি মতবাদে শাসক জনসাধারণের প্রতিনিধি। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্বে রাজার কর্তৃত্বের পিছনে ঐশ্বরিক অনুমোদন (divine sanction) ধরিয়া লওয়া হয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদে শাসকের ক্ষমতা জনসাধারণের অনুমোদনের (Popular sanction) উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্বে প্রজাগণ কখনই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না এবং রাজা বংশানুক্রমে শাসন করিয়া যান। কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদে কে শাসক হইবেন তাহা জনসাধারণ স্থির করেন, শাসকের কি কি ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি যদি ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করেন অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদে সার্বভৌমত্ব সর্বদাই রাজার হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ, রুশোর মতে সার্বভৌমত্ব সর্বদাই জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত। "সাধারণের ইচ্ছা" দ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সরকার পরিচালিত হয়। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে গণচেতনার বিদ্রোহ, স্বৈরাচারের বিলুপ্তি সাধন পূর্বক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গণ-সার্বভৌমত্বের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা,—ইহাই হইতেছে সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই মতবাদ ছিল গণতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা যাহা বলিতেন নির্বিচারে জনসাধারণকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু, এই মতবাদের পরবর্তী যুগে যখন সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচলিত হইল, তখনই মানুষ গণতন্ত্রের প্রথম শিক্ষা পাইল, মানুষ বুঝিতে শিখিল যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাংখার পরিপূর্ণতার মধ্যেই রাষ্ট্র সৃষ্টির সার্থকতা। জনগণের কথাই ভগবানের বাণী ("voice of the people is the voice of God"),—সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই আওয়াজের মধ্যেই স্বৈরাচারী রাজাদের গর্ব খর্ব করিয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট রাজাগণ বংশ পরম্পরায় নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করিবার জন্য এবং স্বৈরাচার বজায় রাখিবার জন্যই ভগবানের দোহাই দিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাজতন্ত্রই হইতেছে ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্বে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি — সামাজিক চুক্তি মতবাদে শাসক জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক তত্ত্ব এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য

এবং রাজা তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন না। কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদই সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা করে। ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট রাজাদের রাজত্বের পর গৌরবময় বিপ্লব সেই দেশের শাসনব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন সূচিত করিয়াছিল। সেই জন্যই বলা হয়, সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক।

বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদ (Evolutionary or Historical Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রগঠনের কোন একক উপাদান নাই। ঐশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই অথবা পশুবলও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা অথবা পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাও সত্য নহে।[১]

রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদে

রাষ্ট্রের সৃষ্টির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদে। রাষ্ট্র মানব সমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের ("continuous development of human society") ফল,—বার্জেস এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন। শুধু বার্জেস নহে, আধুনিককালের অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এই অভিমত পোষণ করেন। বিশেষতঃ স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) প্রমুখ, ইতিহাস-আশ্রয়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকগণ এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে মানব সমাজের এক বিবর্তনের মাধ্যমে। আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন হিসাবে গঠিত হইতেছে। এই মতবাদ ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical theory) অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Evolutionary theory) বলিয়া পরিচিত। বেইজহট (Bagehot) তাঁহার "Physics and Politics" বইয়ে সরকারী ক্রমবিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন: (১) প্রথা তৈয়ার করার পর্যায় এবং সেই সঙ্গে সরকারের অনুপস্থিতি (the stage of

মানব সমাজের বিবর্তনের মধ্যেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি

১। "The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."

—Garner, Political Science and Governments. P. 20.

custom-fixing coinciding with practical absence of government): (২) আন্তঃগোষ্ঠী দলাদলির পর্যায় এবং সেই সঙ্গে সরকারের কতিপয় উপাদান (the stage of inter-group conflicts coinciding with the rudiments of government); এবং (৩) আলোচনা ও আপোষের পর্যায় এবং সেই সঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধন। অনুরূপভাবে স্পেন্সার (Spencer) তাঁহার "Principles of Sociology" বইয়ে সামাজিক বিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেইগুলি হইতেছে উপজাতীয় (tribal), সামরিক (military) এবং শিল্পজাত (industrial) পর্যায়। এই মতবাদ বর্তমানে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতবাদের নিম্নলিখিত উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রমবিবর্তনের তিনটি পর্যায়

প্রথমতঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। এরিষ্টটল অনেক আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হিসাবে বাস করিবার প্রেরণা (kinship) সৃষ্টি হইয়াছে পরিবার হইতে। সুতরাং রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রক্তসম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবারে একত্রিত করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। গোষ্ঠী সম্পর্কে চেতনা রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যতম উপাদান। সমগ্র গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীপতি। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে সৃষ্টি হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতি। এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে।[১]

সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার প্রেরণা মানুষের স্বভাবজাত—রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং পারিবারিক বন্ধন

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্র গঠনের একটি বিশেষ উপাদান। রক্তসম্পর্কের বন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একই ধর্মের ভিত্তিতে। গোষ্ঠী-জীবন পর্যন্ত রক্তের বন্ধন এবং ধর্ম একই জিনিসের দুইটি দিক; কেননা উভয়েই সমানভাবে পারিবারিক জীবন এবং গোষ্ঠী-জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারাই সামাজিক জীবনের সব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। গোষ্ঠীপতিও অনেকক্ষেত্রে ধর্মাচরণে নেতৃত্বে প্রদান করিতেন। প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। অতি প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত।

১। "...the extended kin-relation merges into the relation."

—MacIver—*The Modern State* P. 26-27

সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ পুরোহিতগণ এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করার দাবী করিয়া সমাজের অন্যান্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় রাজারাও এই ধর্মসম্বন্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মগুরু আখ্যা দিতেন। বর্তমানকালে ইংলণ্ডের রাণী সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মহাসংগঠনের প্রধান (Head of the Established Church) হিসাবে পরিচিতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হইবার অনেক পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থায় রাষ্ট্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ethical compulsion) বলিয়া বিবেচিত হয়।

ধর্মের বন্ধন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক

তৃতীয়তঃ, রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও রাষ্ট্রগঠনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে যুদ্ধবিগ্রহ, সামরিক শক্তির (Force) প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক শক্তির প্রয়োগ। ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইল, তখন নিজেদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোষ্ঠী-গঠনের পরবর্তী স্তরে গঠিত হয় উপজাতি (Tribe) উপজাতীয় সংগঠন প্রাথমিক ভাবে সামরিক সংগঠন হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, শক্তিশালী উপজাতি কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল উপজাতির উপর আক্রমণ করা। এইভাবে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামরিক সংগঠন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যিনি নেতা নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত। সংগ্রাম এবং যুদ্ধবিগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত যে যদি দুইটি দল কখনও শক্তি দ্বারাও একত্রিত হয়, তবে তাহা হইতেই কিছুদিন 'পর সাধারণ স্বার্থ হেতু ঐক্যবোধ প্রসারিত হইতে পারে।[১] তবে এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু শারীরিক বল অথবা সামরিক শক্তিই কখনও রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল না।

সামরিক শক্তি রাষ্ট্র-সৃষ্টির অন্যতম উপাদান

১। "...struggle and warfare are, therefore, historically most important element in state formation, and it is certain that the union of two groups even by force, develops after a while common interests out of which is born a sense of unity."

—Soltau—*An Introduction to Politics.* P. 53.

শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ, শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ রাষ্ট্র সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইবার পর মানুষ সরকার গঠন করিবার প্রেরণা পায়। সরকার গঠিত হইবার পর বহিরাক্রমণ হইতে নিজের স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখিবার জন্য এবং বাহিরের নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে সরকারকে মুক্ত রাখিবার জন্য মানুষের মনে প্রেরণা আসে। এইভাবেই সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হয় এবং ইহা রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে। রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াও জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবারের সৃষ্টি হয়, পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিল, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি ছিল মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic activities)।

রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property) রাষ্ট্র গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দারিদ্র্য, ক্ষুধা প্রভৃতি অভাবজড়িত অর্থনৈতিক চাপ এবং নিজের জাতীয় সমষ্টিতে রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং একটি স্বাধীন সামাজিক ব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য প্রেরণাও রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। যাহারাই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে তাহারাই সেই ধনসম্পত্তি বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রয়োজন হইয়াছে একটি শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ নিজের ধনসম্পদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে। এই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্যও মানুষ একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য তৎপর হইয়াছে। কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, তাহা ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে।

রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব —ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির প্রভাব

সংক্ষেপে ইহাই রাষ্ট্র গঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অথবা ঐতিহাসিক মতবাদ। রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যান্য মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, এই মতবাদের

সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে। মানুষ একত্রিত হইয়া বাস করিতে চায়—মানুষের মধ্যে সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার মধ্যে এবং একজন শাসকের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে আমরা একটি ঐশ্বরিক উপাদন (divine element) খুঁজিয়া পাই।

এই মতবাদের অন্যান্য মতবাদে উপাদানও দেখা যায়

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের আদিরূপ যে একটি পরিবার এবং তাহা যে বহুল পরিমাণে শারীরিক শক্তির (physical force) উপর নির্ভরশীল ছিল এই তথ্যটির স্বীকৃতিও আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। কিন্তু এককভাবে কোন উপাদানই রাষ্ট্র গঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপাদানের বিচিত্র সমাবেশেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ক্রমপ্রগতি।

সংক্ষিপ্তসার

১। **রাষ্ট্র স্থষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুকম্পার উপর নির্ভর করে এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজতন্ত্র হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপদ্ধতি। রাজা কাহারও নিকট কাজের জন্য দায়ী নহেন; প্রজাদের উচিত বিনা দ্বিধায় রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। এই মতবাদ ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল, কারণ, রাজারা নিজেদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য এই মতবাদ সমর্থন করিতেন। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন নাই।

২। **"রাষ্ট্র বলপ্রয়োগে স্থষ্ট" মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলবান কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। এই মতবাদ অনুযায়ী বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু এই মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে; তবে বলপ্রয়োগে রাষ্ট্র সৃষ্টি অথবা রাষ্ট্র সংগঠনের পক্ষে অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে একটি। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য সামরিক শক্তি অপরিহার্য।

৩। **সামাজিক চুক্তি মতবাদ**—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। হবস্, লক্, এবং রুশো এই মতবাদ প্রচার করেন। হবসের মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে একটি প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ বাস করিত। এই প্রকৃতির রাজ্য ছিল কদর্য, নিঃসঙ্গ, এবং হীন। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজা বা শাসক নির্বাচন করে এবং তাহার হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করে। এইভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। হবস্ আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) সমর্থক ছিলেন।

লকের মতে 'রাষ্ট্রের পূর্বে যে প্রকৃতির রাজ্য ছিল তাহা পশুসুলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না; মানুষ সেখানে স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু, সুশৃংখল সামাজিক জীবনের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন লোকেরা একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা বা শাসক নির্বাচন করিল। রাজা সামাজিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জনসাধারণের একটি

প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিতেন। লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty) সমর্থক ছিলেন।

রুশোর মতবাদে হবস্‌ এবং লকের মতবাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় প্রকৃতির রাজ্য অসহনীয় মনে হইতে থাকে। তখন এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল এবং হাতে রাখিল। এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ নিজেদের সমষ্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। রুশো ছিলেন গণ-সার্বভৌমত্ব বা লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) সমর্থক।

৪। ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনমূলক মতবাদ—এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে মানব সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য দিয়া। মানুষ ক্রমে ক্রমে, পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতিগঠনের মাধ্যমে একত্রে বাস করিবার প্রেরণা, ধর্মের বন্ধন, রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এই উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে পরিবারের সৃষ্টি, তারপর পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সবশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হইতেছে মানব-সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা। এই মতবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে।

Exercise

1. Examine the Theory of Divine Origin of the State. (৩০-৩৩ পৃষ্ঠা)
[রাষ্ট্রসৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ পরীক্ষা কর।]

2. Do you think that the State is the handiwork of God? (৩০-৩৩ পৃষ্ঠা)
[রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি—তুমি কি ইহা মনে কর।]

3. Describe the Patriarchal and the Matriarchal Theories of the origin of the State. (৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা)
[রাষ্ট্র সৃষ্টির পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ বর্ণনা কর।]

4. State and criticise the Theory of Force as an explanation of the origin of the State. (৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা)
(C. U. B. A. Part I, Old Regulation, 1966)
[রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ আলোচনা এবং সমালোচনা কর।]

5. "Government rests on force".
"Government rests on opinion."—Discuss the statements carefully. (৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা)
["সরকার শক্তির উপর ভিত্তিশীল" "সরকার জনমতের উপর ভিত্তিশীল" উক্তি দুইটি সযত্নে আলোচনা কর।]

6. How do Hobbes, Locke and Rousseau differ from one another in their interpretations of the Social Contract Theory and its implications? (৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা)
[হবস্‌, লক এবং রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং ইহার তাৎপর্য কি?]

7. Critically examine the main features of Social Contract Theory of Hobbes and Locke. (B. U. 1961) (৩৯-৪৫ পৃষ্ঠা)

[হবস এবং লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমালোচনাসহ পরীক্ষা কর।]

8. "Rousseau tries to combine the theories of Hobbes and Locke." Elucidate. (৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. 1961)

["রুশো হবস এবং লকের মতবাদের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" উক্তিটির সম্প্রসারণ কর।]

9. State the points of agreement and difference between Hobbes and Locke as expounders of the Social Contract theory. [৩৯-৪৫ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. 1957)

[সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে হবস্ এবং লকের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর।]

10. State and evaluate the Social Contract theory as a theory of the origin of the State. (৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা ; : ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. Part I. Revised Regulation, 1966),

[রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা কর এবং ইহার মূল্যায়ন কর।]

11. Discuss the practical importance of the Social Contract Theory in actual political development. (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

[প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা কর।]

12. Do you find anything of permanent value in the Social Contract Theory ? (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

[তুমি কি সামাজিক চুক্তি মতবাদ চিরকালীন মূল্য কিছু দেখিতে পাও।]

13. In what sense is the Social Contract Theory an antidote to the Theory of Divine Origin ? (৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

[কি অর্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক ?]

14. "The Social Contract Theory contributed much to the growth of Democracy."—Discuss the statement. (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

["গণতন্ত্রের উন্নয়নে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান খুবই বেশী ছিল"।—উক্তিটি আলোচনা কর।]

15. "The accepted theory of the origin of the State is the Historical or Evolutionary Theory."—Discuss. (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

["রাষ্ট্র সৃষ্টির সম্পর্কে গৃহীত তত্ত্ব হইতেছে ঐতিহাসিক মতবাদ অথবা বিবর্তনমূলক মতবাদ"—উক্তিটি আলোচনা কর।]

16. "The State is a growth, not a make".—Discuss the statement (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

["রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিবর্তন, সৃষ্ট জিনিস নহে"—উক্তিটি আলোচনা কর।]

17. Discuss the Evolutionary Theory regarding the origin of the State (C. U.—B. A. 1968) (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

[রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর।]

18. "Rightly understood, all the best elements in the several theories of the State—the Divine Right Theory, the Force Theory and the Contract Theory—enter into the Evolutionary Theory of the State."—Discuss the statement. (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

["ঠিকভাবে বুঝিলে রাষ্ট্র সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদের অর্থাৎ ঐশ্বরিক বলপ্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের—শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে"।—উক্তিটি আলোচনা কর।]

19. "The State is a product of History." Explain fully. (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)
(B. U. 1965)

["রাষ্ট্র হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি"—সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা কর।]

20. Explain and evaluate Rousseau's doctrine of General Will.
(৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

[রুশোর "সাধারণ ইচ্ছা" মতবাদ—ব্যাখ্যা কর এবং ইহার মূল্যায়ন কর।]

21. Discuss critically the Social Contract Theory regarding the origin of the State. (C. U. B. A. 1971)

[রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির সমালোচনা কর।]
(৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা ; ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা)

22. Explain with reference to the views of Hobbes, Locke and Rousseau the Social contract theory regarding the origin of the State. What are the defects of this theory ? (C. U. B. A. 1969)

[হবস্, লক এবং রুশো ;—উহাদের মতবাদের উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে "সামাজিক চুক্তিবাদ" নীতির ব্যাখ্যা কর। এই নীতির কি কি দোষত্রুটি আছে ?] (৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা ; ৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায় | রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of the Nature of the State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী তত্ত্বগুলির মধ্যে জৈব মতবাদ (Organic Theory), আদর্শ সম্পর্কিত মতবাদ (Idealist Theory), মার্ক্স প্রদত্ত তত্ত্ব (Marxian Theory) এবং আইন সংক্রান্ত মতবাদ (Juristic Theory) প্রধান।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদ (Organic theory of the nature of State): জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের (organism) সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি জীবদেহের প্রকৃতির অনুরূপ, ইহাই এই তত্ত্বের মূল কথা। জীবদেহের জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু এবং ইহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রমবর্ধন সবই রাষ্ট্রদেহে আমরা অনুরূপ দেখিতে পাই। গাছের সহিত পাতার সম্পর্কের ন্যায় এবং মস্তকের সহিত সমস্ত শরীরের সম্পর্কের ন্যায় মানুষের সহিত সমাজের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে।[১] জীবদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন

এই মতবাদের মূল কথা হইতেছে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণীর প্রকৃতির অনুরূপ

১। "...............as is the relation of the head to the body, or the leaf to the tree, so is the relation of man to society." —Leacock.

রাষ্ট্র হইতেছে একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী ;—ইহা একটি প্রাণহীন যন্ত্র (a lifeless instrument) মাত্র নহে। জীবের যেমন জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু, আছে, রাষ্ট্রের মধ্যেও সেইপ্রকার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু দেখা যায়। জৈব মতবাদ সম্পর্কে এই জাতীয় যুক্তি দেখিতে পাই ব্লুণ্টশ্‌লি (Bluntschli) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখায়। এইভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া জৈব মতবাদের তত্ত্বটি একদিকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরোধী হইয়াছে এবং অপরদিকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আইন সংক্রান্ত মতবাদেরও বিরোধী হইয়াছে।

এই মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীসের প্লেটো ও এরিষ্টটল, রোমের সিসারো (Cicero) এবং মধ্যযুগের চিন্তাবীর জন অফ্ সেলিসবারি (John of Salisbury) মার্সিগলিও (Marsiglio of Padua) প্রভৃতি লেখকগণ রাষ্ট্র এবং জীবদেহের বিভিন্ন সাদৃশ্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। জার্মান দার্শনিক ব্লুণ্টশ্লি এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্সার প্রভৃতি লেখকগণ এই তত্ত্বের সমর্থক। সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনমূলক মতবাদের উদ্ভব হইবার পর জীবদেহের ক্রমপবিবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্রমপরিবর্তনের তুলনা করিবার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় জৈব মতবাদ এতদূর প্রভাবশালী ছিল যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান একই সঙ্গে আলোচিত হইত বলা চলে। ব্লুণ্টশ্‌লি এই মতবাদের খুবই গোঁড়া সমর্থক।[১] স্পেন্সার রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে শুধু সাদৃশ্যগুলিই নহে, বৈসাদৃশ্যগুলিও আলোচনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখিতে পাই :—

রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য

(১) জীবদেহে যেমন আমরা অনেক জীবকোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই। জীবদেহের কোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এবং সমগ্রভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও সেইপ্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।[২]

১। ব্লুণ্টশ্‌লির ভাষায় "As an oil painting is something more than a mere aggregation of drops of oil, as a statue is something more than a combination of marble particles, as a man is something more than a mere quantity of cells and blood corpuscles, so the nation is something more than a mere aggregation of citizens, and the state something more than a mere collection of external regulations."—Quoted by Garner in his "Political Science and Government." P. 178.

২। "........Just as the hand depends on the arm and the arm upon the body and the head, so do the parts of the social organism depend on each other."

(২) জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রের আদিতে ছিল কতিপয় মানুষ যাহারা রক্তসম্পর্কের বন্ধনে একটি পরিবার গঠন করে। জীবদেহের ক্রমবর্ধনের সহিত যেমন বিভিন্ন জীবকোষ জটিল আকার ধারণ করে, রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধনের সহিত সেইপ্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়িয়া যায়। শরীর হইতে কোনও একটি সাধারণ কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন সমগ্র শরীরের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, সেইপ্রকার রাষ্ট্র হইতে কোন নাগরিক বিচ্ছিন্ন হইলে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় না অথবা ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

জীবদেহের ক্রমবর্ধনের ন্যায় রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধনও জটিল আকার ধারণ করে

(৩) জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানও সেইপ্রকার একটি সরকার কর্তৃক চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সমগ্রদেশের জন্য একটি সরকারের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থা যেমন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কযুক্ত, জীবদেহের বিভিন্ন শিরা-উপশিরাও সেইপ্রকার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জীবদেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে যেমন শিরা উপশিরা মারফৎ যোগাযোগ আছে, সেইপ্রকার রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা (communication system) দেখিতে পাই।

জীবদেহ স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চালিত, রাষ্ট্রও সরকার কর্তৃক চালিত

(৪) জীবদেহের কোন অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে নূতন অংশ অনেক সময়ে গঠিত হয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের স্থান পূরণ করে সেইপ্রকার রাষ্ট্রেও একটি যুগের পর আরেকটি যুগ আসে, একটি সরকারের স্থান আরেকটি সরকার গ্রহণ করে, এবং বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান নূতন লোক দিয়া পূরণ হয়।

জীবদেহের ক্ষয় এবং ক্ষয়পূরণের সহিত রাষ্ট্রের ক্ষয়পূরণের সাদৃশ্য

সমালোচনা: রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে উপরে বর্ণিত সাদৃশ্যগুলি থাকা সত্ত্বেও স্পেন্সারের মতে তাহাদের মধ্যে দুইটি মূল পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, মানবদেহের গঠন দৃঢ় সম্বদ্ধ,--যে সকল কোষ লইয়া ইহা গঠিত সেইগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা অসংলগ্ন নহে; একটি দেহকে কেন্দ্র করিয়া সেইগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে এবং রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে। তাহারা খুবই অসংলগ্ন।

জীবদেহের কোষগুলি অসংলগ্ন নহে, রাষ্ট্রের অধীনস্থ মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ঐক্য অসংলগ্ন

দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত

থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে না। এই তত্ত্বটি রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে একটি তুলনা মাত্র; ইহা কখনই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অথবা কর্মপরিধি সম্পর্কে আলোকপাত করে না।

দেহের চেতনা ক্ষুদ্র অংশে কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা নহে

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা অন্যান্য অনেক বৈসাদৃশ্যও দেখিতে পাই। যেমন, জীবদেহ হইতে যদি কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কোন রাষ্ট্র হইতে যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর রাষ্ট্রে চলিয়া যায়, তাহাতে সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ, জীবদেহের কোন কোষের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব অথবা ইচ্ছা নাই,—সমগ্র দেহকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার অস্তিত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা পৃথক ইচ্ছা থাকে। জীবদেহের চেতনা যেখানে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের চেতনা সেখানে সরকারে কেন্দ্রীভূত নহে। রাষ্ট্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতর সেই চেতনা বিক্ষিপ্ত থাকে। জীবদেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু রাষ্ট্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়। জীবদেহ অনবরত মস্তিষ্কের অথবা স্নায়ুতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে অনবরত সরকারের পরিবর্তন হয়। কোন জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহে হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ধিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা খাটে না। রাষ্ট্র প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে গঠিত হয় না। রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে ঐতিহাসিক ক্রমপ্রগতি অথবা বিবর্তনের সাহায্যে।

জীবদেহের কোন কোষের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই, ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; রাষ্ট্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়

জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের মধ্যে জনসাধারণের ঐক্য এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। এইদিক হইতে এই মতবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে।[১] প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ,—শরীর হইতে হাত, পা যেমন বাদ দেওয়া যায় না, সেইপ্রকার সমাজ এবং রাষ্ট্র হইতে

১। হবহাউস (Hobhouse) এই প্রসঙ্গে বলেন, "...........the life of society and the life of an individual do resemble one another on certain respects, and the term 'organic' is as justly applicable to the one as to the other, for an organism is a whole, consisting of interdependent parts. Each part lives and functions and grows by subserving the life of the whole. It sustains the rest and is sustained by them and through their mutual support comes a common development."—Hobhouse—Social Evolution and Political Theory. P. 8.

ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না। শরীর যেমন বিভিন্ন কোষের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রও সেই প্রকার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই পর্যন্ত জৈবমতবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈবমতবাদ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছে সেই সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বার্কার (Barker) বলিয়াছেন "The state is not an organism , but it is like an organism," "যদিও মানবদেহের সহিত রাষ্ট্রের কাঠামোর কতিপয় সাদৃশ্য আছে, তবুও এই সাদৃশ্যকে বড় করিয়া দেখিবার কোন যুক্তি নাই। ডক্টর লিকক (Dr. Leacock) এই মতবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না।[১]

জৈবমতবাদের গুরুত্ব

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে—এই কথা বলিয়া জৈবমতবাদ, ডক্টর লিককের মতে, রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই।[২]

যদিও জৈবমতবাদ রাষ্ট্রজীবন এবং ব্যক্তি জীবনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবুও জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অথবা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশ প্রদান করে না। তবে এই মতবাদের কিছু তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে তাহার নির্দেশ এই মতবাদে পাওয়া যায়।

স্পেন্সার এই মতবাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং ইহার ভিত্তিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া এই মতবাদ প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। হেগেলের (Hegel) দর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইহার নিজের জন্যই, ইহার বিবর্তন ইহার নিজের দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং নিজেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ; তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের সব অংশই সমষ্টিগত জীবনের উপর নির্ভরশীল। এই যুক্তির ভিত্তিতে জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদ (Idealist theory of the state) প্রচার করেন। এই দুইটি দিক হইতে জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আদর্শবাদ এই মতবাদের উপর নির্ভরশীল

১। তাঁহার "Elements of Politics" বইয়ে তিনি বলিয়াছেন, "Too great amalgamation of the individual and the state is as dangerous an ideal as too great emancipation of the individual will."

২। "The organic theory by telling us that our institutions grow and are not made hardly offers any practical guide to political conduct."
—Dr. Leacock.

রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদ (**Idealist or Absolute Theory of the State**) রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই মতবাদটি খুবই প্রাচীন,—কিন্তু ইহাতে বাস্তবতার খুবই অভাব। গ্রীক দার্শনিক Grotius রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে মুক্ত রাখিবার নীতি (the freedom of the State from all external restraints") প্রচার করিতেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার "Republic" গ্রন্থে এই মতবাদের ভিত্তিতে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। এই রাষ্ট্রে ন্যায়ের স্থান খুব উচ্চে, এবং মানুষ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ জীবনযাপন করিতে পারে। প্লেটোর পর এরিষ্টটলও একটি আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনা করেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র একেবারে বাস্তবতাবর্জিত ছিল না।

প্রাচীনকালে এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant), ফিচি এবং হেগেলের হাতে এই মতবাদ বিশেষ পরিণতি লাভ করে। কাণ্টকে আদর্শবাদের জনক বলা হয়। তিনি রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক বলিয়া মনে করিতেন এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে দেবত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র কোন অন্যায় অথবা ভুল করিতে পারে না। হেগেলও রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন।[১] হেগেলের মতে রাষ্ট্র একটি সর্বশক্তিমান অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান ও এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে। সেই ব্যক্তিত্বের স্থান সবকিছুর উপরে এবং ইহার একটি বিশেষ নৈতিক মান (ethical standard) আছে যাহার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং ইচ্ছার পরিমাপ করিতে হইবে। হেগেলের ভাষায় রাষ্ট্র হইতেছে *a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualizing individual'* যেহেতু রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহা কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারে না,—সেইজন্য জনসাধারণকে দ্বিধাহীনভাবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি অথবা রক্ষা করিতে পারে,—সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করাই জনগণের একমাত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র জনগণের যাহা কিছু ভাল এবং মহৎ তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেদেরই শ্রেষ্ঠ প্রেরণাগুলিকে রূপ দেয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি সত্তা আছে এবং জনগণের মধ্যেই এই সত্তার চেতনা থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যেই জনগণের স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণতার

কাণ্ট ও হেগেলের অভিমত

জনগণের যাহা কিছু ভাল ও মহৎ তাহারই অভিব্যক্তি হয় রাষ্ট্রের মধ্যে

১। **"March of God on earth" and "The State is the Divine Idea as it exists on earth."**

প্রকৃত বিকাশ হয়।[১] রাষ্ট্রের সার্থকতা রাষ্ট্রের নিজের মধ্যেই নিহিত। হেগেলের মতে যে স্বাধীনতা মানুষ একাকী অর্জন করিতে পারে না, রাষ্ট্রই মানুষকে সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে সাহায্য করে। হেগেলের ভাষায় "*Nothing short of the State is the actualization of freedom.*" রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হইতেছে সাধারণের ইচ্ছা (general will) এবং মানুষের ইচ্ছার সমষ্টি হইতেছে সেই সাধারণ ইচ্ছা। সুতরাং মানুষ কখনও রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছার প্রতিভূ বলিয়াই ইহা সব সমালোচনার উর্দ্ধে। হেগেলের অনুগামীদের হাতে, বিশেষ করিয়া নীৎসে (Nietzsche), বার্নহার্ডি (Bernhardi), ট্রিট্‌স্‌কের (Treitschke) হাতে এই মতবাদের চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখিতে পাই। হেগেলের সমর্থকগণের মতে এবং তাঁহার পরবর্তী এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণের মতে রাষ্ট্র একটি অপরিসীম শক্তির আধার। এই অতি মানবীয় শক্তির প্রতিনিয়ত প্রয়োগ আবশ্যক যাহাতে রাষ্ট্রেরও অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাঁহাদের মতে বড় বড় রাষ্ট্রের উচিত ছোট ছোট রাষ্ট্রকে যুদ্ধে জয় করা, যাহাতে সেইগুলি একটি বড় রাষ্ট্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। মানুষের সুস্থ, সুখী এবং সুন্দর জীবনের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার শেষ থাকা উচিত নয় এবং মানুষেরও উচিত সেই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। অনেকে মনে করেন, জার্মানদের যুদ্ধপ্রিয়তার কারণ ছিল রাষ্ট্রের আদর্শবাদ।

রাষ্ট্রের ইচ্ছাই জনসাধারণের ইচ্ছা

হেগেলের অনুগামীদের মতে রাষ্ট্র অপরিসীম শক্তির আধার

ইংলণ্ডে টি. এইচ. গ্রীন (T. H. Green), ব্র্যাড্‌লি (Frances Herbert Bradley) এবং বোসানকুয়েট (Bernard Bosanquet) এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেক পরিমাণে সমর্থন করেন। তাঁহারা হেগেলের এবং তাঁহার শিষ্যদের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই যদিও গ্রীন (Green) রাষ্ট্রের মহিমার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু গ্রীনও মনে করেন, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কখনই অসীম নহে,—ইহারও ভিতর এবং বাহির উভয় দিক হইতে একটি সীমা আছে।

ইংলণ্ডে এই মতবাদের প্রচার

সমালোচনা : রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদকে একটি অসার তত্ত্ব ("unsound in theory") এবং বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন ("untrue to fact") বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহা অবস্থা লইয়া আলোচনা করে না, আদর্শ লইয়া আলোচনা করে।

---

১ ; বার্কার এই মতবাদটিকে তিনটি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন :

(1) The state lives and has a soul ; (2) this soul is conscious in its citizens ; and (3) to each citizen this living soul assigns his field of accomplishment.

রাষ্ট্রসম্পর্কিত আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অথবা ক্রিয়াকলাপের পরিধি সমাজের পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের উপক্ষাকে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধীন করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে এই মতবাদ সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয় যদিও ইহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন। এই মতবাদে রাষ্ট্রে দেবত্বের আরোপ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে। এই মতবাদ অনুযায়ী যখনই আইন প্রণয়ন করা হয়, তখনই স্বাধীনতা বজায় থাকে। আদর্শবাদীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে আইন পালন করিবার অধিকার অপেক্ষাও কিছু বেশী।[১] জোয়াডের Joad) মতে এই মতবাদ ব্যক্তি—স্বাধীনতার পরিপন্থী (" inimical to individual freedom")[২]। রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কোনও মূল্য নাই, ইহা সত্য নহে। অধ্যাপক লাস্কি এইজন্য এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার অর্থ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে (general will) নিষ্ক্রিয় করিয়া তোলা। এই মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী এবং ইহা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্র কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। জনগণের কল্যাণের জন্য এবং সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের জন্য রাষ্ট্র একটি অতি কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় মাধ্যম। আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ না করিলে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে রাষ্ট্রই সর্বশক্তিমান, এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। জোয়াডের (Joad) ভাষায় আমরা বলিতে পারি, "The State exists for individuals ; individuals do not exist for the State." ব্যক্তির প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সার্থকতা। যদি রাষ্ট্র অথবা সমাজ জনকল্যাণের প্রতি উদাসীন থাকে, তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের কোন মূল্য অথবা অর্থ নাই।

সমাজকে রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষা।

এই মতবাদ স্বাধীনতার পরিপন্থী

ইহা রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়

সামাজিক জীবনের বিকাশের মধ্যেই যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কার্যকর হয়, তাহা এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নাই

এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। এই মতবাদ বড় বড়

১। "For the idealist......whenever there is law there is freedom. Thus "freedom" for him means little more than the right to obey the law."
—Bertrand Russell.

২। জোয়াড (Joad) এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "Liberty has meaning only for the individual, and the welfare of society and the state has neither meaning nor value unless it carries with it the welfare of the individuals who compose the state. In other words, the State and the Community are not ends in themselves."—Joad, Modern Political Theory. P. 18.

রাষ্ট্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র-বিজয়ের জন্য উৎসাহ দেয়,—অর্থাৎ, এই মতবাদ যুদ্ধের সমর্থক।

সর্বশেষে, রাষ্ট্রকে সমগ্র জনসমষ্টির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলা কঠিন। সমগ্র জনসমষ্টির ইচ্ছার মধ্যে অমিল কিছু না কিছু থাকিবেই। যতটুকু ইচ্ছার সমন্বয় হইতে পারে তাহাও যে সর্বদাই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

এই মতবাদ গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ইচ্ছা জনসাধারণের ইচ্ছা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাবান ও বলশালী। গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এই মতবাদ স্বীকার করে না। পরোক্ষভাবে ইহা স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্রয় দেয়। ইহা মানুষ অপেক্ষাও মানবতাকে বেশী মনে করে, এবং জাতির সদস্যগণ অপেক্ষাও জাতীয় জনসমাজকে বড় মনে করে।[১]

অধ্যাপক বার্কার এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা শুধু আদর্শ বা ধারণা লইয়া আলোচনা করে। এই মতবাদ যে রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করে তাহা পৃথিবীতে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।[২]

এই মতবাদের গুরুত্ব

এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই যে ইহাতে সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রের সংঘ হিসাবেই জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্র নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে জনসাধারণকে এই সকল সুবিধা ও অধিকার উপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করে। নাগরিক অধিকারের উৎস এবং রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র জনগণের আনুগত্য দাবি করিতে পারে। সর্বশেষে, একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়া এই মতবাদ জনসাধারণকে আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ (Marxist conception of the State) : রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সের মতবাদ জানিতে হইলে প্রথমতঃ, মার্ক্স প্রদত্ত সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সালে মার্ক্স তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "Daskapital" বইয়ে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম পরিণতি। মার্ক্সের সমাজতন্ত্র প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূলসূত্রের সাহায্যে তাঁহার সমাজতন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতেছে, (১) উদ্বৃত্ত মূল্যের

মার্ক্স প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা

১। "It is a new way of justifying absolutism.......... .....It regards humanity as something more than men, nationality as something more than the members of a nation.—MacIver. *The modern Sate.* P. 453.

২। "The State of which it conceives...may be laid up in heaven, but it is not established on earth." —Barker.

(Theory of Surplus Value) তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of Histoty এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ (Theory of Class Struggle)। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে 'শ্রম'। শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি সময় আছে, একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (Socially necessary labour time) এবং অতিবিক্ত পরিশ্রমের সময় (Surplus labour time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরি পায় না। যতটা মজুরি তাহাকে দেওয়া হয় তাহা হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের মূল্য এবং যতটা মজুরি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইতেছে তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূল্য। মালিকশ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) অথবা শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital) হয়। কিন্তু তখন ইহার দুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ (Reserve army of Labour) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে। তখন ধনতন্ত্রের সংকট আগাইয়া আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিকশ্রেণীকে অপসারণ করিয়া সমাজতন্ত্রের অথবা সর্বহারাদের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে। তখনই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার সূচনা হয়।

মার্ক্সীয় নীতির তিনটি মূল সূত্র

মার্ক্সীয় নীতির অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা

মার্ক্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (Materialistic interpretation of History) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রাম (class struggle)। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বরাবরই একটি শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। প্রাচীন যুগে-সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণী এবং ক্রীতদাস এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। মধ্যযুগেও সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় (feudal lords) এবং কৃষকদের মধ্যে; শিল্প-বিপ্লবের

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীসংগ্রাম

পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। যাহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ লাগিয়াই আছে।

মার্ক্সীয় দর্শনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মার্ক্সের মতে বস্তুময় পৃথিবীই (material world) বাস্তব এবং ধ্যানধারণা বা ভাব হইল এই বস্তুময় জগতের প্রতিক্রিয়া (reflexes)। আদর্শবাদীদের মতে বস্তু অপেক্ষা চিন্তা বা ভাবের গুরুত্ব অনেক বেশী। হেগেলের মতে সমগ্র বিশ্বের মূলে রহিয়াছে একটি বিশ্বমন (world spirit) এবং একটি পরম চেতনা (Absolute Idea)। প্রাকৃতিক জগতের সব ঘটনা হইতেছে এই পরম চেতনার প্রতিচ্ছবি [১]।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ইহার সহিত আদর্শবাদের পার্থক্য

মার্ক্সের মতবাদ শুধু বস্তুগতই (materialistic) নহে, দ্বন্দ্বমূলকও (dialectical) বটে। দ্বন্দ্ববাদ (dialectics) অনুযায়ী পৃথিবীর সব জিনিসই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সকল বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং অসামঞ্জস্যই (contradictions) সকল জিনিসের পরিবর্তনের মূল কারণ। দ্বন্দ্বশীল শক্তির দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে বাদ (Thesis) এবং অপরটি হইতেছে প্রতিবাদ (Antithesis)। এই দুই-এর সংঘাত হইতে যে উন্নততর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইতেছে 'সম্বাদ (Synthesis)। 'সম্বাদ' যদিও একটি নূতন অবস্থা, ইহার মধ্যে 'বাদ' এবং 'প্রতিবাদ'-এর কিছু উপাদান থাকিয়া যায় এবং সেই 'বাদ' এবং প্রতিবাদের' যৌথ ক্রিয়ার ফলে ইহা একটি নূতন সম্বাদের পথে অগ্রসর হয়।

দ্বন্দবাদ প্রতিবাদ ও সম্বাদ

দ্বন্দ্ববাদের তিনটি প্রধান সূত্র হইতেছে : (১) পরিমাণগত পরিবর্তনের পরিমাণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের সূত্র (The law of transformation of quantity into quality , ২) পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে ঐক্যের সূত্র (the law of the unity of opposites) এবং (৩) অস্বীকৃতির অস্বীকৃতিজনিত সূত্র (the law of the negation of the negation)। সমাজ জীবনে যখন পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হইয়া সবকিছু ওলটপালট করিতে চায় তখনই

দ্বন্দ্ববাদের তিনটি সূত্র

১। To Hegel, the process of thinking, which, under the name of 'the Idea',...is the demiurgos (creator) of the real world, and the real world is only the external, phenomenal form of "the Idea." With me, on the contrary the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of thought.

—Karl Marx : Capital, Vol. I.

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "Hegel believed in a mystical entity called 'Spirit' which law as human history to develop according to the states of the dialectic has set form in Hegel's *Logic*. For Marx matter not spirit is the driving force.

—Bertrand Russell : *A History of Western Philosophy*

বিপ্লবের **সৃষ্টি** হয়; ইহাকে মার্ক্স "Leaps or Jumps" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সামন্ততন্ত্র; ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে নিম্নলিখিতভাবে: সমাজতন্ত্রের অস্বীকৃতি হিসাবে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি এবং ধনতন্ত্রের অস্বীকৃতি হইতে সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এইভাবে অস্বীকৃতির অস্বীকৃতিজনিত সূত্র কার্যকর হয়।[১]

মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র উৎপত্তির সূচনা হইল তখনই যখন সমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে **মানুষ** বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। মার্ক্সের মতানুযায়ী শোষিত শ্রেণীকে অবদমিত করিয়া রাখিবার জন্যই শোষকগণ রাষ্ট্রের সংগঠন করে যাহাতে তাহাদের শোষণ কাজ অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রীয় আইনও এমনভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে যাহাতে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে রূপ পায়। কিন্তু অবশেষে শোষিত শ্রেণী নিজেকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটাইবে এবং সমাজ হইতে শ্রেণীসংগ্রামের শেষ চিহ্নটি দূর করিবে। তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat)।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রাম

সমালোচনা: মার্ক্সের মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, তিনি শুধু অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর সভ্য মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারাকে ভিত্তিশীল করিয়াছেন। কিন্তু, অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য কারণ যে (যেমন, ধর্ম, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি) সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করিতে পারে, মার্ক্স এই দিকটি মোটেই চিন্তা করেন নাই। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সর্বদা অর্থনৈতিক কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মার্ক্সের মতবাদে ইতিহাসে মানুষের অর্থনৈতিক ভূমিকা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যান্য কারণগুলি উপেক্ষিত

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সের মতে সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ অবধারিত। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের অবসান হয় নাই। শ্রেণী-সংগ্রামে শ্রমিকদের জয়লাভ হইবেই, এই মতবাদটির আবেদন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যতই অকৃত্রিম হউক না কেন, ইতিহাসে তাহা এখনও একান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজে দুইটি দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীর ধারণাও ঠিক নহে। কেননা, ধনী অথবা বড় বড় শিল্পপতি ছাড়াও সমাজে এমন শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের সর্বহারা বলা যায় না। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছোটখাট ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার শ্রেণীকে সর্বহারাও বলা যায় না, ধনীও

শ্রেণীসংগ্রাম কি অবশ্যম্ভাবী?

১। "...this (Law of the negation of the negation) asserts that thesis, antithesis and synthesis are forms or stages of development." —Carew Hunt.

বলা যায় না। ধনতন্ত্রে যে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে এই ধারণাও সর্বদা গ্রহণযোগ্য নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সুইডেন বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিক শ্রেণী বেকার ভাতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অন্যান্য সব সুবিধা পাইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of surplus value) সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়েও মার্ক্স শুধু শ্রমিককেই উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই ধারণাও ঠিক নহে। শুধু মাত্র শ্রমের ভিত্তিতে যদি দ্রব্যমূল্য ব্যাখ্যা করা হয় তবে সেই বিশ্লেষণে বণ্টন ব্যবস্থাপনা (Distribution System) এবং স্থির ব্যয় (overhead costs) মোটেই ধরা হয় না।

মার্ক্সের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ত্রুটি

চতুর্থতঃ, মার্ক্স ধনতান্ত্রিক সমাজে দুইটি শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—ইহাও ঠিক নহে। সংগ্রাম যে শুধু ধনিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে তাহা নহে, একই শ্রেণীর মধ্যেও যথেষ্ট সংঘাত থাকিতে পারে।[১]

সর্বশেষে, মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী সর্বহারাদের বিপ্লবের পর শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠিত হইবে এবং তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না বলিয়া রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটিবে। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠিত হইলেও ইহার পরিচালনার জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজন হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র ছাড়া এই সংস্থা কিভাবে গঠিত হইতে পারে বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র যে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীবিহীন হইয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে শাসক গোষ্ঠী একটি নূতন শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে।[২]

সর্বহারাদের বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্র ছাড়া শ্রেণীবিহীন সমাজ অর্থহীন

যদিও মার্ক্সের মতবাদ বহুবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে, তবুও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ইহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, সমাজ বিবর্তনে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা

মার্ক্সীয় মতবাদের গুরুত্ব

১। "Indeed, the divergence of interest within both the ruling and the ruled classes goes so far that Marx's theory of classes must be considered as a dangerous over-simplification." —K. R. Popper : *The Open Society and Its Enemies.*

২। "The most likely development is, of course, that those actually in power at the moment of victory......will form a new class ; the new ruling class of society". Popper.

যায় না। শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের প্রধান পরিচালন শক্তি এই উক্তিটি অতিরঞ্জিত হইলেও,—ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যেরই অতিরঞ্জিত উক্তি।[১]

রাষ্ট্র সম্পর্কে আইন-শাস্ত্রসম্মত মতবাদ (Juristic Theory of the State): রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আইনবিদগণের মতবাদ প্রকৃত পক্ষে আইনশাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল। এই মতবাদ রাষ্ট্রের উপর একটি ব্যক্তির সত্তা আরোপ করা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হইতেছে একটি আইনগত "ব্যক্তি" (a legal "person")—এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং নিজস্ব ইচ্ছা আছে। জনগণের যৌথ ইচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আইনগত ইচ্ছা হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করে ইহার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের ব্যক্তির মোটেই কৃত্রিম নহে,—ইহা একান্ত বাস্তবসম্মত। যেহেতু রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সেইজন্য রাষ্ট্রের কতিপয় স্থায়ী স্বার্থ এবং অধিকার আছে এবং এই স্বার্থগুলি জনসাধারণের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাময়িক স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জনগণের স্বার্থের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রকে সমষ্টির স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিস্বার্থকে কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিতে হয়। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও মূলধন এবং ধন আছে ; রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করে এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করে।

রাষ্ট্রের আইনগত ব্যক্তিত্ব

এই মতবাদে রাষ্ট্রের স্বার্থ ও ইচ্ছা কল্পনা করা হয়

ডুগুইট (Duguit) প্রমুখ লেখকগণ রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব হইতেছে শুধু একটি নৈতিক ধারণা এবং ইহার কোন বাস্তব উপাদান নাই ("a pure mental concept devoid of positive reality")। কিন্তু আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণ রাষ্ট্রের উপর একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রকে একটি 'ব্যক্তি' হিসাবে কল্পনা করে। ইহা হইতেছে জাতির উপর একটি ব্যক্তিসত্তার আরোপ; অবশ্য এই ব্যক্তিসত্তার স্থান জাতির উপর নহে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic view of the nature of the State): অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র হইতেছে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের একটি যন্ত্র মাত্র, এই মতবাদকে বলা হয় রাষ্ট্র সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic View)। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র

১। "It is an exaggeration to say that the history of States has been in effect nothing more than the history of class struggle, that class struggle is the immediate driving force in history, but it is an exaggeration of an important truth."
—MacIver, The Web of Government.

জীবদেহেরও অনুরূপ নয়, উহা শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশও নহে এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপও নহে। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র মানুষের ইচ্ছার মানুষ কর্তৃক গঠিত হইয়া মানুষেরই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এই মতবাদের মধ্যে হব্‌স্ এবং লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের কিছু উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ তাহাদের মতে মানুষ নিজেই রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছিল প্রকৃতির রাজত্বে না থাকিয়া কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য; বিশেষতঃ, লকের মতে সম্পত্তির অধিকার (Property Rights) সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রগঠনের পিছনে একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার কাজ করিয়াছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর হিতবাদীগণ (Utilitarians) রাষ্ট্র সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল যে ভাবেই হউক, বেশীর ভাগ লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ সাধন (greatest good of the greatest number) করা।

রাষ্ট্র হইতেছে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের একটি যন্ত্র

সংক্ষিপ্তসার

১। **জৈব মতবাদ (Organic Theory)**—জৈব মতবাদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মতবাদে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করা হইয়াছে। জীবদেহে যেমন আমরা অনেক জীবকোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের মধ্যেও আমরা অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাই; জীবকোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও সেই প্রকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহ ও রাষ্ট্র উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; রাষ্ট্রের আদিতে কতিপয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও সেই প্রকার একটি সরকার দ্বারা চালিত হয়। জীবদেহের কোনও অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ইহা যেমন পূরণ হইতে পারে সেই প্রকার রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান নূতন লোক দিয়া পূরণ হয়। কিন্তু, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, মানবদেহের গঠন দৃঢ়সংবদ্ধ এবং মানবদেহের বিভিন্ন কোষ পরস্পর অসংলগ্ন নহে। কিন্তু রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অসংলগ্ন। দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুঞ্জীভূত থাকে; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানে পুঞ্জীভূত থাকে না। তৃতীয়তঃ, জীবদেহ হইতে কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু কোন রাষ্ট্র হইতে কোন ব্যক্তি সম্পর্ক করিয়া অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

২। **রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদ (Idealist Theory of the State)**—এই মতবাদে রাষ্ট্র যে সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরে যে জনসাধারণের কোন ইচ্ছা থাকিতে পারে না এবং রাষ্ট্রই যে জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ-সাধন করিতে পারে, ইহাই বলা হইয়াছে। হেগেল, কাণ্ট, প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের একটি অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে এবং ইহার স্থান সব কিছুর উপরে। এই নৈতিক মানের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করিতে হইবে। গণতন্ত্রের পূজারীগণ এই মতবাদকে কঠোরভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট্র

বিজয়ের জন্য উৎসাহ দেয়। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই যে, ইহাতে সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৩। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সের মতবাদ (Marxist Conception of the State)—রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সের মতবাদ সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্ক্স প্রদত্ত সমাজতন্ত্রের তিনটি মূলসূত্র আছে ; সেইগুলি হইতেছে।

(১) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ।

শ্রেণী-সংগ্রাম হইতেছে মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র-উৎপত্তির সূচনা ; কারণ, শোষক-শ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সংগঠন করে। রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থ ই রূপ পায়। অবশেষে শোষিত শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া একটি বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে। মার্ক্সের মতে ইতিহাসের ঘটনাবলী অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু, এই মতবাদটি ত্রুটিপূর্ণ ; কারণ, অর্থনৈতিক কারণ নয়, এইরকম বিভিন্ন শক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করিতে পারে।

Exercise

1. "The State is a living organized unit, not a lifeless instrument." Discuss the soundness or otherwise of this view.

"রাষ্ট্র হইতেছে একটি জীবন্ত সংগঠিত সত্ত্বা। প্রাণহীন যন্ত্র নয়"—এই মতবাদের সারবত্তা অথবা অসারত্তা আলোচনা কর।] (৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা)

2. "The Idealist theory of the State is inimical to individual freedom." Discuss the statement. (৬৯-৭২ পৃষ্ঠা)

["রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী" - উক্তিটি আলোচনা কর।]

3. Discuss critically the Idealist Theory of the State. (৬৯-৭২ পৃষ্ঠা)
(C. U. B. A. old Regulation, Part 1, 1964, 1966, 1971)

"রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা কর।"

4. Examine the Marxist Conception of the State.
(৭২-৭৭ পৃষ্ঠা) (C. U. Part 1, 1962, 1965, 1972)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ পরীক্ষা কর।

5. Write a note on the Juristic Theory of the nature of the State.
(৭৭ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. Part 1 1965)

রাষ্ট্র সম্পর্কে আইন সম্পর্কিত মতবাদের উপর একটি টীকা লিখ।

6. Discuss critically the organisimic theory regarding the nature of the State. (৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. Part 1. 1967)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদ সমালোচনাসহ পরীক্ষা কর।

7. Write short notes on :

(a) Dialectical Materialism, (b) Surplus Value, (c) Mechanistic View of the State.

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(ক) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, (খ) উদ্বৃত্ত মূল্য (গ) রাষ্ট্র সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সার্বভৌমত্ব
(Sovereignty)

সার্বভৌমত্বের অর্থ (Meaning of Sovereignty): রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের আইন ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকেও প্রভাবিত করে। সার্বভৌমত্ব বলিতে আমরা সর্বপ্রধান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা বুঝি। মূলত: ইহা একটি আইনগত ধারণা।[১] প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি সার্বভৌম শক্তির নায়ক এবং ইহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। উইলোবির (Willoughby) মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা। ("Sovereignty is the supreme will of the state," উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) মতে ইহা আইন সৃষ্টি করিবার এবং আইনের ক্ষমতা বাড়াইবার একটি দৈনন্দিন কার্যকরী শক্তি ("the daily operative power of forming and giving efficiency to laws")। উইলোবি এবং উইলসনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বার্জেসের (Burgess) সংজ্ঞা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজা এবং ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা। ("original, absolute, unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects."—Burgess)

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু আইনবিশারদদের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক কোন শক্তিই রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারে না। আইনের দিক হইতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

রাষ্ট্রই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী

১। "There must exist in the State, as a legal association, a power of final legal adjusment of all legal issues which arise in its ambit." —Barker.

এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা সংসদের হাতে।

সার্বভৌমত্বের ক্রমবিকাশ: গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল তাঁহার 'Politics' বইয়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে "চূড়ান্ত শক্তি" (Supreme Power) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা একটি বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অবস্থান (located in the multitude of the people) করে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মতে বৃহৎ জনসমষ্টির সম্মিলিত গুণাবলী ও কর্মশক্তি একজন কিংবা অল্প কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির গুণাবলী ও কর্মশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এরিষ্টটলের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্তী যুগেও সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে রাজার ক্ষমতা হিসাবেই বিবেচিত হইত। ১৫৭৬ সালে বোডেঁ (Bodin) তাঁহার "Republic" গ্রন্থে দেখাইয়াছিলেন যে সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের একটি উপাদান।[১] বোডেঁর (Bodin) মতে সার্বভৌমত্ব হইতে আইন কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক এবং প্রজাদের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব ("supreme power over citizens and subjects unrestrained by laws")। বোডেঁ (Bodin) আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। গ্রোসিয়াস (Grotius) নামে আরেকজন লেখক সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। গ্রোসিয়াস বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা এবং বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হব্‌ল্‌, বেন্থাম এবং অষ্টিন আইনগত সার্বভৌমত্বের (Legal Sovereignty) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; লক্‌ গুরুত্ব আরোপ করেন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের (Political Sovereignty) উপর এবং রুশো গুরুত্ব আরোপ করেন গণ-সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) উপর। হেগেল (Hegel) রাষ্ট্রের মধ্যেই একটি স্বর্গীয় ইচ্ছার (Divine will) অবস্থিতি অনুধাবন করিয়া রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিককালের বহুত্ববাদীগণ (Pluralists) মনে করেন যে সার্বভৌমত্ব কখনই এককভাবে অবস্থিত থাকে না অথবা ইহা কখনই অবিভাজ্য নহে। ইহা রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভাজ্য।

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Attributes of Sovereignty): সার্বভৌমত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম

১। "Originally conceived as a personal attribute of the monarch, sovereignty came in the hands of Bodin to be regarded as a constituent element of the State."

—Garner—Political Science and Government, P. 158.

ক্ষমতা মৌলিক (original) অথবা আদিম। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, সেইপ্রকার ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা মৌলিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম (unlimited)। যে কোন আইন প্রণয়ন করিবার এবং ইহা বাতিল করিবার ক্ষমতা সার্বভৌমের আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম নয়, ইহা সসীম। তাঁহাদের মতে ঐশ্বরিক বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ থাকে না। সুতরাং আইনগতভাবে ইহার দ্বারা সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, শাসনতান্ত্রিক আইন (constitutional law) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন নিয়ন্ত্রণ করেন সরকারের ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা সার্বভৌমের সর্বদাই থাকে।

সার্বভৌমত্বের সীমা (Limits to Sovereignty)

শাসনতান্ত্রিক আইন সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না

কোন কোন লেখকের মতে আন্তর্জাতিক আইন (international law) রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্র কখনই আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য নয় এবং ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই পূর্বে সংগঠিত করিয়াছিল) বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং তত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইন কোন দেশেরই সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। কিন্তু বাস্তবে আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ পালন করিতে যে কোন রাষ্ট্রই বাধ্য হয়। কারণ আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করিলেই যুদ্ধের আশংকা থাকে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির পক্ষে রাষ্ট্রসংঘের চূড়ান্ত নির্দেশ অমান্য করা যে সম্ভবপর নয়, তাহা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিরতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে। সর্বশেষে যাঁহারা বহুত্ববাদে (pluralism) বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তিসংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে এবং এই সমস্ত সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের অভিমত

ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু, একথা মনে রাখতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হইতেছে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের সীমা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা অসীম। চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অনন্যতা (exclusiveness)। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা-সম্পন্ন কোন শক্তি থাকিতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী অপর কোন শক্তি থাকিত, তবে সেই শক্তি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত। সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতা (absolute power) হইতেই আমরা এই অনুসিদ্ধান্ত করিতে পারি। পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতারই আর একটি রূপ হইতেছে ইহার সার্বজনীনতা (All-comprehensiveness)। রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে। ষষ্ঠতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী (Permanent)। রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সার্বভৌমের স্থায়িত্ব থাকে। সরকার অথবা শাসন-তন্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না।[১] সপ্তমতঃ, সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তান্তরযোগ্য নহে (Inalienable)। আত্ম-বিলোপ সাধন ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।[২] সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের একটি অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করে তবে সেই ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না এবং সেখানে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া

বহুত্ববাদীদের অভিমত

সার্বভৌম ক্ষমতা অনন্য ও সার্বজনীন

ইহা স্থায়ী এবং হস্তান্তরের অযোগ্য

১। "Sovereignty does not cease with the death or temporary dispossession of a particular bearer, or the reorganisation of the State, but shifts immediately to a new bearer, as the centre of gravity shifts from one part of a physical body to another when it undergoes external change."

—Garner—Political Science and Government, P. 170.

২। "Sovereignty can no more be alienated than a tree can alienate its right to sprout or a man can transfer his life and personality without self-destruction."

—Lieber

গিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ড অথবা ভারত কাহারও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এই যুক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনানুমোদিত স্বত্ব আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অপপ্রয়োগ অথবা অপব্যবহারের জন্য বিনষ্ট হয় না। সর্বশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (Indivisible)। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়,—ইহার বিভাগ অসম্ভব। সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজব্যবস্থা অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। সুতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান কখনই একযোগে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। বহুত্ব-বাদীরা (Pluralists) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না; তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ত আছে। কারণ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নিজের ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিস নহে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যতই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হউক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায়।

সার্বভৌমত্ব

মৌলিক ক্ষমতা	চূড়ান্ত ক্ষমতা	অসীম ক্ষমতা	অনন্যতা	সার্বজনীনতা	স্থায়িত্ব	হস্তান্তরযোগ্যতার অভাব	অবিভাজ্যতা

আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (De Jure Sovereignty and De Facto Sovereignty): আইনের চোখে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম অথবা আইনসংগত সার্বভৌম (De Jure Sovereign) বলা হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইনসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রের জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। এই সার্বভৌমত্ব আইন অনুযায়ী সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে সার্বভৌম স্বীকৃত না হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব সার্বভৌম (De Facto Sovereign) বলা হয়। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,—কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রিসভা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

আইনসঙ্গত সার্বভৌম আইন অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়

কারণ, রাজশক্তি বর্তমানে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনানুমোদিত সার্বভৌম বাস্তব সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ শিখনেতা রণজিৎ সিংহের নাম করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল জোর করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংলণ্ডের বাস্তব সার্বভৌম (De Facto Sovereign) হইয়াছিলেন।

বাস্তবে যিনি সার্বভৌম তিনি আইনানুমোদিত সার্বভৌম না-ও হইতে পারেন

বাস্তব সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া লর্ড ব্রাইস বলেন যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনগণ আনুগত্য প্রদর্শন করে, এবং যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আইনসঙ্গতভাবেই হউক অথবা আইনবিরুদ্ধভাবেই হউক নিজের বা নিজেদের ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ইচ্ছা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারা হইলেন বাস্তব সার্বভৌম। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি অধিকারী, তিনি যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় আসীন থাকেন তবে জনমত নিজের অনুকূলে আনিয়া তিনি তাঁহার ক্ষমতাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে পারেন।[১] বিপ্লবের পর যখন নূতন কোন শক্তি দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন সেই শক্তি বাস্তব সার্বভৌম হিসাবে পরিগণিত হয়। তখন ইহা নিছক আইনের ধারণা নহে। আইনঅনুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত নহে। বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্বকেই সার্বভৌমত্ব বলিয়া অভিহিত করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে এমন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদ কর্তৃক যিনি বা যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আইনানুমোদিত সার্বভৌম নহেন।

নামমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular Sovereignty and Actual Sovereignty) : যাহায় নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলবৎ হয় অথচ বাস্তবে যিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাকে নামমাত্র সার্বভৌম (Titular Sovereign) বলা হয়। নামমাত্র সার্বভৌম সাধারণতঃ দেশের নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) শাসকরূপে পরিচিত হন। ইংলণ্ডে রাজা সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনের চোখে সার্বভৌম। কিন্তু

১। "The Person or body of persons who can make his or their will prevail with the law or against the law ; he, or they, is the *de facto* ruler, the person to whom obedience is actually paid."

—Bryce—Studies in History and Jurisprudence, Vol. II.

"On account of manifest advantages which flow from the exercise of power resting on strict legal right rather than upon physical force, the new sovereign sometimes has his *de facto* claim converted into a legal right by election or ratification."

—Garner—Political Science and Government. P. 168

রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম। প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্ত্রিসভা এবং বিশেষত প্রধানমন্ত্রী। যিনি প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ও চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারেন. তিনিই প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign)।

আইনগত সার্বভৌমত্ব : (Legal Sovereignty) সামাজিক চুক্তি মতবাদে হব্‌স্‌ এবং লকের মতের পার্থক্যের মধ্যে আমরা আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে পাই। আইনগত সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আইনগত সার্বভৌমত্ব কোন প্রকার নৈতিক সূত্র, ধর্মীয় বাধানিষেধ বা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে ; বিচারকগণও আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অষ্টিন (Austin) বলিয়াছিলেন, সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন ("Law is the command of the Sovereign")। অষ্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথবা কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাহার মাধ্যমে চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হয়। আইনের চোখে এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ এই নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য। এই আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক সময়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে, কিন্তু আইনগত সার্বভৌমের কোন নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে বিচার করিবার মত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আইনগত সার্বভৌম বলিয়া পরিচিত এবং এই আইনগত সার্বভৌম রচিত আইন ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে।[১]

আইনগত সার্বভৌমত্ব আইনের ধারণামাত্র

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) : রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমের হাতে থাকিলেও বাস্তবে সেই ক্ষমতা হয়তো অপর একটি কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন। আইনগত সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) বলি।[২] রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব

১। "Parliament can do everything but make a woman a man, and a man a woman." De Lolme.

২। "Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow"—Dicey—Law of the Constitution. এখানে ডাইসি রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

জনমতের নির্দেশ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে আইনগত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল দেশের নির্বাচকমণ্ডলী, যাহারা দেশের সরকার নির্বাচিত করেন, এবং ব্যাপক অর্থে ইহা জনমতের উপর প্রভাববিস্তারকারী সমগ্র জনসমষ্টি দ্বারা প্রযুক্ত হয়।[৩] গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অথবা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হয়। তবে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম কতটা শক্তিশালী তাহা নির্ভর করে নির্বাচকমণ্ডলীর রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার উপর। কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম কখনই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী নহে। সাধারণ নির্বাচনে শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের পরিবর্তন করাইতে পারে। শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের কৃতিত্ব তখনই যখন তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম এবং আইনগত সার্বভৌমের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে পারেন। কোন কোন লেখক বলেন, যেহেতু সার্বভৌম অবিভাজ্য (indivisible), সেইজন্য আইনগত সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত নহে। কিন্তু এই যুক্তিটি ঠিক নহে। সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ সার্বভৌমত্বকে বিভাগ করা নহে।

ডাইসির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপে পড়িয়া রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী না হইতে পারে, তবে ইহা ঠিকই যে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের আইনগত সার্বভৌমের ন্যায় বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে,—কিন্তু, ইহার এমন একটি শক্তি আছে যাহা কোনও রাষ্ট্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা করিতে পারেন না। গিলক্রাইস্ট বলেন, "Political Sovereign is the sumtotal of the influences in a state which lie behind the law".

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডের আইনগত সার্বভৌম হইতেছে রাজা-সমেত-

৩। "In a narrow sense, the electorate constitutes the political sovereign, yet in a wider sense it may be said to be the whole mass or population, including every person who contributes to the moulding of public opinion, whether he is a voter or not."

—Garner—Political Science and Government, P. 160.

পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) আর রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম হইতেছে নির্বাচক মণ্ডলী (electorate)। যেহেতু নির্বাচকদের সংখ্যা সর্বদা সুনির্দিষ্ট (determinate) থাকে না, সেজন্য রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অনিশ্চিত বলা হয়। কোন কোন লেখকের মতে জনমত হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ। জনমত যাহাদের প্রতিনিধিত্ব করে তাহারাও সুনির্দিষ্ট নহে। সাধারণতঃ, নির্বাচকমণ্ডলীর মতই জনমত হিসাবে গৃহীত হয়। রিচি, গেটেল. প্রমুখ লেখকদের মতে আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণই ভাল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্ব-ভৌমত্ব অনিশ্চিত

গণ-সার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty) : গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ অনুযায়ী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা (All powers to the People) থাকে। রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলিয়াছিলেন। স্বৈরতন্ত্র হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করাই গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। রিচির (Ritchie) মতে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির (electoral power) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথবা বিদ্রোহ করিবার শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। মোটের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে শক্তির জিনিস এবং ইহা নির্ভর করে জনগণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ্যের উপর। সুতরাং সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ যে শক্তির থাকে তাহাই সার্বভৌম। গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই দেশের শাসক। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করে সেই আনুগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির প্রতি। "জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা" ("Voice of the People is the voice of God"—ইহাই ছিল রুশোর গণ-সার্বভৌমত্বের মূল কথা।

গণ-সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছামযী জনসাধারণকেই প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা-শালী। কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না এবং জনমত যদি কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যায় তবে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ জনসাধাণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রয়োগ

সমালোচনা : নিম্নলিখিত যুক্তি অনুযায়ী আমরা গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদটির সমালোচনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ "জনগণ", এই কথাটি নির্দিষ্ট জনসষ্টিকে বুঝায় না। দেশের মোট জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ, অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী, রাষ্ট্রের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিরা থাকে। সকলেই ভোট দানের অধিকার লাভ করে না; দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইতেছে, কিভাবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সরকার গঠন করে এবং প্রয়োজন হইলে নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করিয়া সরকারের পতন ঘটায়। সেক্ষেত্রেও নির্বাচকমণ্ডলীর সকলেই ভোট প্রদান করে না এবং যাহারা ভোট প্রদান করে তাহাদের অধিকাংশই দলীয় নেতাদের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখে। সুতরাং ভোটের অধিকারের সাহায্যে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ নির্বাচনী শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা—এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় সংখ্যালঘু ভোটাধিকারীগণ সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীকে এবং এমনকি সরকারকেও প্রভাবিত করিতে পারে। সেক্ষেত্রে গণ-সার্বভৌমত্ব' বাক্যটির মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি দেখা যায়।

গণ-সার্বভৌমত্ব অনিশ্চিত

কিভাবে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাহা পরিষ্কার নহে

তৃতীয়তঃ, সমষ্টি সুসম্বদ্ধভাবে নিজেদের সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কারণ, জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার এবং তাহা রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নকালে বিবেচনা করিবার দায়িত্ব হইল আইনসভার। জনসাধারণের একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশ আইনসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ-ভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে। রাষ্ট্রের জনসাধারণ একত্রিত হইয়া কখনও নিজেদের আইন প্রণয়ন করিতে পারে না; তাহা করিতে হইলে আইনসভার মাধ্যমে করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, যদি কখনও জনগণ প্রবল জনমতের মাধ্যমে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই অভিব্যক্ত জনমত আইন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। জনগণের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাও সার্বভৌমত্ব নহে। জনমতকে যদি সার্বভৌমত্বের গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থার (a permanent system of referendum) মাধ্যমে গণ-সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেননা, বিচারালয়ের বিচারপতিগণ কখনও জনমতের নির্দেশ অনুযায়ী কোন জিনিসের বিচার করেন না;—তাঁহারা কোন জিনিসের বিচার করেন ন্যায় এবং আইন অনুযায়ী। সুতরাং গণ-সার্বভৌমত্বের দাবী সর্বতো-ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

জনসমষ্টি সুসম্বদ্ধভাবে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না

চতুর্থতঃ, রিচি (Ritchie) বলেন, শক্তির পরীক্ষা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই জনগণের শক্তি রাষ্ট্রের শক্তি অপেক্ষা বেশী এবং ইহাতে গণ-সার্বভৌমত্বের দাবি সমর্থন করা চলে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অল্পসংখ্যক সুসজ্জিত সেনা-বাহিনীর সাহায্যেই রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ লোকের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে। সুতরাং, রিচির যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ-যোগ্য নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গণ সার্বভৌমত্ব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতবাদের চূড়ান্ত বিশ্লেষণই ইহা প্রতীয়মান হয় যে গণতান্ত্রিক সরকার সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরিপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীকেই আমরা গণ-সার্বভৌম বলি। এই মতবাদের মূল কথা হইল, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি হইল জনমতের শক্তি এবং কোন শক্তিই জনমতকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে না। জনগণের এই সার্বভৌম ক্ষমতাই একমাত্র রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারে। ইহাই গণসার্বভৌমত্ব মতবাদের মূল্য।

কিন্তু এই মতবাদের কিছুটা মূল্য আছে

অধ্যাপক লাস্কির মতে যে শক্তি দ্বারা জনস্বার্থ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল গণ-সার্বভৌম শক্তি। যদি রাষ্ট্রীয় আইন জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয় ত'ব এই গণ-সার্বভৌম শক্তির সাহায্যে জনগণ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে। লাস্কির মতে রাষ্ট্রের আইন জনস্বার্থের অথবা জনগণের বিভিন্ন চাহিদার উপর ভিত্তিশীল।[১]

অষ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব(Austin's theory of Sovereignty): বিখ্যাত আইনবিদ অষ্টিন (Austin) আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 'সার্বভৌমত্ব' তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অষ্টিন তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। অষ্টিনের মতে, "যদি কোন সমাজের কোনও নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সংসদ) সমাজের অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আনুগত্য অথবা বশ্যতা স্বীকার না করেন, অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকের নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, তবে সেই সমাজের ঐ নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইলেন সার্বভৌম এবং ঐ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ লইয়া গঠিত সমাজ হইল রাজনৈতিক ও স্বাধীন।"[২]

১। "Legal imperatives are the functions of effective demands of the people.—Laski.

২। "If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society, and that society, including the determinate superior, is a society, political and independent."—Austin.

অষ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে :—

(১) অষ্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ। জনমত অথবা 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রভৃতি অব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে সার্বভৌমত্ব আরোপ করা চলে না। এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের আদেশই আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইবেন সমাজের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। এই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কাহারও প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। বরং এই কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন। (৩) এই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতা নয়; ইহা সম্পূর্ণভাবে মানবীয়। (৪) সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য যদি সার্বভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই যথেষ্ট। সমাজের সকল লোকের আনুগত্য প্রাপ্ত না হইলেও নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তবে সেই আনুগত্য স্বভাবজাত আনুগত্য হইতে হইবে। (৫) সার্বভৌমের আদেশেই আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। অর্থাৎ, সার্বভৌমের ক্ষমতা চূড়ান্ত ও অসীম। (৬) যেহেতু সার্বভৌম একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সেইজন্য সার্বভৌমত্ব অনন্য এবং অবিভাজ্য। সার্বভৌম জনসাধারণের মত অনির্দিষ্ট বা সাধারণের ইচ্ছার মত নৈর্ব্যক্তিক (inpersonal) নহেন।

অষ্টিনের মতবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

আইন সম্বন্ধে অষ্টিন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নলিখিতভাবে, "Law is a command given by a superior to an inferior" সার্বভৌম যাহা বলেন তাহাই আইনের মর্যদা লাভ করে। লাস্কি অষ্টিনের মতবাদের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন; প্রথমতঃ, রাষ্ট্র লইতেছে আইন অনুযায়ী গঠিত একটি সংস্থা (a legal order) এবং এখানে নির্দিষ্ট সার্বভৌম কর্তৃত্বই সমগ্র ক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সার্বভৌম কর্তৃত্ব অসীম, চূড়ান্ত, সর্বপরিব্যাপ্ত এবং অবিভাজ্য। তৃতীয়তঃ, সার্বভৌমের আদেশই আইন।

সমালোচনা : সিজউইক, ক্লার্ক, স্যার হেন্‌রী মেইন্ প্রমুখ লেখকগণ অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, অষ্টিনের মতবাদ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করিয়াছে। তিনি আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের স্বৈর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গণ-সার্বভৌমকে অস্বীকার করিয়াছেন। যদি সার্বভৌমের আদেশ আইনের রূপ পায়, তবে জনসাধারণের ইচ্ছাকে সেই আইন রূপায়িত করে না; গণতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে। অষ্টিনের তত্ত্বে ইহা স্বীকৃত হয় নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্রের স্বৈর-ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রের স্বৈর ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শুধু আইনগত সার্বভৌমত্বের কথাই আলোচনা করিয়াছে, রাজনৈতিক সার্বভৌমকে এখানে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। অথচ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনগত সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিক সার্বভৌমের নির্দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনবিদগণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের গুরুত্ব অল্প থাকিলেও গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। স্যার হেন্‌রী মেইনের (Sir Henry Maine) মতে অনেক সময় সার্বভৌম ক্ষমতা এমন কতিপয় লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে যাহাদের অষ্টিনের মতানুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করা যায় না।

গণ-সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় নাই

তৃতীয়তঃ, স্যার হেন্‌রী মেইনের মতে আইন সম্বন্ধে অষ্টিনের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। অষ্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই আইন। কিন্তু বহু প্রথাগত আইন (customary laws) আছে যেগুলি কোন সার্বভৌমের আদেশ নহে। ম্যাক আইভারের (Mac Iver) ভাষায় "The State has little power to make custom and perhaps less to destroy it "।[১] হেন্‌রী মেইনের মতে অস্টিন যে প্রকার নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কথা বলিয়াছেন, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ছিলেন সেই প্রকার নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সার্বভৌম। কিন্তু রণজিৎ সিংহ কখনই প্রথাগত আইন অমান্য করেন নাই এবং সেই আইনগুলিও তিনি নিজের আদেশে জারী করেন নাই। নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনই দেশের লোকাচার অথবা প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করেন নাই। স্যার হেনরী মেইনের এই সমালোচনার উত্তরে অষ্টিন বলেন, সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন তাহাই তাঁহার আদেশ" ("What the Sovereign permits he commands."—Austin)। অর্থাৎ, এই প্রথাগত আইনগুলি চলিতে দিবার অনুমোদনের দ্বারাই তিনি এইগুলিকে আইনে পরিণত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যেখানে কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা নাই সেখানে তাহা অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আইন সম্পর্কে অষ্টিনের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ

প্রথাগত আইনের ভূমিকা

চতুর্থতঃ, অষ্টিন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করায় সার্বভৌমত্বকে সরকারের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে মনে করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে।

১। Mac Iver—The Modern State. P—160.

(পঞ্চমতঃ বহুত্ববাদীরা (Pluralists) অষ্টিনের মতবাদ সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহা সার্বভৌমত্বকে স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে। রাষ্ট্র কখনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়, রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভোম ক্ষমতা আছে। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। অধ্যাপক বার্কার বলেন, রাষ্ট্রের সহিত বর্তমানে মানুষের আর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে।[১] সব সংঘেরই কিছু না কিছু চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্র ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

বহুত্ববাদের যুক্তি

ষষ্ঠতঃ, আইন সার্বভৌমের আদেশ হইতে সৃষ্ট, এই মতবাদ সমাজ-বিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেন না, গণতন্ত্রের সমর্থকগণও গ্রহণ করেন না। ড্যুগুইটের (Duguit) মতে আইন পালন করা হয় ইহা সামাজিক সংহতির জন্য গ্রহণীয় বলিয়া, ইহা তৈয়ার করা হইয়াছে বলিয়া নহে: লাস্কির (Laski) মতে জনগণের বিবেকই হইতেছে আইনের প্রকৃত উৎস। গণচেতনার বিপক্ষে কোন আইন জনগণ বরদাস্ত করে না। ইহা সার্বভৌমের আদশকে আইনের মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন নিদিষ্ট মানবীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিজের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে চাহে এবং যদি ইহা আইনের রূপ পায় তবে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। সুতরাং অষ্টিনের মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী। অষ্টিনের মতবাদে সার্বভৌমের আদেশ সর্বদাই জনমতকে সন্তুষ্ট করিবে কিনা তাঁহা বিবেচিত হয় নাই। গণসার্বভৌমত্বকেই ইহা অস্বীকার করিয়াছে এবং আইনের অনুমোদন যে জনগণের সম্মতির উপরেই ভিত্তিশীল তাহাও উপেক্ষা করা হইয়াছে।

ইহা গণতন্ত্র বিরোধী

(পরিশেষে ডক্টর গার্নারের মতে, অষ্টিনের প্রধান ভুল হইয়াছিল, তিনি আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ আইনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব কাজ করে তিনি সেইগুলি একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। "লোকে প্রথমতঃ মনে করে অষ্টিনের মতবাদ স্বতঃসিদ্ধ, ইহার পর লোকে জানিতে পারে এই মতবাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি আছে এবং সর্বশেষে লোকে তাঁহার সমস্ত বিশ্লেষণটিকেই হাস্যস্পদ এবং তত্ত্বগত মনে করে।"[২])

যুক্তরাষ্ট্রে এমন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আমরা দেখিতে পাই

১। "No longer we write Man vs. the State, we write Group vs. the State." —(Barker).

১। "One begins by thinking Austin self-evident, one learns that many qualifications have to be made and finally, one ends by treating his whole method as absurd and theoretic." —Garner.

না যাঁহার বা যাঁহাদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব এককভাবে কোন নির্দিষ্ট মানুষ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে না। নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহার আদেশকেই বজায় রাখিয়া আইন হিসাবে প্রযুক্ত করিতে চাঁহেন তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহাকে বল প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সার্বভৌম দেখা যায় না

কোন কোন লেখক মনে করেন যে অষ্টিনের সমালোচকগণ অষ্টিনকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন স্বভাবজাত আনুগত্যই যখন সার্বভৌমত্বের লক্ষণ তখন সাধারণের সম্মতিই ইহার ভিত্তি।[১] সাধারণের সম্মতি ছাড়া সার্বভৌম কখনই নিজের আদেশকে জোর করিয়া আইন হিসাবে জনগণের উপর চাপাইতে পারেন না। সুতরাং অষ্টিনের তত্ত্বে আমরা অমন কিছু উপাদান পাই না যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে সে অষ্টিন বল প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। অষ্টিনের মতবাদ হয়ত সর্বজন-গ্রাহ্য না হইতে পারে অথবা গণতন্ত্র-বিরোধী হইতে পারে।

তেবুও মনে রাখিতে হইবে, আইনগত সার্বভৌমত্বের ব্যাখা হিসাবে অষ্টিনের মতবাদ স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি আইনগত সার্বভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথকরূপে দেখিয়া ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অষ্টিনের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি সার্বভৌমত্ব" তত্ত্বটিকে একটি বিশেষ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার মতবাদ অসম্পূর্ণতাদোষে (inadequacy) দুষ্ট।

অষ্টিনের মতবাদের মূল্য

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (Pluralistic conception of sovereignty): সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ (monistic view) সমর্থনকারীদের মতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও সংঘের উপর সার্বভৌমের চূড়ান্ত এবং অবাধ ক্ষমতা আছে। বোডেঁ, হব্‌স্ এবং অষ্টিন সার্বভৌমত্বের এই বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন। এই একত্ববাদের প্রতিবাদস্বরূপ বহুত্ববাদের (pluralism) আবির্ভাব হয়। বহুত্ববাদে রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ সংঘ হিসাবে পরিগণিত করা হয়; কোন উচ্চতর মর্যাদা অথবা মূল্য ইহাতে আরোপ করা যায় না।[২] রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইবে—এই ধারণা হইতেই সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদের (Pluralistic view) সমর্থকগণ রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা নিজেদের মতবাদের সাহায্যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লাস্কি এমনও

১। Prof. D. N. Banerjee's Paper.—"Austin and the Basis of Obedience to Law."

২। "..........Pluralism regards the state as a particular association with no superior value or status."

—Mabbott : The State and the Citizen.

বলিয়াছেন যে সার্বভৌমত্বের ধারণাটি বর্জন করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ হইত।[১] বহুত্ববাদীদের মধ্যে ফিগিস্ (Figgis), মেইটল্যাণ্ড (Maitland), বার্কার (Barker), ম্যাক আইভার (Mac Iver) এবং লাস্কিই (Laski) প্রধান।

সার্বভৌম ক্ষমতার একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদীদের সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্র শুধু শক্তির ধারক নহে,—রাষ্ট্রকে বর্তমানে 'কল্যাণ-রাষ্ট্র হইতে হয় জনসাধারণের সেবার মাধ্যমে। নূতন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাষ্ট্রের ভিতরে জনগণের আনুগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। একটি নাগরিক একই সময়ে নিজের রাজনৈতিক দল, ধর্ম-সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারে। এই সকল সংঘের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করা বা ইহাদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। বিভিন্ন সংঘের মধ্যে রাষ্ট্র হইতেছে অন্যতম একটি সংঘ। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক লাস্কির মতে সার্বভৌম ক্ষমতা এককভাবে চূড়ান্ত অথবা অনন্য নয়, ইহা বহুমুখী, নিয়মতান্ত্রিক এবং দায়িত্বশীল। ইহা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাহার দ্বারাই ইহা সীমিত, ইহার আদর্শের মধ্য দিয়া নির্দেশাত্মক,—আধিপত্য বিস্তারকারী নহে। ইহা কখনই স্থায়ী নহে, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিটি ইচ্ছা অনুযায়ী ইহা পরিবর্তনশীল। ইহার ক্ষমতা বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন কার্যসমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া থাকে। আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ভাবেই ইহার ক্রিয়াকলাপ সীমিত এবং পর্যালোচনার অধীন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান যাহার বিশেষ কাজ হইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্রিরাকলাপের সমন্বয় করা। ইহা হইতেছে একটি জনসেবার সংস্থা।

সার্বভৌম ক্ষমতার একত্ববাদের বিপক্ষে যুক্তি

সার্বভৌম ক্ষমতা এককভাবে চূড়ান্ত অথবা অনন্য নয় ; ইহা বহুমুখী ও নিয়মতান্ত্রিক

চার্চ, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন সংঘ জনসাধারণের সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তির ফলেই হইয়াছে। রাষ্ট্রের যেমন উপযোগিতা আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও সেই প্রকার উপযোগিতা আছে। লাস্কির মতে "..The group is real in the same sense that the state is real". এইসব সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বর্তমানে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ

যে অর্থে রাষ্ট্র বাস্তব সেই অর্থে বিভিন্ন সংঘও বাস্তব

১। "...........It would be of lasting benefit to Political Science if the whole concept of sovereignty were surrendered."—Laski.

সম্পর্ক।[১] অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকা উচিত এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। অধ্যাপক ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, একটি পেন্সিল কাটিবার পক্ষে যেমন একখানি কুঠার খুবই অনুপযোগী অস্ত্র মানুষের জীবনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির বিকাশের পক্ষেও রাষ্ট্র সেইরূপ অনুপযোগী। বহুত্ববাদীদের মতে সসীম রাষ্ট্রকে কখনই সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করা উচিত নহে।

তৃতীয়তঃ, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং ইহার সদস্যেরা সেই শাসনতন্ত্র মানিয়া না চলিলে শাস্তি পায়। যেমন কোন ছাত্র অথবা ছাত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করে তখন বিশ্ববিদ্যালয় সেই ছাত্র অথবা ছাত্রীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন; সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা নিজস্ব শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সঙ্গত কারণেই থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সার্বভৌম ক্ষমতা কখনই রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নহে। যে কোন সংঘের নিজের গণ্ডীর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব একটি কুসংস্কার বলিয়াও কোন কোন বহুত্ববাদী মনে করেন। এইভাবে বহুত্ববাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, বহুত্ববাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের যতই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত জনমত যদি কোনও আইনের তীব্র বিরোধিতা করে তখন রাষ্ট্রকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন

সর্বশেষে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত এবং অনন্য ক্ষমতা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যেরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই প্রকার আন্তর্জাতিক আইন অথবা চুক্তির দ্বারাও ইহা সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে নিজের সার্বভৌমত্ব জাহির না করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে হয়। নিজের সার্বভৌমত্ব অনুযায়ী না চলিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকেও স্বীকার করিয়া

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ

১। "The State is contracted not merely by unassociated individuals but also by other associations evolving independently, eliciting individual loyalties, better adapted than the state—because of their select membership, their special forms of organisation and action—for serving various social needs."

—Coker—Recent Political Thought, P. 508.

শান্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইতে হয়।[১] এইভাবে বহুত্ববাদীগণ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সীমারেখা দেখাইয়াছেন।

সমালোচনা: কতিপয় ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীদের মতবাদ সত্য। কিন্তু, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। অধ্যাপক লাস্কি তাঁহার "Grammar of Politics" বইয়ের চতুর্থ সংস্করণে বহুত্ববাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বহুত্ববাদ সম্বন্ধে নিজেদের মতবাদের কিছু সংস্কার করিয়া বলিলেন "It did not sufficiently realise the nature of the State as an expression of class relations." তাঁহার মতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহা হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় আনা। এই কাজের দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রেরই। একথা ভুলিলে চলিবে না যে রাষ্ট্রের অবর্তমানে এমন কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নাই যাহা বিভিন্ন সংঘের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিতে পারিবে অথবা কতকগুলি সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে অন্যান্য সংঘের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে

বহুত্ববাদীগণও রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের সীমারেখা কোথায় থাকিবে অথবা একত্ববাদীগণ (Monists) রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা হইতে কতটা বিচ্যুত হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কার্যক্ষেত্রে বহুত্ববাদীগণ ইহা অনুভব করিয়াছেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অযথা ব্যাপক করা।[২]

বহুত্ববাদের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের স্তর সম্পর্কে মতভেদ

বহুত্ববাদ হইতেছে রাষ্ট্রের আদর্শবাদের (Idealists) বিরুদ্ধেও একটি প্রতিক্রিয়া। কারণ এই মতবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ, সংঘগুলির

১। "......Against......assertion of absolute sovereignty, there is also a drift toward a recognition of the conception of the State as a partner with other States in the furtherance of peace and social and political justice. For the attainment of this purpose sovereignty must be relative, not absolute."

—Shotwell : The Problem of Government.

২। এইক্ষেত্রে জিমার্ণের (Zimmern) একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।
"The smaller the group the lighter the stranglehold over your life and activities."

—Zimmern—The Great Issues of Politics, P. 407.

স্বাধীনতার অস্বীকৃতি এবং স্বৈরাচারিতার সম্প্রসারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করে। বহুত্ববাদিদের আলোচনার ফলে রাষ্ট্রনীতি অনেকাংশে বাস্তবধর্মী হইয়াছে। কিন্তু বহুত্ববাদের একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা নৈতিক ধারণা এবং আইনসঙ্গত ধারণার মধ্যে পার্থক্য করে। বিভিন্ন সংঘের যে অধিকারগুলি লইয়া বহুত্ব-বাদীগণ আলোচনা করিয়াছেন সেইগুলি হইতেছে সংঘগুলির নৈতিক অধিকার, আইনসঙ্গত অধিকার নহে। কিন্তু বহুত্ববাদগণ এই নৈতিক অধিকারগুলিকেই আইনসঙ্গত অধিকারের মর্যাদা দিয়াছেন। কোন কোন লেখক বহুত্ববাদীগণকে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদের (Anarchy) পথিকৃৎ বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। ছোট ছোট সংঘগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলে সমাজজীবনে অরাজকতার সৃষ্টি হইতে পারে। অবশেষে, লাস্কি একজন বহুত্ববাদের সমর্থক হইয়াও ইহার একটি ত্রুটি দেখাইয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে বহুত্ববাদ একথা কখনই উপলব্ধি করে নাই যে রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীসম্বন্ধের বিশেষ প্রকাশ।

বহুত্ববাদের ত্রুটি

বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইহা রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নতি করিয়াছে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া বহুত্ববাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছে এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিলোপ করিতে পারে নাই। তবে এই মতবাদ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার, বিশেষতঃ, আইনগত সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সংস্কার সাধন করিতে পারিয়াছে। সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রই যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সত্য বহুত্ববাদীরা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

বহুত্ববাদের অবদান হইতেছে রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করা

সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা (Limits to Sovereignty or Theory of Limited Sovereignty): সার্বভৌমত্বের প্রচলিত অর্থানুযায়ী ইহা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, অনন্য এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহা অবাধে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু যদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং অসীম, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না তাহা নহে। অধ্যাপক ডাইসির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর দুইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, একটি বাহ্যিক এবং অপরটি আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে ঐশ্বরিক বিধান, জনমত এবং শাসনতান্ত্রিক আইন।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সীমা

কিন্তু, চিন্তা করিলে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে সন্দেহ নাই। যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন সন্ধি অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং চুক্তির শর্ত ইহাকে পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন যে কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে তাহা প্রমাণিত হয় রাষ্ট্রসংঘের (U. N. O.) যে সংকল্পপত্র আছে তাহার ২ নম্বর ধারার ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হইতে। সেখানে বলা হইয়াছে, "The Members shall refrain in their international relations from threat or use of force." শুধু তাহাই নহে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে যুদ্ধ হয়, তাঁহাব বিরতি আনয়ন করিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল এবং যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ সর্বদা নাও মানিয়া চলিতে পারে বলিয়া এবং সর্বদাই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে বলিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হওয়ায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধি হইতে যে কোন রাষ্ট্র নিজের নাম যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক আইন পালন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাহীন হইলেও বাস্তবে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া নিজের সার্বভৌমত্বকে জাহির করিবার চেষ্টা করে না।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি

রাষ্ট্রসংঘ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে কিনা

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে ঐশ্বরিক বিধান একটি। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মানবতার দোহাই—ইহাদের কোনটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়; কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তন হয় না। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রের প্রথম আইন এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের সংস্রব বর্জিত হইতে পারে। যদি নীতিবিবর্জিত কোন আইন প্রণয়ন করে তবে ইংলণ্ডের আদালত সেই আইন কার্যকর করিতে বাধ্য।

ঐশ্বরিক বিধান

ঐশ্বরিক আইন যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, অনেকের মতে শাসনতান্ত্রিক আইনও (Constitutional Law) সেই প্রকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থকদের মতে সরকারী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিস নহে; রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ম্যাক আইভার (Mac Iver) এই যুক্তিটি গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে, শাসনতান্ত্রিক আইনই রাষ্ট্রের কাঠামো নিরূপণ করে। সমাজের সমুদয় শক্তি-চেতনা এবং মতামত শাসনতান্ত্রিক আইনে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ আইনের অনুমোদন (sanction) অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক আইনের অনুমোদন (sanction) বিচার করিলে ভুল হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ীই রাষ্ট্রকে চলিতে হয় বলিয়া ম্যাক আইভার মনে করেন যে ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

জনমত যত শক্তিশালীই হউক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ইহার নাই; ইহা অবশ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জার্মানীতে হিটলার যখন শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন তিনি জনমতের প্রবল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যতক্ষণ রাষ্ট্র জনমত, শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলে ততক্ষণ নিজের ইচ্ছায়ই রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে।

জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে না

সম্প্রতি বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সসীম হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, শ্রমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কলহের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের যে সকল ক্রিয়াকলাপ থাকে, সেইগুলির মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর থাকে।

বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত ও অনন্ত নয়

সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতা (Sovereignty in relation to individual liberty). রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী ; এই যুক্তিটি গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয় না। আধুনিক মতানুযায়ী সার্বভৌমত্ব যদি লোকায়ত্ত (Popular) হয়, অর্থাৎ, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী যদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকর হয়, এবং যদি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসন ব্যবস্থার নিয়ামক হন, তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী না হইয়া বরং ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বহুত্ববাদীদের (Pluralists) মতে অষ্টিনের এই মতবাদ বিপজ্জনক। তাঁহাদের মতে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার উৎস শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তি-সমষ্টি নহে। সার্বভৌমত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমাজের সর্বস্তরে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান, সংঘ প্রভৃতি দেখিতে পাই, সেগুলির প্রত্যেকটিরই কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে এবং সেগুলি সেই প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সব সদস্যদেরই মানিয়া চলিতে হয়।

'সার্বভৌমত্ব কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদি সার্বভৌমত্ব বলিতে আমরা বুঝি আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) তবে একথা স্বীকার করিতে হয় যে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমের ক্ষমতা অসীম, অনন্য এবং অনতিক্রম্য। অষ্টিনের মতানুযায়ী "আইন হইতেছে সার্বভৌমের আদেশ" ("Law is the command of the Sovereign"), অর্থাৎ সার্বভৌম যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আইন। সেই আইন অমান্য করিবার ক্ষমতা বা অধিকার কাহারও থাকিবে না। কেহ যদি সার্বভৌমের আদেশ লঙ্ঘন করেন, তবে তিনি আইন অমান্যের অপরাধে শাস্তি পাইবেন। অষ্টিনের এই যুক্তি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক। কারণ, নাগরিকগণ নিজেদের স্বাধীনতা অনুযায়ী ততক্ষণই কাজ-কর্ম করিতে পারিবেন অথবা ততক্ষণই সেই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের বিরোধী না হয়। যদি নাগরিকদের মতানুযায়ী এমন কিছু হওয়া উচিত যাহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের বিরোধী অথবা যদি নাগরিকগণ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন যাহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত অথবা স্বীকৃত আইনের পরিপন্থী, তবে সেক্ষেত্রে সার্বভৌমের আদেশ অথবা সার্বভৌম কর্তৃক প্রবর্তিত আইন-ই গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হইবে ; নাগরিকদের স্বাধীনতা বা অধিকারের কোন মূল্য সেক্ষেত্রে থাকিবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত করে।

যে সকল দেশে একনায়ত্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক শাসন দেখা যায় সেই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়। ইদানীংকালে কোন কোন দেশে আমরা

সামরিক শাসন দেখিয়াছি এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের আড়ালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। সুইজারল্যাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত আছে।

বিশ্বশান্তির সঙ্গে সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে (Sovereignty in relation to international peace): কোন রাষ্ট্র যখন নিজের সার্বভৌমত্ব বিশেষতঃ বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব (external sovereignty) সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন থাকে, তখন ইহার পক্ষে সর্বক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অথবা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার শর্ত অনুযায়ী অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রভৃতি মানিয়া চলা সম্ভব নাও হইতে পারে, এবং যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিশ্বশান্তির বিঘ্নকারক হইতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্ধ হইয়া আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসন ভঙ্গ করিতে পারে এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সংঘাত কিংবা যুদ্ধের সম্ভাবনার সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র উগ্রজাতীয়তা বোধে (aggressive nationalism) প্রবুদ্ধ হইয়া অপর রাষ্ট্র আক্রমণ করিবার জন্য অথবা একটি সাম্রাজ্য গঠন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে।

কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় বাহিরের কোন শক্তিই রাষ্ট্রের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না অথবা ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না। সব রাষ্ট্রই যদি সম্পূর্ণভাবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্বক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য জাহির করিতে চায়, তবে আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ অনুশাসনগুলি কেহই অনুসরণ করিতে চাহিবে না এবং বিশ্বে যুদ্ধে ডাকিয়া আনিবে ও শান্তি ক্ষুণ্ণ করিবে[১]।

কিন্তু আধুনিককালে অধিকাংশ রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রকাশিত প্রথা মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং প্রত্যেক রাষ্ট্রই যাহাতে নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিতে পারে এবং আবার কোন রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সব রাষ্ট্রেরই আনুগত্য দরকার। রাষ্ট্র সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের অনেক কাছে আসিয়াছে। কমনওয়েলথ অফ নেশনস্‌ও কয়েকটি রাষ্ট্রকে পরস্পরের কাছে আনিয়াছে। ইহাতে কাহারও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছে না,—বরং ইহা বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার পথ সুগম করিয়াছে।

১। এইজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন "The world has been so interdependent that an unfettered will of any State becomes fatal to the peace of other States."
Laski—Introduction to Politics.

সার্বভৌমত্ব কি অবিভাজ্য? (Is Sovereignty Indivisible?): সার্বভৌম ক্ষমতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অবিভাজ্যতা (indivisibility)। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অছি-শাসনব্যবস্থা (Mandated territories; দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসনব্যবস্থা (Condominium) প্রভৃতি উদ্ভবের ফলে সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অছি-শাসনব্যবস্থায় একটি অনগ্রসর জাতি এক বা একাধিক উন্নত এবং সভ্য জাতির তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মনে হয় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করেন। দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত শাসনব্যবস্থায় একটি রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষ হইতেছেন যুগপৎ দুইটি রাষ্ট্র। পূর্বে সুদানের শাসনভার যুগপৎ মিশর ও বিটেনের উপর ন্যস্ত ছিল। সেক্ষেত্রেও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিত দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হয় বলিয়া মনে হয়; বিশেষতঃ যদি রাজ্য সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অবাধভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন করার পদ্ধতি তিনপ্রকার; যদি শাসনতন্ত্র সংশোধনকারী সংস্থার হাতে সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত থাকে, তবে ভারতে সার্বভৌমত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের হাতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট এবং রাজ্যবিধানমণ্ডলের হাতে যৌথভাবে ন্যস্ত। এইক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বকে প্রকৃতই অবিভাজ্য বলা যায় কিনা তাহাতে বিতর্কের অবকাশ আছে।

সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতই অবিভাজ্য কিনা

কিন্তু অছি-শাসনব্যবস্থা এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চিরকাল স্থায়ী হয় না। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই এই প্রকার শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সুতরাং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অপর রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। অছি-শাসনব্যবস্থা অথবা দ্বি-রাষ্ট্রায়ত্ত অধীনে কোন রাষ্ট্রকে আমরা পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কেননা, ইহা তখনও পরাধীন থাকে। এক সঙ্গে দুইটি রাষ্ট্রই সেই ক্ষেত্রে সমানভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। যদি সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ করা হয়, তবে ইহার বিনাশ ঘটে। সার্বভৌম ক্ষমতার যদি বিভাগ করা না হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে যদি ইহা বিনষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহা একটি অথবা দুইটি রাষ্ট্র কর্তৃক মিলিতভাবে গঠিত একটি আইনসভা অথবা শাসকমণ্ডলী অথবা অনুরূপ কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ হয় না। শুধু যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমতা প্রয়োগ হয়, সেই বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন

অছি-শাসনব্যবস্থা ও দ্বি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা চির-কালীন ব্যবস্থা নাই

করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারেব হাতে থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ হয় বলা ঠিক নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই অবিভাজ্য। ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ ঘটে।

সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই অবিভক্ত

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান (Location of Sovereignty):

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণ-সার্বভৌমত্ব অথবা লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (বিশেষতঃ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে) দাঁড়াইয়া জনগণ কখনই অবাধে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখক বলেন, যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন এবং সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকেই আমরা সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলণ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, ইহা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অন্যরূপ। সার্বভৌমত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অবিভাজ্যতা। সার্বভৌমত্বের বিশেষ তাৎপর্য হইতেছে এই যে ইহা রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য; সুতরাং প্রশ্ন উঠে, যুক্তরাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব কোথায় অবস্থিত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতিপয় রাজ্য সরকার থাকে এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন দেখা যায়। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে, ক্ষমতার বণ্টনের সহিত কি সার্বভৌমত্বও বণ্টিত হইবে? কিন্তু সার্বভৌমত্ব তো বণ্টিত হইতে পারে না। এইজন্য অনেকে বলেন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব শাসনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু শাসনতন্ত্র হইতেছে ক্ষমতা প্রয়োগের দলিল মাত্র; ক্ষমতা প্রয়োগকারী মানুষ নহে, সুতরাং শাসনতন্ত্রকে সার্বভৌম আখ্যা না দিয়া শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষমতাকেই সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া উচিত[১]।

"It (soverignty) lies in the body, wherever and whatever it may be which has the power to amend the constitution." Leacock

কিন্তু আমেরিকায় কংগ্রেস অথবা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র খুব অনমনীয় (rigid)। সেইদেশে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা রাজ্য-আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার দাবীতে আহূত একটি বিশেষ সভা (convention) কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব রাজ্য-আইন সভাগুলির তিন-চতুর্থাংশের অথবা আহূত বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি লাভ করিলে কার্যকর হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবস্থান নির্ণয় (Location of sovereignty in a Federation)

এই পদ্ধতি খুবই জটিল। কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকিলেই চলিবে না, রাজ্য-আইনসভাগুলিরও অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা চাই। আবার যদি রাজ্য-আইনসভাগুলির দুই-তৃতীয়াংশ কোন বিশেষ সভা আহ্বান করে, তবে সেই বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলি শাসনতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভারতবর্ষেও আমরা শাসনতন্ত্র সংশোধনের তিনটি পদ্ধতি দেখিতে পাই: (১) রাজ্যপুনর্গঠন এবং নূতন রাজ্যের সৃষ্টি, বিধানমণ্ডলের উচ্চ কক্ষ স্থাপন করা অথবা তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনের জোরে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে; (২) কতিপয় ক্ষেত্রে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত ব্যাপারে শাসনতন্ত্র সংশোধনকারী কোন বিল প্রথমে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলে ইহাকে দেশের মোট রাজ্যবিধানমণ্ডলের অন্ততঃ অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে; এবং (৩) শাসনতন্ত্রের অন্যান্য বিধানগুলির সংশোধন করিবার জন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টের প্রতিটি কক্ষের উপস্থিত এবং ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সার্বভৌমত্বের একক অবস্থান খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধনের ফলে মৌলিক অধিকার সহ শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। ইহার ফলে ভারতীয় পার্লামেণ্ট বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে এইক্ষেত্রে অধ্যাপক লাস্কির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"The discovery of sovereignty in a federal state is, practically, an impossible adventure."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি

তৃতীয়তঃ, গেটেলের (Gettell) মতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে। আইনসভা

বলিতে তিনি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় আইন-প্রণয়নকারী সংসদের কথা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগও আইনের নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করিতে পারে। শাসন-বিভাগও অনেক ক্ষেত্রে আইনের সৃষ্টি করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে জনসাধারণ গণভোট, গণনির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়ের সাহায্যে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং গেটেলের মতে দেশের সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু গেটেলের এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, অথবা আইনসভা সরকারের বিভিন্ন অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের কোন অংশ, অর্থাৎ সরকার, এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই ; ইহা একটি অবিভাজ্য, অনন্য এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা।

আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থান

সংক্ষিপ্তসার

১। **সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য**—সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রত্যেক প্রজা ও ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে মৌলিক (original), অনিয়ন্ত্রিত ও চূড়ান্ত (absolute), অসীম (unlimited), অবিভাজ্য (indivisible), অনন্য (exclusive), স্থায়ী (permanent), হস্তান্তরের অযোগ্য (inalienable) এবং সার্বজনীন (all-comprehensive)। ইহার একটি আইনানুমোদিত স্বত্ব আছে।

২। **সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ**—সার্বভৌম আইনসঙ্গতভাবে (De Jure) সার্বভৌম এবং বাস্তব (De Facto) সার্বভৌম হইতে পারে। আবার নামমাত্র (Titular) সার্বভৌম এবং নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) সার্বভৌম, এই দুই প্রকার সার্বভৌমও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সার্বভৌমত্বের তিনটি শ্রেণীবিভাগ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেইগুলি হইতেছে, আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty), রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty) এবং গণসার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty)। সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকদের মধ্যে হব্‌স্ আইনগত সার্বভৌমত্ব, লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং রুশো গণ-সার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **অস্টিনের মতবাদ—ইহার সমালোচনা এবং বহুত্ববাদ**—অস্টিনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ এবং এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ সমাজের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে থাকিবেন। সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য যদি সার্বভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই যথেষ্ট। সার্বভৌমের আদেশই আইন বলিয়া গৃহীত হইবে, এবং তাঁহার ক্ষমতা অসীম, অনন্য ও অবিভাজ্য।

অস্টিনের মতবাদের বিপক্ষে প্রধান সমালোচনা হইতেছে এই যে—ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং এই মতবাদে গণ-সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নে প্রথাগত বিধান অথবা

জনমতের ভূমিকা স্বীকৃত হয় নাই। 'এই ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীরা অভিযোগ করিয়া বলেন, যে অস্টিনের মতবাদ সার্বভৌমকে স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে; রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে অস্টিন তাহা স্বীকার করেন নাই। বহুত্ববাদীরা বলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত অথবা অনন্য নয়। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদিও সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং তাহা হইতেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় আনা। বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল ইহা রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করিয়াছে।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা—সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের দিক হইতে চূড়ান্ত ও অসীম হইলেও ইহার দুই প্রকার সীমা আছে: একটি হইতেছে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ যাহা আসে আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক হইতে, এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আসে ঐশ্বরিক বিধান, জনমত, এবং শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে। কিন্তু, এই সীমাগুলি বাস্তবে কার্যকরী হইলেও ইহা বলা চলে যে তত্ত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। কিন্তু যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই জনগণের সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে অথবা সার্বভৌম শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন কী পরিমাণে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা তত্ত্বের দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্বিপাকে জড়াইতে চাহে না। সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান—রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নিবারণ করা যায় না। অনেকে সার্বজনীন সার্বভৌমত্বের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ তাহারা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; সম্পূর্ণভাবে তাহাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলা যায় না। আবার, অনেকের মতে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকে আমরা সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গেটেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইন-প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে।

Exercise

1. What do you understand by Sovereignty ? What are the attributes of Sovereignty ? (C. U. B. A. 1962) (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা : ৮১-৮৪ পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ ? সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি ?]

2. Distinguish between (a) De Jure and De Facto Sovereignty, and (b) Actual and Titular Sovereignty, and (c) Legal, Political and Popular Sovereignty. (C. U. B. A. P. I. 1963, 1965, 1967) Give illustrations.

(৮৪-৮৮ পৃষ্ঠা)

[(ক) আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব, (খ) নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব এবং (গ) আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও গণ-সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।]

3. Explain clearly the Doctrine of Popular Sovereignty. Discuss its limitations. (৮৮-৯০ পৃষ্ঠা)

[গণ-সার্বভৌমত্বের নীতিটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা কর। ইহার সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।]

4. State and examine Austin's Theory of Sovereignty.

(C. U. B. A. P. I.) 1964, B. U. 1963, C. U. 1963) (৯০-৯৪ পৃষ্ঠা)

[অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বটি বর্ণনা কর ও পরীক্ষা কর।]

5. Discuss the pluralistic criticisms of the classical theory of Sovereignty.

(B. U. 1961 ; C. U. 1964) (৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্বের পুরাতন তত্ত্ব সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের সমালোচনাগুলি আলোচনা কর।]

6. What attacks have been made on the Theory of Sovereignty in recent times and how far has there been a change in the conception of Sovereignty ?

(৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)

[সাম্প্রতিককালে সার্বভৌমত্ব তত্ত্বটি সম্পর্কে কি কি আক্রমণ করা হইয়াছে এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণার কি কি পরিবর্তন হইয়াছে ?]

7. What do you mean by 'limited sovereignty' ? How far is Sovereignty of a State limited by (a) Constitutional Law and (b) International Law ?

(৯৮-১০০ পৃষ্ঠা)

[সীমাবদ্ধ সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ ? একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (ক) শাসনতান্ত্রিক আইন এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা কতটা সীমিত।]

8. "Sovereignty is limited from within and from without"—Examine the statement.

["সার্বভৌমত্ব দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে সীমিত"—উক্তিটা পরীক্ষা কর।] (৯৮-১০০)

[**ইঙ্গিত :** এই প্রশ্নের উত্তরে দুইদিক হইতে সার্বভৌমত্বের সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। বহুত্ববাদীগণ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সীমা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদীগণ বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের সমালোচনা করিয়াছেন। সার্বভৌমত্বের সীমা কোথায় সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিতে হইবে।]

9. "To divide Sovereignty is to destroy it."—Discuss the statement.

(১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্বকে ভাগ করা হইতেছে ইহাকে নষ্ট করা"—উক্তিটি আলোচনা কর।

10. Discuss the Theory of Divided Sovereignty. (১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

[বিভক্ত সার্বভৌমত্ব তত্ত্বটি আলোচনা কর।]

11. How can Sovereignty of a State be located ? Answer your question with reference to the British and the American constitutions. (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

[একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কিভাবে অবস্থিত। ব্রিটেন এবং আমেরিকার শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দাও।]

12. Explain carefully what you understand by Sovereignty. How far can Sovereignty be said properly to belong to the people ?

(৭৯-৮০ পৃষ্ঠা ; ৮৮-৯০ পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা কর। সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে থাকে ইহা কতটা ঠিকভাবে বলা যায় ?]

13. "The discovery of sovereignty in a federal state is, practically an, impossible adventure." (Laski)—Discuss. (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

"একটি যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের অবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে একটি অসম্ভব প্রচেষ্টা আলোচনা কর।]

14. Explain the Austinian Theory of Sovereignty and make a critical estimate of it. (৯০-৯৪ পৃষ্ঠা)

(C. U. B. A. Part I. Revised Regulation, 1966)

[অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার একটি সমালোচনা মূলক বিবরণ দাও।]

15. Write an analytical note on the attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty. (C. U. B. A. 1962) (৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া টীকা লিখ।]

16. State and explain the Monistic Theory of Sovereignty. On what grounds has it been attacked ? (C. U. B. A. 1968) (৯৩-৯৪পৃষ্ঠা)

[সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী তত্ত্বটি বর্ণনা কর ও ব্যাখ্যা কর। কি কি কারণে ইহার বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হইয়াছে।]

17. The concept of sovereignty is opposed to individual liberty and international Peace." Discuss Critically. (C. U. B, A. 1970)

[সার্বভৌমত্বের ধারণা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী" সমালোচনা সহ আলোচনা কর।] (১০১-১০২ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

আইন
(Law)

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আলোচনা করিবার পর আমরা আইন সম্পর্কে আলোচনা করিব। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের মাধ্যমেই প্রযুক্ত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতাও হইতেছে প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন করিবার এবং সেই আইনকে কার্যকর করিবার ক্ষমতা। সেইজন্য সার্বভৌমত্বের আলোচনার পর আইনের আলোচনা করা দরকার।

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law): "আইন" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (Social Law) মানিয়া চলে, অথবা সভ্য জীবন-যাপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন (Ethical Law) পালন করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক।

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অষ্টিনের মতে আইন হইতেছে সার্বভৌমের আদেশ। অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তি হইতেছে একটি "উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ ("a determinate human superior")। জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের আদেশকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদের

সমর্থকগণের মতে অষ্টিনের দেওয়া সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত প্রথা (conventions or traditions) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হইতে কিছু না কিছু আইনের সৃষ্টি হয়। অষ্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী সেইগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টিনের সমর্থকগণ অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহাদের মতে আইন হইতেছে সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বারা কার্যকর করেন। উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তা এবং স্বভাবের সেই অংশ যাহা কতিপয় একধরণের নিয়মের মাধ্যমে সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা কার্যকর হইয়াছে।[১]

হল্যাণ্ডের (Holland) মতে আইন হইল মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়।[২] উড্রো উইলসনের মতে আইন কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নহে, ইহা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ সুযোগ অথবা দুর্দশার সৃষ্টি।[৩]

আইনের উৎস (Sources of Law): আইন যে সর্বদাই রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহা নহে। আইনের সৃষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে পারে; যেমন সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়পরতা, আইনবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

১। **প্রথা (Custom):** বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীনকালে প্রথার সাহায্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার চেষ্টা করা হইত। এই প্রথার সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে প্রথা হইতেছে আইনের উৎসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ধর্মের ভয়েই হউক বা অপরকে অনুকরণ করিয়াই হউক কিংবা প্রথা পালন করিবার উপযোগিতার জন্য হউক, প্রাচীনকালে জনসাধারণ অধিকাংশ প্রথাই মানিয়া চলিত। এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশ সৃষ্ট হয় না। এমনকি আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়।

'প্রথা' হইতেছে আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস

১। "Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."—Wilson.

২। "Law is a political rule of external action enforced by a sovereign political authority".—Holland.

৩। "Law is the creation, not of individual, but of special needs, the special opportunities, special perils or misfortunes of the communities."
—Wilson.

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসাবে এই প্রথাগত বিধানগুলিও আইনের মর্যাদা লাভ করে। আইনের সহিত প্রথার সংঘাত হইতে পারে। আইন কোন প্রথাকে আক্রমণ করিলে সেই প্রথাও পুনরায় আইনকে আক্রমণ করিতে পারে।[১] উদাহরণস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। দেশে যদি লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র থাকে, তবুও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিতে পারে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন উল্লেখ নাই। অথচ প্রথাগত বিধানের ফলে আমেরিকায় বিভিন্ন সচিবদের লইয়া একটি সচিবমণ্ডলী (মন্ত্রিসভার ন্যায়) গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র নহে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেইগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না।

২। **ধর্ম (Religion)ঃ** শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অনুশাসনও অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। সমাজ-জীবনে শৃংখলা আনয়নে ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পুরাকাল হইতেই ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। বর্তমানকালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে উত্তরাধিকার আইন (Succession Act) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা হইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব সূচিত করে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরক্ষভাবে আইনের বিবর্তনের সাহায্যে করিয়াছে। প্রথম যুগে রোমান আইনগুলিও (Roman Laws) কতিপয় ধর্মীয় সূত্র ছাড়া কিছু ছিল না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্ম কর্তৃক আইন প্রভাবিত হইয়াছে

৩। **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication or judicial interpretation):** আদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনেক সময়ে নূতন আইনের সৃষ্টি করে। যখন কোনও আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না অথবা কোন আইনের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার

১। "Custom, when attacked, attacks law in turn, attacks not only the particular law which opposes it ; but, what is more vital, the spirit of law-abidingness, the unity of the general will."—Mac Iver, The Modern State. P. 21.

হয় না, তখন বিচারকগণ সেই আইন সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন অথবা নূতনভাবে সেই আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা যদি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা নূতন আইনে পরিণত হয়। মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিচারকগণের রায় হইতে আইনের সৃষ্টি হয়। আইনের মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তবে বিচারকগণ নিজেদের সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই ফাঁক দূর করিতে পারেন।

৪। **ন্যায়বিচার** (**Equity**)**:** শুধু আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করাই নহে, বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (Justice) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ীও কোন আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের আইন যে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে ন্যায়পরতার অভাব থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কোন বিচারক যদি ন্যায়বোধের ভিত্তিতে কোন সমস্যার বিচার করেন, তবে তাহার ফলে আইনের সৃষ্টি হইতে পারে।

৫। **আইনবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** (**Scientific discussions**)**:** অনেক সময় আইনবিদ্‌গণের মিলিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই ব্যাখ্যা যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়, তবেই আইনে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনকালেও সর্বজন-স্বীকৃত পণ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের মর্যাদা লাভ করিত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মনু-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি।

৬। **আইনসভা** (**Law-making body**)**:** বর্তমানকালে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভা। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা-প্রণীত আইন সার্বভৌম কর্তৃক কার্যকর হয়, সেজন্য আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা প্রচলিত প্রথা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না।

ওপেনহিম্ (Oppenheim) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস আছে, তাহা হইতেছে সমাজের সাধারণ সম্মতি। জনগণের সাধারণ সম্মতিই বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহার, ন্যায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (**Different Schools of Jurisprudence**)**:** আইনের স্বরূপ উৎস সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন রকমের ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই ধারণা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে

পারি। যথা, (১) বিশ্লেষণমূলক ধারণা (The Analytical School), (২) ঐতিহাসিকমূলক ধারণা (The Historical School), (৩) দার্শনিক ধারণা (The Philosophical School), (৪) তুলনামূলক ধারণা (The Comparative School), এবং (৫) সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণা (The Sociological School)। নিম্নে আইন সম্বন্ধে এই মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হইল।

আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ধারণা (The Analytical concept of Law : আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক মতবাদ বিশেষভাবে প্রচার করেন বেন্থাম (Bentham) এবং অষ্টিন (Austin)। এই মতবাদ অনুযায়ী আইন হইতেছে কতিপয় কাজ করিবার জন্য এবং কতিপয় কাজ না করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির আদেশ মাত্র। এই মতবাদ অনুযায়ী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য একটি সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ। সার্বভৌম শক্তির এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় এমন একজন কর্তৃক যিনি সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং যিনি সর্ববিষয়ে অন্যান্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[১]

বিশ্লেষণমূলক ধারণার একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা আইনকে স্থিতিশীল বলিয়া মনে করে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের অথবা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আইনের যে পরিবর্তন হয় সেইদিকে এই মতবাদ দৃষ্টি দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ আইন এবং 'আদেশ' (command) এই দুইটির মধ্যে প্রকৃত সীমারেখা দেখাইতে পারে নাই। ম্যাক্ আইভার প্রকৃতই বলিয়াছেন, আইন হইতেছে আদেশের বিপরীত; উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নিম্নতর কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু আদেশ প্রাপকের পক্ষে তাহা পালন না করিয়া উপায় নাই। আদেশ প্রদানকারী এবং আদেশ পালনকারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। অথচ আইনের ক্ষেত্রে যিনি আইন-প্রণেতা তাহার ক্ষেত্রেও সেই আইন প্রযুক্ত হয়।[২] আদেশ প্রযুক্ত হয় শাসনবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নহে। আইনের একটি বিশেষ স্থায়িত্ব আছে; কিন্তু আদেশ ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত

১। "Every law simply and strictly so called is set by a sovereign person or.........body of persons to a member or members of the independent political society wherein that person or body is superior or supreme."

—Barker, Political and Social Theories, P. 92.

২। "Law is the very antithesis of command, as that term is usually understood, for command separates the giver and the receiver, separates their status always and sometimes their interest as well. But law unites, for it applies no less to the legislator than to those for whom he has authority to legislate." —Mac Iver, *The Modern State.*

হয়। আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ধারণার এই ত্রুটিগুলি থাকিলেও এই মতবাদের একটি বিশেষ স্থান হইতেছে এই যে ইহা সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত। বেন্থাম এই মতবাদকে হিতবাদের (utilitarianism) সহিত জড়িত করায় এই মতবাদ সাধারণের কল্যাণে আইনের বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

এই ধারণার গুণাগুণ

আইন সম্পর্কে ঐতিহাসিক ধারণা (The Historical concept of Law) : এই মতবাদের প্রধান সমর্থক হইলেন জার্মান লেখক স্যাভিগ্‌নি (Savigny) এবং ইংলণ্ডের স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine), ফ্রেডারিক পোলক (Frederick Pollock), এবং ম্যাইটল্যাণ্ড (N. W. Maitland)। এই মতবাদ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের স্বরূপ ও উৎসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত আইনের স্বরূপ যে পরিবর্তিত হয় সেইদিকে এই মতবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অতীতের বিভিন্ন শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারাই আইন পুষ্ট ("the resultant of the forces and influences of the past")—ইহাই হইতেছে এই মতবাদ অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা।[১] বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণীত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীনকালে রোমান সাম্রাজ্য আইন প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতেও আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরণের আইন দেখিয়াছি। মোগল সম্রাটদের আমলে যে আইন দেশে প্রচলিত ছিল, ইংরাজ শাসনের আমলে সেই আইনের পরিবর্তন হইয়াছিল। আবার আধুনিককালেও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তন হইতেছে। ঐতিহাসিক মতবাদ আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা আইনের ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে সামাজিক অবস্থার খুবই বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা ("a realistic treatment of social phenomena in the light of the historical data of law") এই মতবাদ অনুযায়ী হঠাৎ একদিন কাহারও আদেশবলে আইনের সৃষ্টি হয় নাই অথবা সার্বভৌম শক্তি কোন আদেশ প্রদান করিয়াছে বলিয়াই আইনের সৃষ্টি হয় নাই। এই মতবাদ আইনের ইতিহাসের (legal history) উপর গুরুত্ব আরোপ করে—আইনের দর্শনের (legal philosophy) উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। এই মতবাদের একটি বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিয়া ইহা আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

ঐতিহাসিক ধারণার প্রকৃতি ও গুণাগুণ

১। "Its point of view is retrospective. It sees law as a resultant of the entire play of the forces of the past."

—Patterson.

আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা (The Philosophical concept of law): আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণার প্রধান সমর্থক হইলেন জার্মানীর অধ্যাপক জোসেফ কোহ্লার (Joseph Kohler)। তাঁহার মতে আইনশাস্ত্র বিশারদ দার্শনিক আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেমন অনুসন্ধান করেন, আইনের আদর্শ সম্পর্কেও সেই প্রকার অনুসন্ধান করেন। আইন হইতেছে সংস্কৃতির ফলশ্রুতি এবং সংস্কৃতি উন্নত করার প্রয়াস।[১] আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা সম্পূর্ণভাবে আইনের তত্ত্বগত ধারণা লইয়াই ব্যস্ত। আইনের যে শুধু একটি আদর্শগত দিক আছে তাহাই নহে, ইহার প্রকৃত বিষয়বস্তুর দিকটিও উপেক্ষণীয় নহে। আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে সামাজিক অন্যায় দূর করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা এই তত্ত্বের সহিত বাস্তবজীবনের সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা অনেকক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে ; কেননা এই তত্ত্ব অনুযায়ী আইন হইতেছে দার্শনিকদের একটি কল্পনা-প্রসূত ধারণা।

দার্শনিক মতবাদের স্বরূপ

আইন সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা (The comparative concept of Law): আইন সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণার সৃষ্টি এখনও হইয়াছে বলা যায় না ; যাহা আমরা প্রকৃকপক্ষে দেখিতে পাই তাহা হইতেছে আইনের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়াস। তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যাপকতা ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যাপকতা অপেক্ষা বেশী। ইংলণ্ডে স্যার পল্ ভিনোগ্রাডফ (Sir Paul Vinogradoff) এই মতবাদের বহুল প্রচার করেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী আইন সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই একটি মতবাদ তৈয়ারী করা যায় না। বিভিন্ন দেশের অতীত এবং বর্তমান আইনগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া আইনের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই এই মতবাদের তাৎপর্য। এই মতবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইনের কাঠামো তুলনা করিয়া আইনের স্বরূপ সম্বন্ধে নূতন আলোকসম্পাত করা সম্ভবপর হইয়াছে।

তুলনামূলক ধারণার তাৎপর্য

আইন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান মূলক ধারণা (The Sociological concept of Law): সমাজবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যাঁহারা আইনের স্বরূপ ব্যখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার গামপ্লোউইক (Gamplowicz), ফ্রান্সের ড্যুগুইট (Duguit), হল্যাণ্ডের ক্র্যাবে (Krabbe), এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রস্কো পাউণ্ড (Roscoe Pound) এবং বিচারপতি

১। "The juristic philosopher is as much concerned with the ideal as with the actual content of law. Law is both the product of culture and a means for furthering it."

—Josep Kohler.

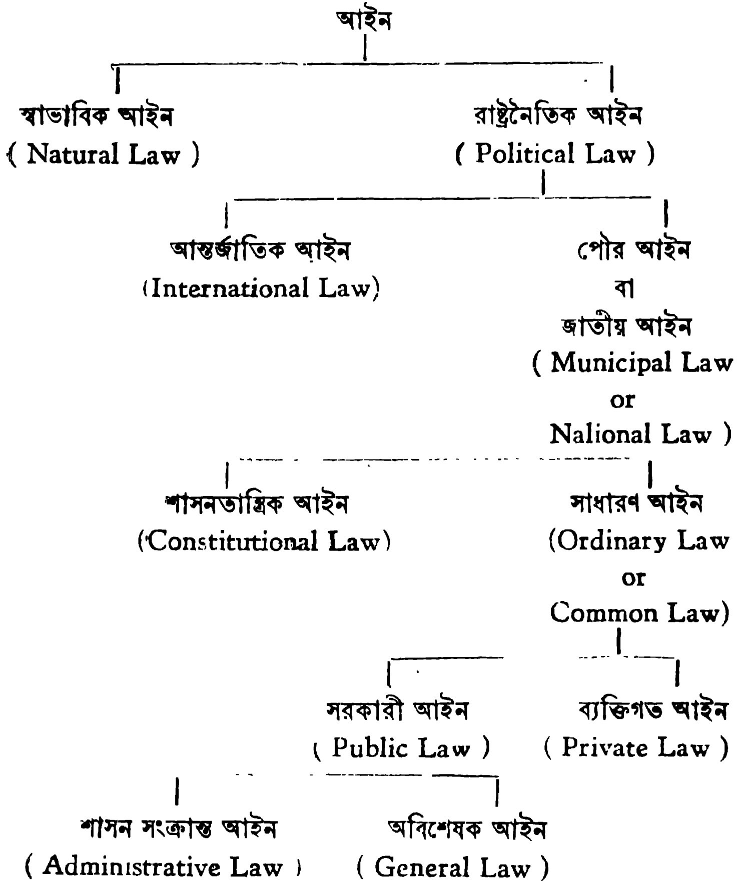
হোম্‌স (Justice Holmes) প্রধান। এই মতবাদ অনুযায়ী আইন বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্ধিত এবং সুন্দর সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবার মধ্যেই আইনের সার্থকতা। সমাজবিজ্ঞানীগণের মতে, আইন কার্যকর হইবার পিছনে সার্বভৌম শক্তি প্রযুক্ত হয় বলিয়াই যে আইন পালন করা হয় তাহা নহে—অথবা স্বভাবগত কারণে যে আইন পালন করা হয় তাহাও ঠিক নহে। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে আইন সমাজ জীবনের পক্ষে উপকারী বলিয়াই আইন পালন করা হয়। তাঁহাদের মতে আইনের সৃষ্টি হয় সামাজিক স্বার্থে অথবা সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে,—সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় নহে। আইন রাষ্ট্রীয় শক্তি হইতে শুধু সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহাই নহে,—ইহার সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে এবং ইহা রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানে তাহা অপেক্ষা আরও গভীর ধারণা। ("Law is independent of, anterior to, above and more comprehensive than the state")।

উপসংহার: আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্পর্কে আমরা পাঁচটি মতবাদ আলোচনা করিলাম। প্রতি মতবাদেই এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে যে সুশৃংখল সমাজজীবনের জন্য আইন অপরিহার্য। কিন্তু, আইন প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োগে রাষ্ট্রের কী ভূমিকা থাকিবে সেই সম্পর্কে এই মতবাদগুলি একমত পোষণ করে না। এই মতবিরোধের কারণ হইতেছে আইনের উৎস সম্বন্ধে জটিলতা। আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার অস্পষ্টতা ও মতভেদের জন্য আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে পাঁচটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের আইন (Different types of Law): আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমরা দেখিয়াছি। এখন আমরা দেখিব, আইন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে।

আমরা বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ উৎস হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আইনটি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কিনা তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আইন (Private Law) বলি। সরকারী আইন (Public Law) রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট। আইনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমরা সাধারণ আইন (Common Law), সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law), পৌর আইন (Municipal Law), শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law), ফৌজদারী আইন (Criminal Law), আইনসভা প্রণীত আইন (Statutes) এবং অর্ডিন্যান্সের

(Ordinance) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। নিম্নে অংকিত তালিকা হইতে আইনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে।



সংবিধানে দেশের শাসন সম্পর্কিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে আমরা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক বিচার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law)। অপরাধ-সংক্রান্ত অথবা অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি

ফৌজদারী আইন অথবা দণ্ডবিধি (Criminal Law)। যখন বিভিন্ন প্রথা হইতে উদ্ভূত আইন সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া লয় এবং অন্যান্য আইনের ন্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ আইন (Common Laws) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন্ নীতি অনুযায়ী চলিবে, সে সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতে রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য হইতেছে এই যে আন্তর্জাতিক আইন যদি কোনও রাষ্ট্র পালন না করে, তবে কোন আদালতে আইনভঙ্গকারীরূপে ইহার বিচার হইতে পারে না। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, যে কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অথবা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে পারে, যদিও নিজের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। হল্যাণ্ডের মতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হইয়াছে এই প্রকার প্রচলিত আইনকে পৌর আইন (Municipal Law) বলা যাইতে পারে। কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন (Statutes) বলিতে পারি। আবার জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে একটি আদেশ (Ordinance) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে পরিগণিত হয়। আইনের বিধান (Rule of Law) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে, (১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ আদালতের এলাকাধীন। আইন ভঙ্গ না করিলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না। ইংলণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে।

স্বাভাবিক আইন (Natural Law) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ এবং পরিণতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পারি। গাছ হইতে আম মাটিতে পড়ে, ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় না। প্লেটো এবং এরিষ্টটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহাদের মতে মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। অথচ, প্রকৃতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানবীয় আইন স্বাভাবিক আইনের ন্যায়

স্বাভাবিক আইন
(Natural Law)

সম্পূর্ণ ইহা মনে করা অনুচিত। হবস্, লক এবং রুশোও স্বাভাবিক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা বিভিন্ন। যে সকল আইন বা নিয়ম মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ, যে সকল আইন সামাজিক জীবনে সকলেই মানিয়া চলে, সেইগুলিকে সামাজিক আইন (Social Laws) বলা হয়। নৈতিক আইন (Moral Laws) বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই,—ইহা একটি নৈতিক আইন। রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম আইন,—সেইজন্যই প্রয়োজন হইলে ইহা নীতিশাস্ত্র বিবর্জিত হইতে পারে। যখন কোন নিয়ম মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয়, তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন হিসাবে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আইন নহে, কেননা, কোন রাষ্ট্রেই আইনতঃ আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। তবুও প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের একটি অনুমোদন (sanction) হইতেছে সমগ্র বিশ্বের জনমত। সেদিক হইতে 'আন্তর্জাতিক আইন' কথাটি আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। কারণ ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি কার্যকর করে না।

নৈতিক আইন (Moral Law)

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

ম্যাক আইভার প্রমুখ লেখকগণ আইনকে দুইভাগে বিভক্ত করেন ; যথা— জাতীয় আইন (National Law) এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) এবং সাধারণ আইন (Ordinary Law) এই দুই-ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ আইনকে পুনরায় সরকারী আইন (Public Law) এবং বে-সরকারী আইন (Private Law) এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। সরকারী আইন পুনরায় শাসনসংক্রান্ত (Administrative Law) এবং সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত আইন (General Law) এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমোক্ত আইন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে এবং শেষোক্ত আইন রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে।

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law) : আইনের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে আইন হইতেছে একটি অথবা কতিপয় নিয়ম যাহা শুধু মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা কার্যকর

হয়। আইনের প্রকৃতি লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অষ্টিনের মতে আইন হইতেছে নিম্নতনের প্রতি উর্দ্ধতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ মাত্র ("Law is the command of the sovereign")। এই মতবাদ বিশ্লেষণী আইনবিদগণ (Analytical jurists) গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্লেষণ-পন্থী লেখক হল্যাণ্ডের (Holland) মতে আইন হইতেছে মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।[১] ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) এইযুক্তি গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া গণ্য করা অথবা সব আইনই সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক। কারণ এমন অনেক আইন আছে যেগুলি সম্পূর্ণ প্রথাগত (conventional) এবং যেগুলি কখনই সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু এই মতবাদের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা মনে করেন, যে সকল প্রথা আইনের মর্যাদা লাভ করে সেইগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় বলিয়াই আইনের মর্যাদা লাভ করে। সমাজে অসংখ্য প্রথা আছে যেগুলি সর্বদা স্পষ্ট অথবা গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য আইনের দৃষ্টিতে সেই প্রথাগুলিই আইনের মর্যাদা লাভ করে যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। সুতরাং আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয়।

আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন আইনের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন; "আইন হইতেছে মানুষের সুপ্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয় এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকে।"[২] আইন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়াই ইহা অমান্য করিলে শাস্তির ভয় থাকে। প্রতিটি আইনের পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগ।[৩] অধ্যাপক বার্কারের মতে আইনকে শুধু রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা অনুমোদিত এবং প্রযুক্ত হইলেই চলিবে না, ইহাকে বিধি সম্মত এবং যুক্তিসঙ্গতও হইতে হইবে। এইজন্য ইহার (১) বৈধতা (validity) এবং (২) নৈতিক মূল্য (value) থাকা চাই।[৪] হল্যাণ্ড এবং উইলসন আইনের বৈধতার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বার্কার

আইনের বৈধতা এবং নৈতিক মূল্য—আদর্শ আইনের দুইটি উপাদান

১। "A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority". —Holland.

২। "Law is that portion of the established thought and habit which has found a distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the Government".

৩। "The last resort of enforcement lies behind law". —Mac Iver

৪। "Ideally law ought to have both validity and value".
—Barker; Prinicipies of Social and Political Theory, P. 191.

আইনের মূল্যায়নের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইক্ষেত্রে বার্কারের সহিত অধ্যাপক লাস্কির মতৈক্য দেখা যায়। লাস্কিও মনে করেন, আইনের প্রকৃতি এইরূপ হওয়া উচিত যেন ইহা জনসাধারণের সক্রিয় চাহিদাকে (effective demand) পূরণ করিতে পারে ; অর্থাৎ, আইন যেন জনসাধারণের আশা-আকংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। আইন শুধু বৈধ (valid) হইলেই চলিবে না ; ইহাকে জনগণের উপযোগী এবং জনগণের নিকট সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে। তবেই ইহা আদর্শ আইনে পরিণত হইবে। এইজন্য আইনকে জনসাধারণের আশা-আকাংখা অনুযায়ী সম্পাদিত হইতে হইবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য হইতে হইবে সকলের কল্যাণ সাধন করা তবে আইন রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়াই ইহার বৈধতা বজায় থাকে, এবং ইহার বিশেষ নৈতিক মূল্য থাকিলেই জনগণ সক্রিয়ভাবে ইহা পালন করে। বার্কার বলেন, আইনের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই, অর্থাৎ আইনের বৈধতা এবং মূল্য আছে বলিয়াই, ইহা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং কার্যকর হয়।[১]

উড্রো উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়।[২] মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা মানুষেরই সৃষ্ট আইনের মধ্যে রূপ পায়। কোন দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করিলে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিষ্টতার পরিচয় পাই। আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা আইনের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন রূপ (Generality)। আইন সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও বর্তমানকালে আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সকলেই সমানভাবে আইনের অধীন।[৩] দ্বিতীয়তঃ আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে। আইনের বাধ্যবাধকতা ইহার বৈধতার পরিচায়ক। আইন যদি

আইনের সার্বজনীন রূপ এবং বাধ্যবাধকতা

বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে ইহা পালন করিতে জনসাধারণ বাধ্য। অর্থাৎ, লোকে আইন পালন করিতে বাধ্য হয়। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে। ইহা

১। "...It is only because law, as a whole and in its general nature, possesses both attributes that it actually operates and is actually effective." —Barker.

২। "Law is a mirror of conception. It is an active force which has got a physical and an ethical compulsion." —Wilson.

৩। "Becauste it is general in its application the law of the State must be compulsive ; because it is external in its injunction the law of the state can be compulsive." —Mac Iver, The Modern State, P. 263.

হইতেছে শারীরিক বাধ্যতা (physical compulsion)। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ নৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে আইনের নৈতিক বাধ্যতা (ethical compulsion)। কিন্তু যখন মানুষ আইন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় এবং অপরের স্বাধীনতা খর্ব করে, তখনই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়।[১] সামাজিক আইন (Social Laws) এবং রাজনৈতিক আইনের (Political Laws) কতিপয় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আইন যতটা জোর করিয়া কার্যকর করা যায়, সামাজিক আইন কার্যকর করিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ জোর করিতে হয় না। বিভিন্ন সংঘের আইন সেই পরিমাণেই কার্যকর হয় যে পরিমাণে জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে ; যদি জনসাধারণ তাহা গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির সদস্যপদ ছাড়িতে হয়। বিভিন্ন সংঘের আইন বাধ্যতামূলক নহে ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন সর্বদা বাধ্যতামূলক। খণ্ডিত অথবা উন্নত সমাজে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনই জোর করিয়া প্রযুক্ত হয়।[২] রাষ্ট্রীয় আইন কোন সময়েই অমান্য করা যায় না।

আইনের অনুমোদন (Sanction of Law): আইনের অনুমোদনের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি" এই মতবাদে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাঁহাদের মতে আইনের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল ঐশ্বরিক বিধান। অর্থাৎ যেহেতু রাজা আইন প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেইজন্য আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, বর্তমানে সেই মতবাদ গৃহীত হয় না। কাণ্ট, হেগেল, প্রমুখ আদর্শবাদীদের মতে আইন অনুমোদনের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাবস্থায় পালন করিতে হইবে, এই ছিল তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, এই যুক্তিটিও বর্তমানে গৃহীত হয় না। যাঁহারা সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ লক্ ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে আইন পালন করিতে হইবে এইজন্য যে যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োগ করেন, তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাঁহারা চুক্তি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থকেই আইনের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু,

আইনের অনুমোদন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

১। "The underlying principle of universality is opposed to the arbirary or selective or spasmodic treatment oi persons or actions. It requires that all who are alike in respect of the service or capacity envisaged by the law shall be treated in the same way, and in a different way from those who are in this respect unlike". —Mac Iver, The Modern State, P. 257.

২। "The law of the State alone, in a demarcated or advanced society, is coercive".

এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে আইনের অনুমোদন কিভাবে হইবে তাহা বুঝাইতে পারে না। অষ্টিনের মতে আইনের অনুমোদন সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ, সার্বভৌমের আদেশই হইতেছে আইন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা (Pluralists) আইনের অনুমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ করেন না।

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের কতিপয় নিয়ম যাহা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। অর্থাৎ, আধুনিক লেখকগণ মনে করেন যে আইন সর্বদাই এমন হওয়া উচিত যেন জনসাধারণেরই বিভিন্ন ধরণের ইচ্ছা ইহাতে বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসাধারণের ইচ্ছা বা সম্মতিই হইতেছে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি (grounds of political obligation)। অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন মানুষের কার্যকর চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। যাহারা রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, আইন তাহাদের ইচ্ছানুযায়ীই গঠিত হয়।[১] বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের কার্যকর চাহিদা রাষ্ট্রের ভিতর অর্থ নৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন জনগণের এমন এক ইচ্ছাকে বাস্তবে কার্যকর করে যাহা নিজেকে কার্যকর করিতে জানে।[২]

জনগণের সম্মতি আইন পালনের ভিত্তি

জনগণ কর্তৃক আইন পালন করা অথবা না করা আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন পালন করিবার মূল কারণ জোরজবরদস্তি (coercion) নহে,—ইহার মূল কারণ হইতেছে আইন পালনের ইচ্ছা। যদিও আইনের অনুমোদন জনগণের ইচ্ছা বা সম্মতির উপর নির্ভরশীল, তবুও আইন পালন করিতে সকলেই বাধ্য।[৩]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের অনুমোদনের (sanction) ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র

১। "Legal imperatives are a function of effective demand."—Laski —Introduction to Politics.

২। "Law appears as the registration of that will in society which has known how to make itself effective." —Laski.

৩। "The root of obedience to law is not coercion but the will to obey ; nevertheless law takes the form of an imperative."

—Mac Iver—The Modern State, P. 21.

সম্বন্ধে রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কী লক্ষ্য, অথবা কেন ইহা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি আমরা বুঝি যে রাষ্ট্রের আইন আমাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হইয়াছে তবেই সেই আইন সার্থক এবং তবেই সেই আইন আমাদের অনুমোদন লাভ করিতে পারে।[১] আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহা পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা (legal validity)। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় শর্ত হইতেছে ইহার জনগণের আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা। এইজন্য ইহার একটি নৈতিক মূল্য (value) থাকা দরকার।

আইনের অনুমোদন নির্ভর করে জনগণের সম্মতির উপর

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে। কাহারও ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। এইসব স্বার্থ যে সর্বদাই একপ্রকার হয় তাহা নহে,—ইহারা কোনও সময়ে পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময় পরস্পরের সহযোগী। সুতরাং রাষ্ট্র যদি কখনও এই ইচ্ছা করে যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রকাশ করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহা সর্বাধিক পরিমাণে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে। নাগরিকদের জীবনের সুখ-সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে তাহার উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা আনুগত্য প্রকাশ করিবে। যদি রাষ্ট্রের আইন সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে তবেই আইন ঠিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করিতে পারে।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার স্বার্থ থাকে; সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে আইন ঠিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করে

রাষ্ট্রের আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে যেগুলিকে আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলণ্ডে আমরা বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম (conventions) দেখিতে পাই। সেইগুলি অনুমোদনের (sanction) প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব। তাহা

১। "The legal imperatives of any state must always be conceived as if they are to be capable of justification in term of the end it seeks to serve, they are so to say, a permanent essay in the conditional mood."

Laski—Introduction to Politics, P. 45.

ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। জনমতই হইল আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে তবে আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রাষ্ট্র তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্যের সহিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আইনের অনুমোদন জনমতের ভূমিকা

যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহে তাহা অনুযায়ী এবং আমাদিগকেও সেভাবেই আইন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

আইন কি জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ? (Is Law the expression of the general will of the people?):

রুশো গণ-সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে জনসাধারণের সাধারণ ইচ্ছাটিই আইনের উৎস এবং বাস্তব রূপ হিসাবে ধরিয়াছিলেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটিকে অবলম্বন করিয়া আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাধারণের ইচ্ছাই যদি আইন প্রণয়নের প্রকৃত ভিত্তি হয়, তবে জনসাধারণের সকলকেই আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। 'স্বাধীনতা' বলিতে রুশো রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীনতা বুঝান নাই; তিনি 'স্বাধীনতা' বলিতে বুঝিতেন রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাধীনতা,—অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করিবার জন্য স্বাধীনতা।[১] সাধারণের ইচ্ছা যদিও আইনের ভিত্তি বলিয়া রুশো মনে করিতেন, তবুও একথা ঠিক যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হয়ত সকলে একমত নাও হইতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই 'সাধারণের ইচ্ছা' হিসাবে কার্যকর হইবে এবং সেইক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বুঝাইতে হইবে যে সকলের কল্যাণের (common good) জন্যই তাহাদের সেইভাবে আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করা উচিত। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নিজ হইতে ইহা বুঝিতে না চায় তবে তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে রুশোর মতে জনসাধারণের ইচ্ছাই হইতেছে সকলের প্রকৃত ইচ্ছার (real will) সমন্বয় এবং সেইজন্য ইহার ভিত্তিতে আইন প্রণীত হইলে সেই আইন জনগণের কল্যাণকারক হয়।

রুশোর মতে সাধারণের ইচ্ছাই হইতেছে আইনের উৎস

১। "By 'liberty' Rousseau............means no freedom from political control but freedom for political control, freedom to determine the course of legislation."

—Mabbott: *The State and the Citizen.*

সম্পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য নিয়ন্ত্রণ—এই দুই-এর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইলেই সামাজিক জীবন কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক সমাজে আইন হইতেছে সমাজের সাধারণের ইচ্ছার (general will) একটি বাস্তব রূপ। সরকারকে আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলেও চলে যদি সেই আইন জনসাধারণের আশা-আকাংখাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া সহযোগী হয়। কেননা সেক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন করে। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন যে এই মতবাদ অনুযায়ী সাধরেণের ইচ্ছা সর্বদাই সক্রিয় থাকে,—লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের অধীনে স্থায়ী গণভোটের (permanent referendum) দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে।[১] প্রকৃতপক্ষে রুশো এই ধরনের রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজে আইন সাধারণের ইচ্ছার একটি বাস্তব রূপ হওয়ার অর্থ এই নয় যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ করে; তবে আইন প্রণয়নে সকলেই অংশ গ্রহণ করে।

সমালোচনা—আইনের ভিত্তি সম্বন্ধে রুশো যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা বর্তমানকালের বিরাট রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে না; জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু রুশো প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন কখনই সমর্থন করেন নাই। *Social Contract* বইয়ে রুশো বলিয়াছিলেন, "Representative government is a spacious form of slavery."

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের ইচ্ছা যদি আইন প্রণয়নের ভিত্তি হয় তবে প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকেই আইন বাস্তবে রূপ প্রদান করে, এবং সেই ক্ষেত্রে "সাধারণের ইচ্ছা" এই যুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদল অন্যায়ভাবে নিজেদের ধারণা এবং ইচ্ছা সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর চাপাইরা দিতে পারে। ইহাতে আদর্শের নামে অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ আইন সর্বক্ষেত্রে সাধারণের স্বার্থ বজায় রাখে। সে সমাজে অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন হয় নাই, সেই সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী দল প্রতিপত্তিহীন দলের উপর নিজেদের জোর খাটাইতে পারে এবং অধিকতর অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে এই জাতীয় সমাজ-

২। "The state is conducted by permanent referendum, and its law binds its members because they are themselves making its substance".

—Laski—An Introduction to Politics. P. 26,

ব্যবস্থায় আইন হইতেছে এমন একটি মুখোস যাহার আড়ালে মুষ্টিমেয় কয়েক-জন অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন লোক রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের সুফল লাভ করে।[১] সুতরাং এই ক্ষেত্রে আইনকে জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলা যায় না। সাধারণের ইচ্ছাকে যদি ব্যাপকভাবে 'জনমত' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে অবশ্য আইনকে জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ বলা যাইতে পারে। সেইক্ষেত্রে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কারণ, আইন সেখানে তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হয়।

স্বাভাবিক আইন (Natural Law) : স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে ধারণা খুবই প্রাচীন। এরিষ্টটল আইনকে দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা, বিশেষ আইন (Particular law) এবং বিশ্বজনীন আইন (Universal Law)। শেষোক্ত আইন ছিল তাঁহার মতে স্বাভাবিক আইন। এরিষ্টটলের পর জেনো (Zeno) এবং রোমান ষ্টোইক (Stoics) দার্শনিকগণ স্বাভাবিক আইনের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং ইহা রোমান আইনশাস্ত্রের (Roman Jurisprudence) অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালীন মতবাদ অনুযায়ী স্বাভাবিক আইন বিভিন্ন জিনিসের প্রাকৃতিক গতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে। এইখানে 'প্রকৃতি' বলিতে শুধু সাধারণ প্রাকৃতিক জগতের পরিবেশ বুঝাইত না; ইহা ছিল ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাকারী একটি নৈতিক এবং ধর্মীয় ধারণা। নির্দিষ্ট আইন (Positive Law) এবং স্বাভাবিক আইনের পার্থক্য হইতেছে যে শেষোক্ত আইন একটি আদর্শের ধারক ও বাহক। মধ্যযুগে স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনের মর্যাদা লাভ করিবার জন্য নির্দিষ্ট আইনের (Positive law) প্রতিযোগী হয়। তৎকালীন খৃষ্ট ধর্মযাজকগণ স্বাভাবিক আইনকে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া প্রচার করেন এবং ইহার নিকট নতি স্বীকার করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদের (secular realism) প্রচারকগণ শুধু যুক্তির ভিত্তিতে স্বাভাবিক আইনকে মানিয়া লইবার জন্য প্রচারকার্য চালান।

স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ধারণা

লকের মতে স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Right) ন্যায় কতিপয় স্বাভাবিক আইন আছে, এবং এইগুলি ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করে।

বর্তমানে স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা খুবই কম। তবুও সমাজ জীবনে এমন কতিপয় অপরিবর্তনীয় নীতি আছে যেগুলি ন্যায়-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে কার্যকর করা উচিত। যদি কেহ ন্যায়বোধের ভিত্তিতে স্বাভাবিক আইন মানিয়া

১। "The state as a legal order is a mask behind which some dominant economic interests secure the benefit of political authority".

চলিতে রাজী না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে সে ভ্রান্তপথে চালিত হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ন্যায় বোধ সম্পর্কে মানুষের ধারণার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতেছে। মধ্যযুগে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বা বলপ্রয়োগের সাহায্যে অপরের সিংহাসন অধিকার করা স্বাভাবিক আইনের দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। তাহা ছাড়া, যখনই আমরা দেখি নির্দিষ্ট আইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে তখনই নির্দিষ্ট আইন কার্যকর হইয়াছে। বিপ্লবের সময় অবশ্য স্বাভাবিক আইন কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় এবং আমেরিকার গণ-বিদ্রোহের (civil war) সময় মানুষ নির্দিষ্ট আইনকে উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক আইনের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক আইনকে কখনই প্রকৃত আইনের মর্যাদা দেওয়া যায় না, ইহা আদর্শবাদের কল্পনা মাত্র। কিন্তু মানুষের নীতি ও ধারণা বিবর্তনশীল ; সেইজন্য স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে বর্তমানে প্রচলিত ধারণা

আইন এবং নীতিশাস্ত্র (Law and Ethics) : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্র গভীরভাবে জড়িত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অপর দিকে নীতিশাস্ত্র নৈতিক বিধি এবং নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রাচীনকালে সমুদয় আইন নীতিশাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে আমরা কতিপয় পার্থক্য দেখিতে পাই। নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহিক সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানুষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যও নীতিশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের শুধু বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল চিত্তশুদ্ধির পথ সুগম করা : রাষ্ট্রীয় আইনের উদ্দেশ্য হইল সমাজে শান্তি, ও শৃংখলা এবং সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখিয়া সকলের কল্যাণের জন্যই মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। নীতিশাস্ত্র শুধু মানুষেরই অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না ; নীতিশাস্ত্রের মাপকাঠির দ্বারা মানুষের বাহিক জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হয়। মিথ্যা কথা বলা, অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও হিংসা করা অথবা মনের নীচতা প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী। কিন্তু ইহা যদি আইনভঙ্গের কারণ না হয় অথবা কাহাকেও শারীরিক আঘাত দেওয়া না হয় তবে আমরা ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, অনুমোদনের দিক হইতেও রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের

আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তুর পার্থক্য

মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রীয় আইন কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নৈতিক আইনভঙ্গ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শাস্তি পাইতে হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে এবং হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে। সুতরাং শারীরিক শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন, অথবা সমাজের উপহাস সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ। তাহা ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী।

অনুমোদনের পার্থক্য

প্রয়োজন হইলে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে পারি অথবা ইহা সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু, নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে পারি না। চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরুদের এই মান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে কোনও মান নাই। তবে, রাষ্ট্রকে আইনে প্রণয়ন করিবার সময় সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিতে হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু, সেগুলি যে সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী হইবে, তাহা নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় যদি সেই নৈতিক নিয়ম সামাজিক স্বার্থের সহিত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে। কাহাকেও হত্যা করা হইলে অন্যায় হয়, ইহা যেমন একটি নৈতিক নিয়ম, সেই প্রকার ইহা একটি রাষ্ট্রীয় আইন। কিন্তু এইজন্য সর্বদাই যদি সব নৈতিক বিধিকেই রাষ্ট্রীয় বিধির মর্যাদা দেওয়া হয় তবে নৈতিক আদর্শেরই ক্ষতি হয়। সিজউইকের (Sidgwick) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিত ততক্ষণ সম্পর্কযুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[১] অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, বালিকাদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন

নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নৈতিক আইনের একটি বিশেষ মান আছে

১। "Ethics is connected with Politics so far as well-being of any individual man is bound up with the well-being of his society".

"To turn all moral obligations into legal obligations would be to destroy morality." Mac Iver.

যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরণের বিবাহ নৈতিক আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। লর্ড বেন্টিংকের আমলে সতী-দাহ প্রথা আইন-বিরোধী কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবার পর হইতে ইহা যে একটি অন্যায় প্রথা ছিল সে সম্পর্কে সমাজের ধারণা স্পষ্ট হয়।

রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবর্জিত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়। প্রকৃতপক্ষে যে সকল রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেগুলির প্রতি মানুষের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা বেশী থাকে। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইস্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে, একটি হইতেছে, ভাল আইনের সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত প্রচলিত নৈতিক আইনগুলির যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, সেইদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি (অর্থাৎ যে আইনগুলি জনস্বার্থ বিরোধী এবং চিরন্তন ন্যায় নীতির বিরোধী) রাষ্ট্রের বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে পাই। অস্পৃশ্যতানিবারণ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাণের জন্য কারখানা আইন প্রবর্তন, জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রভৃতি ভাল ভাল আইন রাষ্ট্র প্রণয়ন করিয়াছে।

নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত রাষ্ট্রের কর্তব্য

আইন মান্য করা হয় কেন? (Why is Law obeyed?): আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট আইন পালন করিলেই তাহাদেরই স্বার্থ সুরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাতে তাহাদেরই মঙ্গল, তখনই তাহারা আইন পালন করে। এখানে আইন কেন মান্য করা হয় তাহা আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের উপলব্ধির উপর ভিত্তিশীল। অপর একটি মতবাদ অনুযায়ী মানুষ শাস্তির ভয়ে কিংবা অরাজকতার আশংকায় আইন পালন করিয়া থাকে। আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে। এই ভয়ে মানুষ আইন পালন করে। হবস্, অষ্টিন প্রমুখ লেখকগণ আইন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় এবং ইহা যে সেইজন্য অবশ্য পালনীয়, এই যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। হবস্ অবশ্য আরও একটি যুক্তির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কদর্য প্রকৃতির রাজত্ব

আইন কেন মান্য করা হয় সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা

হইতে অথবা অরাজকতা হইতে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ আইন পালন করে।

উপরে আইন কেন মান্য করা হয় সেই সম্বন্ধে যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করা হইল তাহার সমন্বয় করিয়া স্যার হেন্‌রী মেইন (Sir Henry Maine) এবং তাঁহার অনুগামীগণ মনে করেন, মানুষ শাস্তির ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় কারণেই আইন মান্য করিয়া থাকে। কিন্তু লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার পাঁচটি কারণ দেখাইয়াছেন;—যথা (১) নির্লিপ্ততা (Indolence), (২) শ্রদ্ধাভক্তি, (Deference), (৩) সহানুভূতি (Sympathy) (৪) শাস্তির ভয় (Fear) এবং উপযোগিতার উপলব্ধি বা বিচার-বিবেচনা (Reason)। নির্লিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে মানুষ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করে না; যেহেতু রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়াছে, সেইজন্য সে আইন পালন করে। শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসক কিংবা জননেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হিসাবে মানুষ আইন পালন করিয়া থাকে। শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও নাগরিকগণ আইন পালন করিয়া থাকে। আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয় হইতেও অনেকে আইন পালন করিয়া থাকে। সর্বশেষে, মানুষ তখনই আইন পালন করিয়া থাকে যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে আইন পালন করিয়া চলিলে তাহারই কল্যাণ। আইন যদি মানুষের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করে এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকর চাহিদাকে পূরণ করিবার চেষ্টা করে তবে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন করে। গ্রীণের ভাষায় "Will and not force is the basis of the State" অধ্যাপক লাস্কিও বলিয়াছেন যে মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে একটি বিশেষ আইনের স্বীকৃতির অর্থ হইতেছে তাহারই স্বার্থ কিংবা কার্যকর চাহিদার স্বীকৃতি তখনই মানুষ সেই উপযোগিতার উপলব্ধি হইতেই আইন পালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়।[১] আইনের বৈধতা (Validity) এবং মূল্য (Value), উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আইন পালন কেন করা হয়, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা উচিত।[২]

আন্তর্জাতিক আইন (International Law): সুসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার

১। A legal imperative has "no claim to obedience merely because it is effective. Its claim to obedience depends upon what it does to the lives of individual citizens. Of this they alone can judge".

Laski—Introduction to Politics.

২। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য—"আইনের অনুমোদন" (Sanaction of Law) শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জন্য সকলেরই সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি।[১] আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজ ব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সঙ্গত এবং বিচার-সম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম ; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে এই নিয়মগুলির সংশোধন করা যাইতে পারে অথবা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার নাগরিকদের উপর কতটা কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ করে। বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। বর্তমান যুগে বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক হইতে মুক্ত কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (closed economy) আমরা দেখিতে পাই না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণকারী প্রত্যেক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাষ্ট্রই এককভাবে টিঁকিয়া থাকিবার কথা চিন্তা করিতে পানে না।

আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব খুব বেশী। শুধু ভদ্রতার খাতিরেই (by courtesy) অথবা দাক্ষিণ্য কিংবা দয়া দেখাইবার জন্যই (by concession or grace) যে একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলে তাহা নহে। বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের প্রয়োজনেই আন্তর্জাতিক আইন পালন করিয়া থাকে। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organisation) গঠন এবং ইহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত করার প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি গভীর আনুগত্যের লক্ষণ।

১। লরেন্সের (Lawrence) ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, "the rules which determine the conduct of the general body of civilized States in their mutual dealings". ওপেনহিমের (Oppenheim) ভাষায় আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, "the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized States in their intercourse with each other".

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহা খুশী করিয়া যাইবে এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ক্ষুন্ন হয়। এইজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকিলে ইহা অন্য রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে মারাত্মক বাধা হইতে পারে।[১] কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতই আইন বলিতে পারি কিনা। অষ্টিনের মতে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন নহে। কারণ প্রথমতঃ, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চস্তরের মানবীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। যে আইন অমান্যের পিছনে কোনও শাস্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় না। কিন্তু কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলেই অপর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা রাখিবার চেষ্টা করে, পালন করিলে নহে। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি যেগুলিকে অসম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রসংঘে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত কারণে হল্যাণ্ড (Holland) বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক শাস্ত্রের লোপ-বিন্দু"। ("International Law is the vanishing point of Jurisprudence") এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যে অর্থে "আইন" কথাটি প্রচলিত সেই অর্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হিসাবে মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়।[২] কিন্তু মেইন (Maine), স্যাভিনি (Savini), প্রমুখ ঐতিহাসিক আইনবিদগণের মতে আইনকে যে সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট আদেশের রূপ পরিগ্রহ করিতে হইবে তাহা নহে। প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপরেও আইন গড়িয়া উঠিতে পারে, সুতরাং আন্তর্জাতিক আচার-ব্যবহার কিংবা আন্তর্জাতিক প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল নিয়মকানুন গড়িয়া উঠে এবং যেগুলি সাধারণতঃ সব রাষ্ট্রই মানিয়া চলিবার চেষ্টা করে সেই নিয়মকানুনগুলিকে "আইন' আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত আইন এবং নীতি-শাস্ত্রের মাঝামাঝি একটি স্তরে আছে; কেননা, ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কতিপয় নীতি বর্ণনা করে।[৩] একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃত আইন ?

১। "The world has become so interdependent that an unfettered will in any State is fatal to the peace of other States."
—Laski—Introduction to Politics, ch. V.

২। "International law has not any existence in the sense in which the term law is usually used". —Lord Salisbury

৩। "At present, international law is in an uneasy stage between morality and law proper". —Lloyd: Democracy and Its Rivals.

আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যন্তই ইহার পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন বৈধ।[১] কিন্তু, কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকে। সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন অমান্যকারী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে সব রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। কোনও রাষ্ট্রই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না,—কেননা, অপর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিবে এবং সেইক্ষেত্রে প্রথম রাষ্ট্রটি নিজের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে বাধ্য হইবে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত, এই জনমত কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের নহে; আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে জনমত সমগ্র বিশ্বের। হিংসার উন্মত্ততার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং শান্তির জন্য আকুল বিশ্ববাসীর কাছে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী চিরন্তন হইয়া থাকিবে। সুতরাং, বর্তমানে এমন দিন আসিয়াছে যে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়। কিন্তু এইজন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু, তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক সময় ভঙ্গ করা হয়; তাহাতে ইহার আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। এখনও পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে কেহই আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে সাহসী হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার কালে আন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রশ অনুসৃত নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান মধ্যে যুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমাণ্ডের কাছে যে পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention) অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীর প্রাপ্য ব্যবহার করা হইতেছে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি পালন করা হইতেছে। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং এই সম্পর্কের প্রধান অনুমোদন হইতেছে শক্তিশালী জনমত। নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের আইন যতটা প্রযোজ্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণেও আন্তর্জাতিক আইন ততটা প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই বর্তমানকালে সেই আইন পালন করিতে আইনতঃ না হইলেও জনমতের চাপে বাধ্য থাকে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি।

আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন

১। "International law is only valid for a given State to the degree that it is prepared to accept its substance". —Laski,—Introduction to Politics

রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র পালন করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা।

আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to the effectiveness of International Law): আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে চিরাচরিত সংঘাত এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (Cold War) মনোভাব। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মনোভাব কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে বটে, তবুও এই দুইটি দেশের মধ্যে এবং কমিউনিষ্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ ও চীন, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, প্রভৃতি দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি আমরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেখিয়াছি, তাহা আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করা এবং ইহার কার্যকারিতা জোরদার করিবার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির শক্তিমত্ততা অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অবনত হইবার জন্য দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ কিংবা কমিউনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারতবর্ষের সীমান্ত আক্রমণ বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহ করার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্বন্ধ (class relation), বিশেষতঃ ধনবৈষম্য, বহুলাংশে রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত করে। যখন রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি বিশেষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তখন সেই বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর একটি আন্তর্জাতিক আইন পালন করা অথবা না করা নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় রকমের অন্তরায়।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস: আন্তর্জাতিক আইনের উৎস (sources) হইতেছে ছয়টি। যথা:—(১) রোমান আইন; (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী; (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা; (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান। উল্‌সি, লরেন্স, হল, ওপেনহিম এবং গার্ণার প্রভৃতি লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং গ্রন্থাবলী বর্তমানের আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি একটি আইনগত আলোচনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক মতভেদের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত এবং অনুসৃত নীতি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রসূত মতবাদ উদ্ধৃত করা

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস ও প্রকৃতি

হয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় সেই মতবাদের উপর নির্ভর করা হয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আইনানুগ বিবেচনার সহিত সমালোচনা, সমর্থন অথবা বিচার করা হয়, এবং সর্বশেষে একটি আন্তর্জাতিক নৈতিক মান স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে আইন নহে, কারণ কেহ এই নৈতিক মান ভঙ্গ করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। তবুও বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা আইন বলিতে পারি। কারণ, ইহার একটি অনুমোদন আছে এবং তাহা হইতেছে একটি শক্তিশালী জনমত। আন্ত-র্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে একটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হইতে হয় এবং এইজন্য ইহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে,— আন্তর্জাতিক আইন পালনের ইহাই বাধ্যবাধকতা।

সংক্ষিপ্তসার

১। **আইনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অনুমোদন**—আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাটিই বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়। উড্রো উইলসন আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়। আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন রূপ (generality) এবং অপরটি হইতেছে ইহা পালন করার বাধ্যবাধকতা (compulsion)।

আইন কেন পালন করা হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও বর্তমানের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। এই সম্মতির ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। রাষ্ট্রীয় আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে এবং তাহা প্রমাণিত হইবে তখনই, যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের আশা ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিবে।

২। **আইনের উৎস ও বিভিন্ন ধরনের আইন**—রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হইতেছে সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়বিচার, আইনবিদগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইনসভা এবং সমাজের সাধারণ সম্মতি। আমরা ব্যক্তিগত আইন, সরকারী আইন, সাধারণ আইন, পৌর আইন শাসন-সংক্রান্ত আইন, ফৌজদারী আইন, আইনসভা-প্রণীত আইন এবং অর্ডিন্যান্স, প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের আইন দেখিতে পাই। অনেক সময় কোন কোন দেশের প্রথাগত বিধান (conventions) যেমন, ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধান, আইনের মর্যাদা লাভ করে। আবার কতিপয় আইন আছে যেগুলিকে আমরা নৈতিক আইন বলিতে পারি; এই নৈতিক আইন বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সুসভ্য রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বজায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলের সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেও আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হইতেছে ছয়টি; যথা—(১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতীয় মহাসভা, (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান।

৩। **আইন ও নীতিশাস্ত্র**—আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল এই যে আইন মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন আইন অমান্য করিলে নীতি বিগর্হিত কাজ হয় না; আবার কোন কোন নৈতিক আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্রীয় আইন-বিরোধী কাজ হয় না। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি অনুষ্ঠিত হইলে আইন ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের দিক হইতেই ইহা অপরাধ। রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে ভাল আইনের সৃষ্টি করা এবং খারাপ আইনগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া।

৪। **আন্তর্জাতিক আইন**—আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সঙ্গত এবং বিচারসম্মত কতিপয়পালনীয় নিয়ম; এই নিয়মগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনজাতিই এককভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে, এবং এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে নিয়মগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, সেই নিয়মগুলিকেই আমরা বলি আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনগুলি পালন করিতে কোন জাতিই আইনতঃ বাধ্য নয়; একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে ততক্ষণ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্য। কিন্তু, বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনকে অস্বীকার করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন (sanction) হইতেছে বিশ্বের জনমত। তাছাড়া, নিজের নিরাপত্তার জন্যই যে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হইতেছে, (১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী, (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা (Conventions) (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান।

Exercise

1. Define Law. Discuss the nature and sanction of Law.
[আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইনের স্বরূপ ও অনুমোদন আলোচনা কর।]
(১০৯-১১০ ; ১১৯-১২৬ পৃষ্ঠা)

2. "Law is the expression of the general will of the community." Discuss the statement.
["আইন হইতেছে সমাজের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ।"—উক্তিটি আলোচনা কর।]
(১২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the sources of Law. What are the different types of Law?
[আইনের উৎস আলোচনা কর। বিভিন্ন ধরনের আইন কি কি?]
(১১০-১১৩ পৃষ্ঠা ; ১১৪-১৯ পৃষ্ঠা)

4. What do you mean by International Law? Is International Law, properly speaking, Law?
[আন্তর্জাতিক আইন বলিতে তুমি কি বুঝ? আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃতপক্ষে আইন?]
(১৩১-৩৫ পৃষ্ঠা)

5. "International Law is the vanishing point of jurisprudence." Examine the statement.
["আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক শাস্ত্রের লোপবিন্দু"—উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (১৩১-৩৫ পৃষ্ঠা)

6. "International Law is only valid for a given State to the degree that it is prepared to accept its substonce".

"The world has become so interdependent that an unfettered will in any State is fatal to the peace of other states." How far do you agree with these two views ?

["একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র ইহার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।"

"বর্তমান পৃথিবী এতটা পরস্পর নির্ভরশীল হইযাছে যে কোন রাষ্ট্রের একটি অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অপর রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে মারাত্মক হইয়া থাকে।" এই দুইটি উক্তির সঙ্গে তুমি কতটা একমত ?]
(১৩১-১৩৫ পৃষ্ঠা)

7. Do you support the view that international law is obeyed by courtesy, concession and grace" ? Give reasons for your answer.

[আন্তর্জাতিক আইন ভদ্রতা, দাক্ষিণ্য এবং দয়া, দ্বারা পালিত হয়, তুমি কি এই যুক্তি সমর্থন কর ?] (১৩১-৩৫ পৃষ্ঠা)

8. Examine lhe grounds of political obligation.

[রাষ্ট্রনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিগুলি পরীক্ষা কর।] (১২২-২৫ পৃষ্ঠা ; ১৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

9. Indicate the distinction between Law and Morality. Point out the relation between the two (C. U. B. A. 1966)

[আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।]
(১২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

10. "The safety of the State is its first law and to realise this end. it must be above morality". Discuss.

[রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হইতেছে ইহার প্রথম আইন এবং এজন্য ইহা অবশ্যই নীতিশাস্ত্রের উচ্চে থাকিবে।] (১২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

11. Why is Law obeyed ?

[আইন কেন পালন করা হয় ?] (১২১-১২৬ পৃষ্ঠা ; ১৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the nature of 'Law' and point out its various sources with their relative importance. (C. U. B. A. 1966)

[আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং ইহার বিভিন্ন উৎসগুলি ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখাও।]
(১০৯-১১০ পৃষ্ঠা ; ১১০-১১৪ পৃষ্ঠা)

13. "Ideally, Law ought to have both validity and value."—Discuss the statement.

["আদর্শের দিক হইতে আইনের বৈধতা ও মূল্য উভয়ই থাকা উচিত।"—উক্তিটি আলোচনা কর।] (১২০-১২১ পৃষ্ঠা)

14. Give an account of the views of the various schools of Jurisprudence.

[আইন শাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদের একটি বিবরণী দাও।] (১১২-১১৬ পৃষ্ঠা)

15. Discuss the implications of the various concepts of Law.

[আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বের তাৎপর্য আলোচনা কর।] (১১২-১৬ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী
(Right, Liberty Equality and Fraternity)

["আইন" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা রাষ্ট্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। প্রশ্নটি হইতেছে, কেন আইন পালন করা হয়? অথবা আইনের অনুমোদন কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছি, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা চারিটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের উপাদান খুঁজিয়া পাই। আদর্শগুলি হইতেছে অধিকার (Right), স্বাধীনতা (Liberty), সাম্য (Equality), এবং মৈত্রী (Fraternity)। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই চারিটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (Political ideals) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই চারিটি আদর্শ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।]

অধিকারের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ (Definition and nature of Right) ঃ সাধারণ অর্থে "অধিকার" কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপয় কাজ করা অথবা না করার নাম স্বাধীনতা। অধিকার জিনিসটি নিছক দৈহিক ভিত্তি হইতে অথবা একটি সামাজিক মূল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা ' অধিকার" জিনিসটিকে মানুষের সামাজিক চরিত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি। স্বাভাবিক অধিকার সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সব মানুষের থাকে না। যাহারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ, তাহারাই অধিকার ভোগ করে। বর্তমানে সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রই আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং আইনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মানুষের কতিপয় দাবী। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। সেইজন্য সর্বাধিক ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রত্যেকে ব্যক্তিকে কতিপয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করার দরকার হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে 'অধিকার' হইতেছে সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় শর্ত যেগুলি ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে না।[১] রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণের কতিপয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং সামাজিক জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের

"অধিকার' কথাটির অর্থ

১। "Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his heart."

—Laski : Grammar of Politics P. 91

বিভিন্ন অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইবার জন্য রাষ্ট্র যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিবে। তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজকল্যাণ হয়। গ্রীণের মতে "অধিকার" হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং দাবী করা হয়।[১] অধিকার বলিতে সামাজিক জীবনের এমন কতকগুলি সুবিধা বুঝায় যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করে এবং সমাজও অনুরূপ স্বীকার করে। এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের জন্য চাই একটি সুসংহত সামাজিক জীবন। তাহা ছাড়া, এই অধিকারগুলি যাহাতে অপব্যবহার না হয়, অর্থাৎ অধিকারগুলি যেন জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত না করে সেইজন্য কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে। অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন কর্তৃক স্বীকৃত এবং কার্যকর হয় এবং হওয়া উচিত। কেননা, প্রত্যেকটি আইনের যেমন একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি অধিকারেরও সেইরকম একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে। হবহাউস (Hobhouse) মনে করেন, প্রকৃত অধিকার হইতেছে সামাজিক কল্যাণের কতিপয় শর্ত, এবং বিভিন্ন অধিকারের বৈধতা নির্ভর করে ইহারা কতটা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজ করে তাহার উপর।[২]

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করাই অধিকারের কাজ

"অধিকার" সর্বদাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে কোন সুযোগ-সুবিধা আইনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যদি ইহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক হয়। অধিকার কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে "অধিকার" সমাজের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে সহায়ক হওয়া চাই। যদি "অধিকার" মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক হওয়া এবং আইনানুমোদিত হওয়া এই দুইটি শর্তের মধ্যে একটি পূরণ করে এবং অপরটি পূরণ না করে, তবে বার্কার সেই অধিকারকে পূর্ণ অধিকার না বলিয়া আধা-অধিকার (Quasi-Right) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আদর্শ রাষ্ট্র সকল অধিকারকেই স্বীকার করিয়া সংরক্ষণের

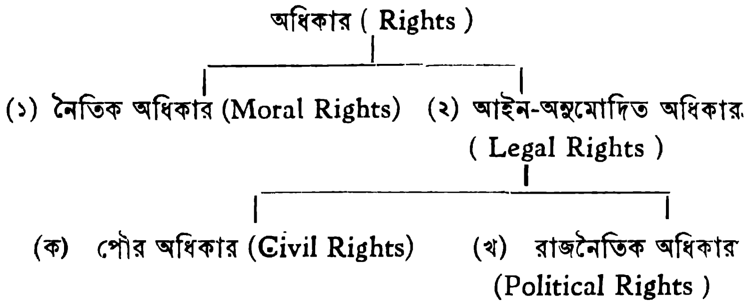
১। "Right is a power claimed and recognised as contributory to common good."—Green

২। "Genuine rights are conditions of social welfare and the various rights owe their validity to the functions they perform in the harmonious development of society.

—Hobhouse : *Social Evolution and Political Theory.*

ব্যবস্থা করিয়া থাকে। 'অধিকার' ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নহে,—অধিকার হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের সুযোগ।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights) :



আইন-অনুমোদিত অধিকারগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।[১] পৌরজীবনে মানুষের এমন কতিপয় সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার যেগুলি ব্যতীত তাহার পক্ষে একটি সুন্দর পৌরজীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় না। নিজের ভাবধারা প্রকাশ করিবার এবং স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার, সংগঠন করিবার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের কতিপয় প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার (Civil Rights)। রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) বলিতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা যেগুলির সাহায্যে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে। লাস্কি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতেছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যে কোন সাধারণ নাগরিকের সমুদয় ক্ষমতার উৎসক্ষেত্রে যাইবার প্রত্যক্ষ সুযোগ আছে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবারও একটি অধিকার আছে।[২] ভোটপ্রদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকারের সহিত কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও (Economic Rights) জড়িত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা দেখিতে পাই অর্থনৈতিক সাম্যের (Economic Equalities) ব্যবস্থা। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সর্বতোভাবে নিজোন্নয়নের চেষ্টা করার সম্পত্তি ভোগ করিবার

১। "নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য" শীর্ষক আলোচনায় বিস্তৃতভাবে এই অধিকারগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

২। "A democratic system is one in which the will of the average citizen has channels of direct access to the sources of authority. There is, therefore, a right to political power".

Laski—Grammar of Politics. P. 115

এবং ব্যবহার করিবার অধিকার এই জাতীয় কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকার উপভোগ করে।

নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights) : অধিকারগুলিকে আমরা প্রথমতঃ, নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনসঙ্গত অধিকার (Legal Rights), এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয় না। জিনসবার্গ (Morris Ginsburg) বলেন, ব্যক্তি বা সমষ্টির কোন বিশেষ ক্ষমতা বা সুযোগের জন্য ন্যায়সঙ্গত দাবীকেই অধিকার বলা চলে। কিন্তু এই অধিকারের নৈতিক যৌক্তিকতা হইতেছে এই যে ইহা জনসাধারণের কল্যাণের একটি অপরিহার্য অংশ অথবা একটি উপায় স্বরূপ।[১] নৈতিক অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির কোন সমর্থন থাকে না বটে, কিন্তু ইহা সমাজের বিবেকের দ্বারা সমর্থিত। নৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে ইহার কোন শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের(constitutional remedies) ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু ইহা একটি নৈতিক দাবী, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ভিন্ন ইহা কখনই অধিকারের পূর্ণতা লাভ করে না। অথচ এই অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সমর্থন না থাকার দরুণ আমরা ইহাকে পরিপূর্ণভাবে "অধিকার" হিসাবে গণ্য না করিয়া আধা-"অধিকার" (Quasi-Right) হিসাবে গণ্য করিতে পারি। আইনসঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্রে এই সমস্যার সৃষ্টি হয় না: কারণ, আইনসঙ্গত অধিকারের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রযুক্তি। নৈতিক অধিকার সকল সময় আইনসংগত অধিকার পরিণত হইতে পারে না।

আইনগত অধিকারের কার্যকারিতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উপর ভিত্তিশীল

আইনসঙ্গত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয়। একজন লোক যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে সে সত্য কথা বলার নৈতিক অধিকারের অপচয় করিল,—রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু একজন নাগরিক যদি অপর কোন নাগরিকের নামে সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আইনসঙ্গত অধিকারভঙ্গকারী হিসাবে শাস্তি-প্রদান করিতে পারে। আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে আমরা পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Right) এই

১। "A right may be defined as a claim that is or can be justly made by or on behalf of an individual or group to some condition or power. The moral justification of the claim is that the condition or power is an element of well being or a means to it." —Morris Ginsburg.

দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে নাগরিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের নিম্নলিখিত পৌর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights): প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকগণ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মতে মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি সমাজসৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ উপভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ মনে করিতেন যে সমাজ সৃষ্টির পূর্বে ছিল প্রকৃতির রাজত্ব। তখন মানুষ সকল ব্যাপারেই অবাধ স্বাধীনতা লাভ করিত। হব্‌সের মতে মানুষের নিজের ইচ্ছাকে অপরের প্রতি প্রয়োগ করিবার একটি স্বাভাবিক অধিকার আছে। লকের মতে সমাজ গঠিত হইবার পরেও মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি লোপ পায় নাই। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির রাজত্বে বিরাজ করিত। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি স্বীকার করিল কিনা তাহার উপর এই অধিকারগুলি নির্ভর করে না। হব্‌স্, লক এবং রুশোর মতে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি প্রাক্ রাষ্ট্র যুগে বিরাজ করিত। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকদের মতে প্রকৃতির রাজত্বে স্বাভাবিক অধিকার প্রচলিত ছিল

কিন্তু বেন্থাম (Bentham) মনে করেন, মানুষের অধিকারগুলি সৃষ্ট হইয়াছে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের পর। তাঁহার মতে অধিকারের সৃষ্টি হইতে পারে তখনই যখন রাষ্ট্র নিজের শক্তির সাহায্যে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি রক্ষা করিতে এবং কার্যকর করিতে পারে। এক কথায়, বেন্থাম এবং তাঁহার সমর্থকগণের মতে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ("Rights are the creation of the State")। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের অধিকার সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বেন্থামের মতে কোনও কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে যে কোন অধিকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে নিজের কল্যাণ এবং সুখের জন্য চেষ্টা করা যে কোন মানুষেরই একটি মৌলিক এবং স্বাভাবিক অধিকার, বেন্থাম এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সারের (Herbert Spencer) মতে প্রধান মৌলিক ও স্বাভাবিক অধিকার হইতেছে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার। ভল্টেয়ারের মতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ এবং আইনের সমান সুযোগ লাভ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। রুশোর মতে স্বাভাবিক অধিকার সাধারণের ইচ্ছার অঙ্গীভূত। সাধারণ ইচ্ছাই

বেন্থামের মতে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার সৃষ্ট

মানুষের জীবন স্বাধীনতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংরক্ষক। স্বাভাবিক অধিকার এই সাধারণের ইচ্ছাকে কার্যকর করিবার অধিকার। গ্রীণের (Green) মতে স্বাভাবিক অধিকার মানুষের এবং সমাজের আদিম প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে,—মানুষ ভবিষ্যতে কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি কিভাবে বিকাশলাভ হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব আলোচনা করা উচিত। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন বাক্-স্বাধীনতা, সংঘ প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায় মজুরী লাভ করা. প্রকৃত শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, উপযুক্ত চাকুরি এবং কোন সামাজিক প্রচেষ্টায় একত্রিত হওয়া নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকার। লাস্কি বলেন, "এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার এজন্য যে এগুলি ছাড়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে।[১] এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ফরাসী বিপ্লব বহুল পরিমাণে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার, অথবা সব অধিকারই যেন মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিক অধিকারের পক্ষেই কতিপয় যুক্তি। আধুনিক কালের সমাজ বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গিডিংসের (Giddings) মতে স্বাভাবিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় অধিকার যেগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকার।[২] শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের আইনানুমোদিত অধিকারগুলিকেও স্থায়িত্ব লাভের জন্য এই নাগরিকদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। সুতরাং এই অধিকারগুলিকে আমরা চিরন্তন অধিকার বলিতে পারি না। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা চলে।

স্বাভাবিক অধিকারের আধুনিক ব্যাখ্যা

সমালোচনা : 'স্বাভাবিক অধিকার' তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, "স্বাভাবিক" এই শব্দটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য কাৎপর্য নাই। বিভিন্ন লেখক প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, "স্বাভাবিক শব্দটির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার অবর্তমানে মানুষের কোন্ অধিকারগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে পারি তাহাও স্পষ্ট নহে। ইহা সত্য যে মানুষের কতিপয় জন্মগত 'অধিকার

১। "These are natural rights in the sense that without them the purpose of of the state cannot be fulfilled." —Laski

২। Natural rights are "socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations." —Giddings.

থাকে, কিন্তু সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত ক্ষমতারূপে মনে করা উচিত। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এই সহজাত ক্ষমতাগুলি অধিকারে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের পূর্বে যখন "প্রকৃতির রাজ্য" ছিল, তখন যুক্তি-বিজ্ঞানের দিক হইতে অধিকারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে। সমাজবিহীন এবং রাষ্ট্রবিহীন "প্রকৃতির রাজ্যে" অধিকারের মর্ম কেহই বুঝিতে পারে না। যখন

স্বাভাবিক অধিকারের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নাই

মানুষের অবাধ স্বাধীনতা কতিপয় নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং সকলের স্বার্থ ও সকলেরই উপকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই সেই অবাধ স্বাধীনতা অধিকারে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া মানুষের অধিকার থাকা অযৌক্তিক; কেননা, রাষ্ট্রই মানুষকে অধিকার দান করে। সমাজ-জীবনে শৃংখলা থাকে এবং এখানে মানুষ নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে পারে না। প্রত্যেকেই যদি নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে থাকে, তবে মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং অধিকারের কোন সার্থকতা থাকে না। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকারেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে না, অথচ যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ এই অধিকারগুলি ভোগ করে তাহা সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের হাতে। এই অধিকারগুলিকে আমরা তখনই স্বাভাবিক অধিকার বলিতে পারি যখন ইহা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। এই অধিকারগুলির সহিত রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গতি থাকা চাই। অধ্যাপক গ্রীণের মতে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণকে এই অধিকারগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করা।

স্বাভাবিক অধিকারের অজুহাতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া উচিত নহে

স্বাভাবিক অধিকার কখনই চিরন্তন অথবা অবাধ নহে। সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের পরিবর্তন হয় অধিকার কখনই সহজাত এবং শাশ্বত নহে। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এই রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারেরও পরিবর্তন হয়। অধিকার এবং কর্তব্য সামাজিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে। সুতরাং সামাজিক জীবন সৃষ্ট হইবার পূর্বে কিংবা প্রকৃতির রাজত্বে স্বাভাবিক অধিকারের সৃষ্টি হয় নাই।[১]

অধিকার সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক ইহা কখনই চিরন্তন অথবা অবাধ নহে

স্বাভাবিক অধিকার কোন অবস্থারই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিংবা অন্য কোন

১। "Rights and duties define social relations. Thus there are no natural rights in the sense of pre-social rights of man in a state of nature."

—Morris Ginsburg : *On Justice in Society.*

উর্দ্ধতন কর্তৃত্বের দ্বারা সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত করিতে চাহে, তবে রাষ্ট্রকে সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিতে হয়। বাক্ স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখিতে গেলে অবাঞ্ছনীয় কথার উপর নিরাপত্তামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হয়। সুতরাং যে অর্থে 'স্বাভাবিক অধিকার কথাটি ব্যবহার করা হয় তাহা সংরক্ষিত রাখিতে গেলে কিছু না কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবেই। সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক সব অধিকার স্বাভাবিক অধিকার। যে অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং সামাজিক কল্যাণের অনুকূল, সেই অধিকারই স্বাভাবিক অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকার কখনই সংরক্ষিত হইতে পারে না

স্বাধীনতা এবং ইহার অর্থ (Meaning of Liberty) : স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় প্রাচীনকালে এথেন্স নগরীতে। এই স্বাধীনতাকে বার্নস (Burns) এথেন্সের তৎকালীন স্বাধীনতা (Athenian Liberty) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এথেন্সের অধিবাসীগণ স্বাধীনতা বলিতে সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দ্বিবিধ ধারণা পোষণ করিতেন। এথেনীয় স্বাধীনতা প্রাচীনকালে এথেন্সের সংস্কৃতিকে খুবই উন্নত করিয়াছিল। বার্নস বলেন, "Athenian Liberty was productive." কিন্তু, যুগের পরিবর্তনের সহিত এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে।

এথেন্সের স্বাধীনতা

'স্বাধীনতা' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। ইংরাজী শব্দ "Liberty" আসিয়াছে ল্যাটিন "liber" শব্দ হইতে। এই কথার অর্থ হইতেছে, অবাধ স্বাধীনতা। এই অর্থ হইতে বিচার করিলে "আইন" অথবা "নিয়ন্ত্রণ" এবং "স্বাধীনতা" আপাতবিরোধী ধারণা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু, 'স্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতাই নহে। সাধারণ অর্থে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার অভাব (absence of restraints)। কিন্তু, জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা কখনও উচ্ছৃংখলতায় পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে ব্যক্তিগত সুখের জন্য অত্যাবশ্যক যে সকল সামাজিক শর্ত সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। এই সামাজিক শর্ত হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইলে ব্যক্তিগত সুখ কাহারও ক্ষুণ্ণ হয় না। তখনই ইহাকে অধ্যাপক লাস্কির

মতে আমরা 'স্বাধীনতা' আখ্যা দিতে পারি।[১] কিন্তু, শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য নয়। স্বাধীনতার আর একটি দিক্ আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথবা উপভোগ করার যোগ্য। মানুষের জীবন যাহাতে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার "*Essay on Liberty*" বইয়ে স্বাধীনতাকে বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণের অভাব বলিয়া কল্পনা না করিয়া এই ধারণা প্রচার করেন যে স্বাধীনতা হইতেছে মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ বিভিন্নমুখী এবং অব্যাহত প্রকাশ।

স্বাধীনতার অর্থ

গ্রীণ বলেন, তাহাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের জীবনকে সুন্দর করিবার জন্য এবং নিজের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, করা উচিত অথবা উপভোগ করা উচিত এরকম কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।[২] অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে।

নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত নহে

কিন্তু, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানুষ যাহাতে সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেইজন্য একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রণী শক্তি হইতেছে আইন। আইন এইক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে,—ইহা মানুষের উপর এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ("Law means removal of natural restrictions and not addition of more.") একজনের সহায়তায় যাহাতে অপরের হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান থাকা দরকার। তাহা হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক (Liberty as related to Law or Authority): প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া চলিলেই

১। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "I mean by liberty the absence of restraint upon the existence of those social conditions which in modern civilisation are the necessary guarantees of freedon."

—Laski : Grammar of Politics P. 142

২। "Freedom consists in a positive power or capacity of doing or enjoying something worth-doing or worth-enjoying."

—Green

জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। আইনের সাহায্যেই রাষ্ট্র স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

প্রত্যেকের স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত স্বাধীনতাকে আমরা আইন-অনুমোদিত স্বাধীনতা (legal liberty) বলিতে পারি। আইনানুমোদিত স্বাধীনতা আইন কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়াই কখনও অব্যাহত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না।[১] প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ।[২] আইনের দ্বারা যদি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত হয় না। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড়। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্র তখন আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম করে।

শাসনতান্ত্রিক আইনে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়, রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই ; প্রথমতঃ, যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্য কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত হয়, তবে রাষ্ট্রীয় আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে।

রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক

দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায় কর্তৃক যদি নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত অথবা ব্যাহত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া অথবা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়া নাগরিকদিগকে নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে এইপ্রকার পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,—একে অন্যের পরিপূরক। আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত ("Law is the

---

১। "......Legal liberty, just because it is legal, is not an absolute or unconditional liberty." —Barker

২। "The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all......" —Barker

condition of Liberty.")। জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে। নাগরিকদের বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থেই সমাজে দরকারবোধে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইতেই এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আমার যদি অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকে, তবে আমার উপর এই নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত যে স্থান বিশেষে আমি বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারিব না। এই নিয়ন্ত্রণটুকু যদি আমার উপর না থাকে, তবে অপরের উপরেও থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে আমার নিজের স্বাধীনতাই বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দিবে। এই-জন্যই বেন এবং পিটারস (Benn and Peters) বলিয়াছেন, "It is the paradox of freedom that we must set a constraint to catch a constraint."[১] জীবনধারণের জন্য মানুষের কতিপয় অত্যাবশ্যক চাহিদা আছে, যেমন শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এই সকল চাহিদা মিটিলেই নাগরিকগণ প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। আইন মানুষের এই অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি করে উহার উৎকর্ষের উপর।[২] যতক্ষণ পর্যন্ত আইন জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যতক্ষণ ইহা জনসাধারণের সব অত্যাবশ্যক চাহিদা-গুলি মিটাইতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যন্তই জনগণ আইন মানিয়া চলে। সুতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা স্বাধীনতার পরিপূরক পরিপন্থী নহে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন, যেমন "হেবিয়াস কর্পাস আইন," (Habeas Corpus Act), "অধিকারের বিধি" (Bill of Rights), প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় আইন যে কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না, তাহা নহে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন ঘোষণা করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে গণ-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, সতর্ক জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে ("Eternal vigilance is the price of Liberty."—Laski)। যতক্ষণ পর্যন্ত জনমত সতর্ক এবং সদা-সচেতন থাকে, ততক্ষণ রাষ্ট্রীয়

ক্ষেত্রবিশেষে স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যই প্রয়োজন

১। Benn and Peters,—"Social Principles and the Democratic State." P. 213.

২। "Sovereignty is a function of the quality of the life that it makes for its members." —Laski

আইন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝায় না। কিন্তু একে অন্যের পরিপূরক। অনেকক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, আবার আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারক ও বাহক হইতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different types of Liberty): স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের প্রথমেই আইনসঙ্গত স্বাধীনতার (Legal Liberty) স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পৌর স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হইতেছে আইনসঙ্গত স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ। ইহা ছাড়া, আমরা দেখিতে পাই স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা। নিম্নে বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচিত হইল।

স্বাভাবিক স্বাধীনতা ((Natural Liberty): কোন কোন ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মক্ষমতা আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রয়োগ করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণের মতে প্রকৃতির রাজত্বের মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনতা' মানুষ উপভোগ করিত, তাহাই হইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রণীশক্তি ছিল না, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীনতা সবলের স্বেচ্ছাচারিতা অথবা উচ্ছৃংখলতা ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক স্বাধীনতার সমর্থকগণ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে আইনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যে স্বাধীনতা জনসাধারণ উপভোগ করে, তাহা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরস্পর বিরোধী আকাংখা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পর বিরোধী আচরণে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা করা সম্ভবপর নহে।

স্বাভাবিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমস্যা

পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty): পৌর স্বাধীনতা বলিতে সামাজিক জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (individual liberty) বুঝায়। শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নহে, পৌর স্বাধীনতা বলিতে আমরা সামাজিক স্বাধীনতাও (social liberty) বুঝি; কারণ জনসাধারণ সমাজ-জীবনেই এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। পৌর জীবনে মানুষের কতিপয় অধিকার

একান্ত অপরিহার্য। নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য নাগরিকদের এই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, সংবিধানের মধ্যেই এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়া সভ্য সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং চিন্তা করিবার অধিকার ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের সমষ্টিকেই আমরা পৌর-স্বাধীনতা বলি। রাষ্ট্র অযথা জনসাধারণের পৌর-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যদি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পৌর স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। জনসাধারণ নিজেরা হয়ত নিজেদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে জানে না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নহে। বিশেষতঃ, বাক্ স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারে। পৌর স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক আছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণী-শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই নিয়ন্ত্রণী-শক্তি হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইন। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা প্রদান করিবার এই অর্থ নয় যে একজন অপরলোকের বিরুদ্ধে যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারে, অথবা, কাহাকেও চলাফেরার স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে কাহারও বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পৌর স্বাধীনতা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক, ততক্ষণ পর্যন্তই ইহা রাষ্ট্র জনসাধারণকে প্রদান করিবে। আবার, পৌর-স্বাধীনতা যাহাতে প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্যও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের আবশ্যক।

ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বরূপ

রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty): গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার-সমষ্টিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করা বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের উপরেই গণতান্ত্রিক

রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ ও ইহার গুরুত্ব

সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এবং যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার এবং ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং তাহাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক, তাহাই নহে—উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরও অনেক উন্নত হয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty): অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprises) পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। অ্যাডাম স্মিথ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের মধ্যে সকলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেখা যায়

পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নাগরিকদিগকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেইপ্রকার নাগরিকগণকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে সমাজতন্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চলিয়া আসে এবং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রদান করার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সাম্যের (economic equality) প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সবলের হাতে দুর্বলের শোষণ ঘটাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থনৈতিক শোষণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের উচিত যাহাতে এই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইবার অধিকার, বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলে।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty): জাতীয় স্বাধীনতা হইতেছে অন্যান্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে একটি জাতির সাধারণ স্বাধীনতা বা সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বুঝায়। জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির বা দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন অসম্ভব। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতীর পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। সমষ্টিগত স্বাধীনতা হইতেছে একটি দেশের অথবা জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতির ভিত্তি।[১] জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে সেই স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব দিক হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষতঃ, সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কি পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে? (Is Intra-liberty quarrel possible?):

বার্কার বলিয়াছেন, স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সংঘাত না থাকিলেও স্বাধীনতা ইহার নিজের সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে।[২] পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেই সাধারণতঃ এই সংঘাত দেখা যায়। স্বাধীনতা এমন একটি জটিল ধারণা যে ইহা মানুষকে স্বাধীনতার প্রতি অনুগত থাকিবার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে আবার বিভিন্ন রূপের প্রতি আনুগত্যের জন্য পরস্পর হইতে পৃথকও করে।[৩]

প্রথমতঃ ব্যক্তি স্বাধীনতার সহিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংঘর্ষ দেখা যাইতে পারে। পৌর স্বাধীনতা অনুযায়ী একজন লোক হয়ত কোন কিছু কাজ করার বা স্বাধীনভাবে স্পষ্ট উক্তি করার অধিকারী, কিন্তু মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহারের নামে খর্ব করিতে পারে। ধরা যাক যে কোন নাগরিকেরই সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার অধিকার আছে।

১। "Liberty of the group is regarded as the basis for all natural development development of the country or the race." —Burns : Political Ideals

২। "If liberty and law do not quarrel, liberty may quarrel with itself."

৩। "Liberty is indeed a complex notion, which at once unites 'men in its alle giance and divides them by its division."

—Barker : Principles of Social and Political Theories.

কিন্তু এই স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ত এমন একটি আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহাতে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়। কোন নাগরিক হয়ত সরকারের রাজনৈতিক নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া কোন পুস্তিকা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সরকার হয়ত রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না এই অজুহাতে অথবা জাতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে সেই পুস্তিকায় প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতার একটি রূপের সহিত অপর একটি রূপের সংঘর্ষ দেখা যায়। কোন শ্রমিক হয়ত রাজনীতিতে যোগদান করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল হয়ত আইনসভায় এমন আইন প্রণয়ন করিতে পারে যে কতিপয় কারখানার (যেমন, জনস্বার্থের সহিত জড়িত কারখানার) শ্রমিকগণ নিজেদের ট্রেড ইউনিয়কে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কর্মক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না ; কারণ ইহাতে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে স্বাধীনতার একটি রূপ অপর একটি রূপের পরিপন্থী হইতে পারে।

স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Different safeguards of Liberty) : নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয় সেইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়।

প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রের মূলকথা হইতেছে জনগণেরই নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। পৌরস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কখনও তারতম্য হয় না। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুন্ন করিতে পারে না ; বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। একনায়কতন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু সেই আইন জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। জোর জবরদস্তি করিয়া সেক্ষেত্রে জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি থাকে বলিয়া এবং নিজেদেরই প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত আইন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়। এজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলেন চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য এবং যাহারা এই

সচেতন জনমত

সতর্কতা বজায় রাখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাই স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়া থাকেন।[১] স্বাধীনতা সংরক্ষণে সচেতন জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "It is the proud spirit of citizens…that is their most real safeguard."

স্বাধীনতার পরিপন্থী যাহা কিছু দেখা যাইবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাহসই হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য।[২] জনমত যখন স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। তাহা না হইলেই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করে এবং সেক্ষেত্রে জনমতের শক্তির কাছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার মানিতে হয়। যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সমর্থ হয় এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন রাষ্ট্রীয় আইনই জনগণের স্বাধীনতার শর্ত হইয়া পড়ে। তাহা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রিসভার অথবা পরিচালকমণ্ডলীর (Executive) শাসন। আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। পার্লামেন্টে যদি বিরোধীদল খুব শক্তিশালী হয় তবে ক্ষমতায় আসীন দল এমন কিছু করিতে সাহস পাইবে না যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে তাহা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশ শাসন-কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু, ইংলণ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই মহান এবং বিনা বিচারে কাহারও শাস্তি হইতে পারে না।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

১। "Eternal vigilance is the price of liberty and those who are trained to that vigilance become conscious guardians of liberty." —Laski.

২। "The secret of liberty is always in the courage to resist."

তৃতীয়তঃ ক্ষমতার বিভাগ (Separation of Powers) করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে। মণ্টেস্কু বলিয়াছিলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য এমনভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা উচিত যেন ক্ষমতাই ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।[১] সরকারের আইন প্রণয়ন পরিচালন এবং বিচার-বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষমতা বিভাগ করার পক্ষে বলা হয় যে পরিচালন বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে যদি ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া না হয় তবে শাসনকর্তৃপক্ষ অত্যাচারী হইতে পারেন; যেমন শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি কাহাকেও আইন ও শৃংখলা ভঙ্গ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার করেন এবং নিজের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে প্রকৃত দোষী না হওয়া সত্ত্বেও তাহার শাস্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। এ ক্ষেত্রে সে প্রকৃতই দোষী কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাকা উচিত বিচার-বিভাগের। তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ করা হয় নাই; অথচ ইংলণ্ডের নাগরিকগণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। তবে ইহা ঠিক যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তত প্রয়োজন নাই যত প্রয়োজন আছে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার। বিচার-বিভাগ যদি স্বাধীন থাকে এবং পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত না হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। ইংলণ্ডে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নাই, সরকারের ক্ষমতারও স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। কিন্তু সেই দেশে আইনের অনুশাসন (Rule of law) অথবা আইনের নিরপেক্ষতা আছে। আইনের নিয়মের তিনটি তাৎপর্য আছে; যথা—(১) আইনের সর্বোচ্চ সার্বজনীন ক্ষমতা থাকিবে, (২) আইনের চোখে সকলেই সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী হইবে না অথবা কাহাকেও গ্রাহ্য করিবে না।

ক্ষমতার বিভাগ

আইনের অনুশাসন (Rule of Law)

সুতরাং আইনের অনুশাসন (Rule of Law) হইতেছে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।[২]

১। "To prevent the abuse of power, it is necessary, by a proper disposition of things, that power should be a check to power." ফাইনারের (Finer) "The Theory and Practice of Modern Government" বইয়ে উদ্ধৃত

২। ম্যাক আইভার বলেন, "The operation of the rule of law enables us to interpret government as an organ of society, an agent empowered to work in appointed ways, owning a derived authority and a delegated might, no longer the master of the State."

—Mac Iver ; The Modern State. P. 269.

পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী জনমত। জনসাধারণের সচেতনতাই তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবে। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং উন্নতধরণের সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যাহাতে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সেইজন্য দেশবাসীকে সতর্ক রাখা বিরোধীদলের একটি প্রধান কাজ।

শক্তিশালী জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি। সরকার যদি নাগরিকগণকে স্বাভাবিক সময়ে এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন, তবে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পালন করিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার-বিভাগ যাহাতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive Principles) মধ্যে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনও শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের দেশে বিনাবিচারে এখনও নাগরিকদের বন্দী করা যায়। সম্প্রতি ভারত প্রতিরক্ষা আইনের (Defence of India Rule) প্রয়োগ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে শাসনতন্ত্র ভারতীয় নাগরিকগণকে যত স্বাধীনতাই দিক্ না কেন, সরকার ইচ্ছা করিলে, ভারত প্রতিরক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাগরিকগণ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বাধীনতা মোটেই কম উপভোগ করে না।

ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

সাম্যের প্রকৃত অর্থ এবং সংজ্ঞা (Real meaning and definition of equality): সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান। সাম্যনীতি মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে মানুষে মানুষে শারীরিক অথবা মানসিক গঠনে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এখানে সাম্যনীতিকে আদর্শ হিসাবে করিতে হইবে। সমাজের সকলকেই সমান হইতে হইবে অথবা রাষ্ট্র সকলকেই সমান করিবে, এই অর্থে সাম্য কথাটি ব্যবহার করা যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে সমাজের প্রত্যেকের সমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই তাঁহার বংশ, পদমর্যাদা, শিক্ষা, জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সমান সুযোগ পাইবে। আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান। রাষ্ট্রও

ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া সমাজের কোন বিশেষ নাগরিকের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবে না অথবা কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া অপর একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিবে না। সকলকে সমান সুযোগ দিলে সকলেই যে সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবে তাহা নহে। সমাজের প্রত্যেকেই পূর্ণ নাগরিক হয় না। কিন্তু, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যেন কোন বাধা না থাকে সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোন তারতম্য করা হইবে না। তবে সমাজজীবনে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যদি কখনও কোন একজন বিশেষ নাগরিককে তাঁহার উপযোগী কোন কাজের ভার দেওয়া হয় এবং সেইজন্য যদি তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী তাঁহাকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়, তাহাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। কারণ, সমান সুযোগ দান করিবার পরেও যদি নাগরিকগণ সমানভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে না পারে সেইজন্য রাষ্ট্র দায়ী হইতে পারে না। সমান সুযোগ লাভ করিয়াও কেহ যদি কোনও বিশেষ কাজে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই যোগ্যতার জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। সুতরাং সাম্যের অর্থ হইতেছে, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যাহাতে সকলেরই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুন্দরতম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল বাধা, সেইগুলিও রাষ্ট্র দূর করিবে। সাম্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা রাখিয়া সমানভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। স্বাধীনতা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করে। স্বাধীনতা মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাম্যনীতি প্রবর্তিত না হইলে স্বাধীনতা প্রকৃতভাবে ভোগ করা যায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিবেই। মানসিক বৃত্তি, শারীরিক কাঠামো, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, ইত্যাদি সব দিকেই আমরা জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাই। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'সাম্য' কথাটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাজে মুষ্টিমেয় লোক কতিপয় সুবিধা বিশেষভাবে ভোগ করে, ইহাই অসাম্য। এই অসাম্যের প্রতিবাদেই সাম্যনীতির (doctrine of equality) সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা অসাম্য দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রে স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাসের মধ্যে অসাম্য ছিল, ইংলণ্ডে অভিজাতশ্রেণী এবং সাধারণ লোকের মধ্যেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ছিল। কালক্রমে সমাজে সকলেই সমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করিতে থাকিলে সাম্যনীতির প্রসার হয় এবং সমাজ হইতে শ্রেণীবৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।

সাম্য নীতির সৃষ্টি

সাম্যনীতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত মূল্য হইতে নষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যাহাতে সমানভাবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় অথচ প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে নিজের সত্তা টিকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় সেইদিকেই সাম্যনীতির মূল লক্ষ্য।'[১]

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Liberty and Equality): সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান। সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখিবার আগ্রহ যেখানে মানুষ তাঁহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সমান সুযোগ পায়।

সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে বিভিন্ন মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পাইয়া নিজেদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। একজন লোক এমন কোন বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সুবিধা পাইবে না যাহাতে অপর কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। সুতরাং সাম্য বজায় রাখিতে হইলে রাষ্ট্রকে এমন এক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করিতে হইবে যেখানে সকলের মধ্যেই সব অধিকার সমানভাবে বণ্টিত হয়। সাম্য এবং স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ধারণা। নাগরিকগণের মধ্যে বিভিন্ন অধিকার বণ্টিত হয় স্বাধীনতা এবং সাম্যনীতির ভিত্তিতে। মানুষে মানুষে অসাম্যের সৃষ্টি হইলে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। এই দিক হইতে বিচার করিলে স্বাধীনতা এবং সাম্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সাম্য অর্জিত হইলে স্বাধীনতা লাভের আশা ব্যর্থ হইবে ("…the passion of equality makes vain the hope of freedom."—Acton)। এই যুক্তিটি ঠিক নহে। স্বাধীনতা বলিতে যদি আমরা মনে করি কোন নাগরিকের যাহা খুশী তাহাই করিবার একটি অনিয়ন্ত্রিত, অদম্য ইচ্ছা, তবে সেই স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতায় রূপান্তরিত হয় এবং তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক হইতে এই প্রকার স্বাধীনতা সমর্থনযোগ্য নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের স্বাধীনতা যাহাতে অন্য কোন নাগরিকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, সেইজন্য নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উদাহরণ

সাম্য বলিতে সকলের সমান সুযোগ ও সমান অধিকার বুঝায়

১। অধ্যাপক বার্কার বলেন, "Equality, after all is a derivative value. It is derived from the supreme value of the development of personality—in each alike and equality, but each along its own different line and of its own separate motion."

—Barker: Principles of Social and Political Theory, P. 153.

স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ধনী লোকেরা যদি ইচ্ছা করেন যে তাঁহারা সরকার গঠন করিবেন, তবে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না ; কেননা, গরীব, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরও ধনীলোকদের ন্যায় সমান ভোটাধিকার আছে। ভোটের অধিকার প্রদানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সাম্যনীতি অনুসৃত হওয়ায় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী কখনও সরকার গঠন করিয়া অপর কোনও শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না অথবা ইহার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। এইভাবে সমাজে উভয়শ্রেণীরই স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হওয়ায় উভয়শ্রেণীর লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সাম্য আপাতবিরোধী ধারণা নহে। প্রকৃতপক্ষে সাম্য হইতেছে স্বাধীনতার পরিপূরক। পূর্বে স্বাধীনতা এবং সাম্যের মধ্যে সম্পর্ককে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করা হইত, কারণ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা শুধু স্বাধীনতার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করিতেন শুধু সাম্যের উপর। এইজন্য লর্ড অ্যাক্টন মনে করিতেন যে সাম্যের আদর্শ যত সম্প্রসারিত হইবে, ব্যক্তিগত জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ততবেশী সম্প্রসারিত হইবে এবং ইহাতে স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। দ্য টকুভিলও (De Tocqueville) এই প্রকার অভিমত পোষণ করিতেন। কিন্তু মনে হয়, স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাখিবার অত্যুগ্র বাসনায় তাঁহারা সাম্যের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সাম্য বলিতে সব বিষয়ে অভিন্নতা বা সমান ক্ষমতা বুঝায় না। সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে সব মানুষ নিজের উন্নতির এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং স্বাধীনতা উপভোগের সমান সুযোগ পায়। সমাজের সকলেই সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার না পাইলে স্বাধীনতা কখনই প্রকৃতভাবে ভোগ করা যায় না। আবার সমাজের সকলেরই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে সাম্যনীতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর. এইচ. টনির (R. H. Tawney) মতে যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় মানবাত্মার ব্যাপ্ত হইবার ক্ষমতা তবে ইহা যে সমাজে সাম্যনীতি অনুসৃত হয় সেই সমাজ ছাড়া অন্যত্র সচরাচর দেখা যায় না।[১]

স্বাধীনতা ও সাম্য আপাতবিরোধী ধারণা নহে

সমাজে যদি শুধু স্বাধীনতাই থাকে আর সাম্য না থাকে, তবে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের শক্তির জোরে এবং স্বাধীনতার দাবিতে দুর্বল শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে দুর্বলশ্রেণীর জনগণ

১। "If liberty means the continuous power of expansion in the human spirit, it is rarely present save in a society of equals." —(R. H. Tawney)।

নিজেদের সব স্বাধীনতা হারাইয়া এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইবে তাহা দাসত্বেরই সামিল। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিয়াছি, সব নাগরিকেরই সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবার আগে শুধু যে শ্রেণীর লোকদের ভোটাধিকার ছিল, তাহাদেরই শিক্ষা, সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি বেশী থাকিত। সরকার কর্তৃক এই প্রভেদমূলক আচরণ সামাজিক ঐক্য নষ্ট করে এবং সমাজে বিরাট একটি অংশের স্বাধীনতা খর্ব করে। আইনের চোখে যদি প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকে, তবে তাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একটি প্রধান সহায়ক। ভারতের নাগরিকগণ অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর হইত না যদি শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত। এই সাম্যবোধই নাগরিকগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্বাভাবিক অসাম্যের ঘটনা এবং স্বাভাবিক সাম্যের নীতি (Natural Inequality as a Fact and Natural Equality as a Doctrine) : মানুষের মধ্যে বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি, জনসম্পদ প্রভৃতি সর্ববিষয়েই অসাম্য বর্তমান। মানুষের মধ্যে এই অসাম্য প্রকৃতিরই দান এবং ইহাই বাস্তব। এই বাস্তব অসাম্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াও মানুষ সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাম্যনীতি অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রেই মানুষের মধ্যে সাম্যবোধের সম্প্রসারণ হওয়া এবং সাম্য বজায় থাকা উচিত। সর্ব মানুষ স্বাধীন এবং সমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। মানুষের স্বাভাবিক অসাম্যের কথা মনে রাখিয়াই সাম্যনীতির প্রচলন হইয়াছে। সাম্যনীতি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে যত প্রকার স্বাভাবিক অসাম্যই থাকুক না কেন, সব মানুষকেই এমন সুযোগ দিতে হইবে যেন সকলেই সমানভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়,—সকলেই যেন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সমান সুযোগ-সুবিধা পায়,—সমাজ হইতে যেন সর্বপ্রকার শোষণ ও অবিচার দূর হয়। সাম্যনীতির সম্প্রসারণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে যে কৃত্রিম অসাম্য দেখা যায় তাহা দূর হইবে অথবা কৃত্রিম অসাম্যের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ইহা যাহাতে কখনই সাম্যের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলিয়াছেন, "*Natural Inequality as a fact with the principles of Natural Equality as a doctrine is one of the chief problems which every Government has to solve.*"

সাম্যের বিভিন্ন রূপ (Different types of Equality) : সাম্যের বিভিন্ন রূপ আছে। যথা—পৌর সাম্য (Civil Equality), সামাজিক

সাম্য (Social Equality), রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality), অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality), আইনের সাম্য (Legal Equality), এবং স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality)। স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন রূপ আছে।

পৌর সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য

প্রথমতঃ, পৌর সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য বলিতে আমরা বুঝি পৌর-জীবনে বিভিন্ন নাগরিকগণ সমানভাবে পৌর-স্বাধীনতা ভোগ করিবে। প্রত্যেকেই সমানভাবে নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করিতে পারিবে। ধর্মে স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ করা, সম্পত্তি রক্ষা করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা প্রভৃতি সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করিবে। আইনের অনুশাসন (Rule of Law) হউক, কিংবা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের দ্বারাই হউক, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক অধিকারবলে সমতা বজায় রাখিতেই হইবে।

সামাজিক সাম্য

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীবনে যখন জন্ম, ধন, বংশ জাতি অথবা ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করা হয় না, তখন ইহাকে আমরা সামাজিক সাম্য বলি। সামাজিক জীবনে সকলেই সমান। রাষ্ট্রে যদি একদল লোককে অস্পৃশ্য হিসাবে বাস করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের সাম্য নীতি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

রাজনৈতিক সাম্য

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার. সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার, প্রয়োজনবোধে সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকার, এই রাজনৈতিক অধিকারগুলি যখন সকলেই সমানভাবে ভোগ করে, তখন ইহাকে আমরা রাজনৈতিক সাম্য বলি। অনেক সময় হয়ত উন্মাদ, দেউলিয়া, নাবালক অথবা ফৌজদারী আইনে অপরাধীগণকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করা হয়, তাহাতে রাজনৈতিক সাম্য নীতির অবমাননা হয় না। কারণ, এই ব্যতিক্রম সব দেশেই থাকে। যদি স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে অথবা জাতি হিসাবে কখনও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে তারতম্য হয়, তবে ইহাকে আমরা রাজনৈতিক সাম্যনীতির বিরোধী বলিতে পারি। যে সমস্ত দেশে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোট প্রদান করিবার অধিকারী, সেই সকল দেশের নাগরিকগণ রাজনৈতিক সাম্যের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ভারত-বাসীগণ রাজনৈতিক সাম্যের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকগণের সমান সম্পত্তি এবং সমান আয়। আয় এবং ধনের বৈষম্য দূরীভূত হইলেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই অর্থনৈতিকসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থ নৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসঙ্গে থাকিতে পারে না। কারণ, যখনই কাহারও পূর্ণ অর্থ নৈতিক অধিকার থাকিবে, তখনই সে তাহার আয় এবং ধন বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেহই একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে না এবং সকলেই যাহাতে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে আয় এবং ধন অর্জন করিতে পারে রাষ্ট্র নিজের উদ্যোগে সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থ নৈতিক সাম্য একসঙ্গে থাকিতে পারে। আবার রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর অধিকার এবং অর্থ নৈতিক অধিকারও একসঙ্গে থাকিতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ায় অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও অর্থ নৈতিক সাম্য নীতির কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় যে একেবারেই বে-সরকারী সম্পত্তি নাই তাহা নহে—তবে সব কিছুরই উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে যাহাতে অর্থনৈতিক শোষণ না হয়।

অর্থনৈতিক সাম্য

পঞ্চমতঃ, আইনগত সাম্য বলিতে আমরা বুঝি আইনের চোখে সকলেরই সমান অধিকার। সাম্যের যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ আমরা উপরে আলোচনা করিয়াছি, সেইগুলি বাস্তবে প্রকৃতভাবে কার্যকর হইলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য, ইহাই আইনগত সাম্যের মূল কথা। তবে কোন কোন দেশে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা থাকায় আইনগত সাম্য ক্ষুন্ন হয় কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইংলণ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান, কিন্তু ইংলণ্ডের সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার জন্য আলাদা আদালতের ব্যবস্থা আছে। ভারত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল, প্রভৃতি রাষ্ট্রকর্ণধার-গণের বিচার যে সাধারণ আদালতে হয় না, ইহাতে আইনগত সাম্যের আদর্শ হয়ত কিছুটা ক্ষুন্ন হয়, কিন্তু জনস্বার্থের বিবেচনায় এই ব্যবস্থায় খুব দোষের কিছু নাই।

আইনগত সাম্য

সর্বশেষে স্বাভাবিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি, মানুষ একই অবস্থায় এবং একই ইন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে সকলেই সমান। এজন্যই সাধারণতঃ বলা হয়, "সকলেই স্বাধীন এবং সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে।" (All are born free and equal.) কিন্তু, এই তত্ত্বটি

আমাদের বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, জন্মের পর হইতেই স্বাভাবিক সাম্য ক্রমশঃ স্বাভাবিক অসাম্যে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত পৌর সাম্য এবং রাজনৈতিক সাম্যের সম্পর্ক (Civil Equality and Poilitical Equality as reated to Economic Equality) : অনেকে বলেন, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর পৌর স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এই যুক্তির সমর্থনে আমরা বলিতে পারি, যদি দেশে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নাগরিক জীবনের সব অধিকার সকলের পক্ষে সমান ভাবে ভোগ করা সহজ হইবে। নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা তখনই পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভবপর যখন ইহার উপর কাহারও কোন রকমের হস্তক্ষেপ অথবা আধিপত্য থাকে না। দেশে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সম্পত্তি রক্ষা করা, চাকুরি করা, বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন করা প্রভৃতি ব্যাপারে সকলেরই সমান ক্ষমতা এবং অধিকার থাকিবে, এবং যাহাতে একজন অপরকে শোষণ না করিতে পারে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্র অবলম্বন করিবে। সুতরাং পৌর স্বাধীনতার অর্থনৈতিক দিক চিন্তা করিলে দেখা যায় ইহা অর্থনৈতিক সাম্যের উপর নির্ভরশীল।

পৌর সাম্যের সহিত অর্থনৈতিক সাম্যের সম্পর্ক

নাগরিকগণ যাহাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে সেইজন্য অর্থনৈতিক সাম্য একান্ত আবশ্যক। দেশে যদি অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে নাগরিকগণ যথেচ্ছভাবে নিজেদের আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে এবং ইহার ফলে দেশে শ্রেণী বৈষম্যজনিত সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক শোষণের সূত্রপাত হইতে পারে। তখন শ্রেণীগত স্বার্থে সকলেই সরকার গঠনের চিন্তা করে এবং গণতন্ত্রের মূল আদর্শ অচল ভুলিয়া যায়। যদি ধনীশ্রেণী সরকার গঠন করেন, তবে হয়ত গরীবের উপর অর্থনৈতিক চাপ বেশী পড়িতে পারে। তাহাতে সমাজজীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্যই রাজনৈতিক অধিকারের পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। জি ডি. এইচ কোল (Cole) বলেন, অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পড়ে।[১]

রাজনৈতিক সাম্যের সহিত অর্থনৈতিক সাম্যের গুরুত্ব সম্পর্ক

এই যুক্তিটির তাৎপর্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ এই দেশগুলির নাগরিকেরা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত

১। "Political liberty in the absence of economic equality is held to be a mere myth." —G. D. H, Cole.

হইয়াছে, অথচ সেই দেশের নাগরিকগণ পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেছে না। কারণ সেই দেশে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকায় সরকার-বিরোধী দলের কোন স্থান নাই। সরকার যদি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন এবং নাগরিকগণের যদি তাহা সমালোচনা করিবার অধিকার না থাকে, তবে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মূলকথা হইতেছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হইতেছে সুদৃঢ় জনমত। তবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা সহজ হয় যদি দেশে অর্থ-নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৈত্রী বা সৌভ্রাত্র (Fraternity) ঃ ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের যে ঘোষণা জনসাধারণকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তাহা হইতেছে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী। এই মৈত্রীভাব শুধু একটি জাতির বা সমাজের সদস্যগণকেই নহে, বিভিন্ন জাতিকেও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই মৈত্রীভাবেই সমবায়ের রূপে প্রকাশিত হয়। এই সৌভ্রাত্র সমাজজীবনকে শুধু যে শান্তিপূর্ণ করে তাহাই নহে, ইহা সমাজের অধিবাসী-গণের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সাহায্য করে। ন্যায়ের উপলব্ধির জন্য এবং গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য অধিকার স্বাধীনতা এবং সাম্যের সহিত সহযোগিতার ভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক মৈত্রী এবং সহযোগিতার ভাব সকলেরই ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পক্ষে সহায়ক। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়। পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের সমুদয় সুবিধা (benefits) সকলকেই সমবায়ের ভিত্তিতে ভোগ করিতে হয়, ইহাতেই নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

১। **স্বাধীনতার অর্থ**—স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় এমন কতিপয় নিষেধাজ্ঞার অভাব যে নিষেধাজ্ঞাগুলি আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার ভোগ করিবার পথে অন্তরায় হয়। কিন্তু, নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। স্বাধীনতার একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি থাকা দরকার, এবং তাহা হইতেছে আইন। স্বাধীনতা নানাপ্রকার হইতে পারে; যথা, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা।

২। **স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে সম্পর্ক**—প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন, যেমন, "হেবিয়াস কর্পাস আইন", "অধিকারের বিধি", প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। তাহা ছাড়া, জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাধারা রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই বলা হয়, আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত ("Law is the condition of liberty.")

৩। **স্বাধীনতার রক্ষাকবচ**—স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, সচেতন জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সর্ত হিসাবে অপরিহার্য। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য। তৃতীয়তঃ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকিলে জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে। চতুর্থতঃ সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি উপায়। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হইলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয় এবং ইহাতে জনসাধারণের স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪। **সাম্যের অর্থ এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক**—সাম্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার পথ খোলা রাখিয়া সমানভাবে সকলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। অধ্যাপক লাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটি সোপান :—ইহা হইতেছে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা যেখানে সব মানুষ সমানভাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সাম্য, অথবা সামাজিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্য পরস্পরের পরিপূরক ; কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সাম্য পরস্পর বিরোধী আদর্শ। অর্থনৈতিক সাম্য জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য থাকে না ; কিন্তু, অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় জনগণ স্বাধীনভাবে উপার্জন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে, এবং ইহাতে সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়।

Exercise

1, Discuss the nature of Rights. Distinguish between Civil and Political Rights.

[অধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।]

(১৩৯-১৪২ পৃষ্ঠা)

2, Discuss the doctrine of Natural Rights. (C. U. BA. 1970) Is there any element of truth in it ?

[স্বাভাবিক অধিকারের নীতি আলোচনা কর। ইহাতে কি কোন সত্যের উপাদান আছে।]

(১৪৩-১৪৬ পৃষ্ঠা)

3. What do you mean by Liberty ? "The liberty of an individual is not always in inverse ratio to the amount of State Legislation." Examine the statement.

[স্বাধীনতা বলিতে তুমি কি বুঝ ? "কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীত অনুপাতে থাকেনা এই উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা)

Or, Define Liberty. "Sovereignty and Liberty are not contradictory terms." Examine the Statement.

অথবা স্বাধীনতার সংজ্ঞা প্রদান কর। সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নহে।" এই উক্তিটি পরীক্ষা কর।

[**উত্তর সংকেত :**—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে স্বাধীনতা কাহাকে বলে সেই সম্বন্ধে এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পর আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।] (১৪৬-১৫০ পৃষ্ঠা)

4. *Discuss the safeguards of Liberty. Does Liberty* quarrel with itself ? Give reasons for your answer.

[স্বাধীনতার রক্ষাকবচ সম্পর্কে আলোচনা কর। স্বাধীনতা কি নিজের সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা : ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা)

5. What do you mean by Equality? What are its different types? Discuss the relation between Liberty and Equality.

[সাম্য বলিতে তুমি কি বুঝ? ইহার বিভিন্ন রূপ কি কি? স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।] (১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠা ; ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা ; ১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা)

6. "The passion of equality makes vain the hope of freedom." Lord Acton—Examine the statement.

["সাম্যের জন্য, উদগ্র কামনায় স্বাধীনতার আশা বৃথা" (লর্ড অ্যাক্টন) এই উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা)

7. Explain the concept of Liberty in Political Science. Does the restraint of law mean the curtailment of Liberty? (C. U. 1965)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। আইনের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতার সংকোচ বুঝায়।] (১৪৬-১৫০ পৃষ্ঠা)

8. Write a note on the importance of the ideal of Fraternity.

[মৈত্রীর আদর্শের উপর একটি টীকা লিখ।] (১৬৫ পৃষ্ঠা)

9. Give an account of the various types of liberty with reference to their relative importance.

[বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতা ও ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া একটি বিবরণী দাও।] (১৫০-১৫৩ পৃষ্ঠা)

10. Discuss how Natural Inequality as a fact is reconciled with Natural Equality as a doctrine.

[স্বাভাবিক অসাম্যের ঘটনা কিভাবে স্বাভাবিক অধিকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহা দেখাও।] (১৬১ পৃষ্ঠা)

11. Explain the concept of Liberty in Political Science. What are the safeguards of liberty? (C. U. B. A. 1968, 1972)

[রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতার ধারণা ব্যাখ্যা কর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কি কি?] (১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা ; ১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা)

12. How is economic equality related to Civil and Political equality?

[অর্থনৈতিক সাম্য পৌর এবং রাজনৈতিক সাম্যের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত?] (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

নাগরিকতা—নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Citizenship—Rights and Duties of a Citizen)

[এই অধ্যায়ে নাগরিক কাহাকে বলে এবং নাগরিকের সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য কোথায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর আমরা নাগরিকতা অর্জন করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও নাগরিক অধিকারের বিলোপ আলোচনা করিব। সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য, সুনাগরিকতার পথে প্রধান অন্তরায় এবং সুনাগরিকতা অর্জন করিবার বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে। নাগরিকের সঙ্গে প্রজা, স্বজাতীয় মানুষ এবং নির্বাচকদের যে পার্থক্য তাহাও আলোচনা করা হইবে। সর্বশেষে আলোচিত হইবে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার, বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার শর্ত, নাগরিকদের কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক।]

নাগরিকের সংজ্ঞা (Definition of Citizenship): নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। কিন্তু, বর্তমানে শহর-রাষ্ট্রের (city-state) অস্তিত্ব নাই বলিয়া 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু, এরিষ্টটলের মতে নাগরিককে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্যাটেলের (Vattel) মতে নাগরিক হইতেছে পৌর সমাজের কতিপয় সদস্য যাহারা এই সমাজের প্রতি কতিপয় কর্তব্য করিতে বাধ্য এবং ইহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া ইহার সকল প্রকার সুবিধায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী।[১] আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার একটি বিখ্যাত মামলায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নাগরিকগণ হইতেছে একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। তাহারাই রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাহারাই

'নাগরিক' শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থ

১। "Citizens are the members of the civil society bound to this society by certain duties, subjected to its authority and equal participation in its advantages."

নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সেই সরকারের অধীন হইয়াছে"।[১] বর্তমান কালেও নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

নাগরিক অধিকারের কর্তব্য

কিন্তু, আধুনিককালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষ-ভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিকজীবনে সকলেই কতিপয় সুযোগ-সুবিধা সরকারের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না বলিয়া সকলকেই আমরা নাগরিক বলিতে পারি না। বিদেশীগণ সবরকম পৌর-স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। আধুনিককালে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ রাজ-নৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন হয়। নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ—রাষ্ট্রের উন্নতিতেই নাগরিকগণের উন্নতি। আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরণের নাগরিক শৃংখলা বজায় রাখিলে নাগরিকজীবন শান্তিময় হইয়া উঠে এবং রাষ্ট্রের তাহাতে উন্নতি হয়। নাগরিকগণকে যেমন বিভিন্ন অধিকার দেওয়া হয়, নাগরিকগণেরও উচিত সেই অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা যাহাতে সমষ্টিগত জীবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটি আদর্শস্তরে উন্নীত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়ত সব নাগরিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নিজের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে এবং নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। এইজন্যই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যও আছে। অধ্যাপক লাস্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সার কথা নিহিত রহিয়াছে সাধারণের মঙ্গলের জন্য, নাগরিকের শিক্ষাদ্বারাপ্রাপ্ত মার্জিত বিচার-বুদ্ধির অবদানের মধ্যে ("citizenship .....means contribution of one's instructed judgement to the public good.—Laski)। সুতরাং নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন লোক যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং সর্বদাই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে।

১। "Citizens are members of the political community to which they belong, These are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of their collective rights."

নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Citizen and Alien) : একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর (alien) মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী। একজন বিদেশী একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিভিন্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, একজন বিদেশী যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একজন বিদেশীকে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করানো যায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র (যে রাষ্ট্রে সে সাময়িকভাবে বাস করিত) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা সর্বদাই তাহার রাষ্ট্র রক্ষা করে। একজন নাগরিক সম্পূর্ণভাবে সবরকম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন, কোন বিদেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের সব দায়িত্বই পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনাবাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়।

বিদেশীর আনুগত্য থাকে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি

বিদেশীর রাজনৈতিক অধিকার থাকে না এবং তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করা যায় না

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় (Diffrent methods of acquiring Citizenship) : নাগরিক দুই প্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মসূত্রে নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বারা নাগরিক। নাগরিকতা অর্জনেরও দুইটি উপায় আছে,—প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার আবার দুই প্রকার হইতে পারে—একটি হইল জন্মনীতি (Jus Sanguinis) এবং অপরটি হইল জন্মস্থান নীতি (Jus Soil)। প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার

জন্ম পদ্ধতি এবং অনুমোদন পদ্ধতি

নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক বলিয়া দাবি করিতে পারে। অর্থাৎ পিতা যে দেশের নাগরিক, পুত্র যদি সেই দেশে জন্মগ্রহণ না করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবিতে সে সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মটিতে জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অর্জিত হয়। (যদি কোনও রাষ্ট্র এক সঙ্গে উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা একই সময়ে অর্জন করিতে পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে ; আবার জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে আমেরিকার কোন নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এরূপক্ষেত্রে কোন নাগরিক সাবালক হইয়া স্থির করিবে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে।)

অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিকতা (naturalized citizenship) বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন দেশের জন্মগত নাগরিক অপর দেশের কতিপয় শর্ত পালন করিয়া সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করে। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরি করিয়া, বহুদিন একটানা বিদেশে বসবাস করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথবা সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন করিতে হয় এবং তাহার পর কতিপয় শর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে ঐ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বাস করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সৎস্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি শর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে নাগরিকতা অর্জন করিয়া বিদেশী ঐ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু, অনেক সময় সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মগত নাগরিক না হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিকতা

বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। ইটালী জার্মানী, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড জন্মনীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা

প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। আবার আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু, ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সুবিধা অনুযায়ী যখন যে নিয়মটি প্রয়োগ করা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করে। ভারতবর্ষ কর্তৃক অনুসৃত নীতিটি একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের সময় যে স্থায়ীভাবে ভারত বসবাস করিতে ইচ্ছুক যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা যাহার পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত যে একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিয়াছে, তাহাকেই ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, যে অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতামাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে যে কোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান করা হইবে। এই ব্যক্তি যদি এতকাল ভারতের বাহিরে বাস করিয়া থাকে, তবে তাহাতে কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে।

ভারতে অনুসৃত নীতি

এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং দ্বি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে ধরা যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিল। জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক। শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহা লইয়া হয়ত কোন গোলমাল হইবে না—কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রশ্ন লইয়া উভয় দেশের মধ্যে বিতর্কের এবং কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার যে নীতি প্রচলিত তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারণের সমস্যা হয় না। কিন্তু ইহাও একটি বিজ্ঞানসম্মত নীতি নহে। কেননা, এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা একটি বিশেষ স্থানে জন্ম সংক্রান্ত দৈবদুর্ঘটনার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্ একটি ভারতীয় দম্পতি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। যাত্রাপথে জাপানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুকাল তাহারা থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে তাহাদের একটি সন্তান জন্মলাভ করিল; পুনরায় তাহাদের চারিটি সন্তান যথাক্রমে ইংলণ্ড জার্মানী ইটালী এবং সুইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাঁচটি সন্তান পাঁচদেশের নাগরিক হইল। কিন্তু, আমরা এই অবস্থা অচিন্তনীয় মনে করি। সেইজন্য জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা, অর্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত নহে।

জন্মগত অধিকার ও জন্মস্থানগত অধিকারের মধ্যে সংঘাত

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত সেই আবেদন পত্রটির খুঁটিনাটি বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়া নাগরিকতা লাভের সব শর্ত পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখে। অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা সম্পূর্ণ (complete or grand) এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা এবং জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না এবং উভয় প্রকার নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা (citizenship by grand naturalization) বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা (citizenship by partial naturalization) বলি। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকতা এবং নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য হয়। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা নাই।

সম্পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

এখানে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক আইন-কানুন আছে। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি (immigration laws) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতা-রক্ষার জন্য। নাগরিকতা সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথবা বর্ণগত বিদ্বেষ।

নাগরিক অধিকারের বিলোপ (Loss of Citizenship) : যাহাকে নাগরিক অধিকারের বিলোপ বলিয়া ধরা হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র। অর্থাৎ, ইহাকে একদেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশের নাগরিকতা গ্রহণও দেখা যায়।

বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মূল নাগরিকতা হারাইয়া থাকে। কোনও নূতন নাগরিকতা অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে। একই সঙ্গে একাধিক দেশের নাগরিক অধিকার ভোগ করা সম্ভবপর নয়। বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অনুমতি লওয়া থাকে অথবা যদি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই

নাগরিকতার বিলোপ

এই চাকুরি লইয়া থাকে, তবে সে এইজন্য নাগরিকতা হারাইবে না। বিদেশে জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে নিজের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণেও কেহ নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি (লেখাপড়া অথবা জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত) গ্রহণ করিতে পারেন না।

সুনাগরিকতার লক্ষণ (Criteria of good Citizenship): লর্ড ব্রাইসের মতে সুনাগরিকের লক্ষণ হইতেছে তিনটি, সুনাগরিককে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে, সংযমী হইতে হইবে এবং বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে। ভাল মন্দ বিচার করিবার যোগ্যতা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং সমাজের পক্ষে যাহাই কল্যাণকর সেই অনুযায়ী কাজ করিবার প্রবণতা না থাকিলে কোন নাগরিককেই সুনাগরিক বলা যায় না। গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্যই নাগরিকদের এই গুণগুলি থাকা দরকার। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় এই প্রকার গুণগুলি অর্জন করিতে পারিলেই কোন নাগরিককে "সুনাগরিক" বলিয়া গণ্য করা হয়। এইজন্য প্রয়োজন নাগরিকদের শৃংখলাবোধ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজ চেতনা। এই গুণাবলীর কথা চিন্তা করিয়াই বার্ণস্ (C. D. Burns) বলিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে স্বাধীনচেতা এবং জন দরদী হইতে হইবে।[১]

সুনাগরিকতার লক্ষণ:
(১) বিচারবুদ্ধি
(২) আত্মসংযম
(৩) বিবেক

সুনাগরিকতা অন্তরায় (Hindrances to good Citizenship):

ব্রাইসের মতে প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে উদাসীনতা বা নির্লিপ্ততা (indolence), ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি (private interest) এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি (party spirit)। মূলতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে কতিপয় গুণের সমাবেশ হইলেই নাগরিক জীবন সার্থক হইতে পারে। প্রথমতঃ, নাগরিককে সর্বদাই নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। অধিকার ভোগের জন্য অত্যুৎসাহী এবং কর্তব্যপালনে নির্লিপ্ত থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যায় না। নাগরিকগণ যখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকে এবং সামাজিক ও পৌর কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবার সময় অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া গুরুত্ব সহকারে নিজেরা কোন কাজ করিতে চাহে না, তখনই নাগরিকজীবন সার্থকতা লাভ হইতে বঞ্চিত

সুনাগরিকতার অন্তরায় (১) নির্লিপ্ততা
(২) ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি
(৩) দলগত স্বার্থবুদ্ধি

১। "In a democratic society there should be at least two characteristics in the conduct and outlook of all men, first, a sturdy independence and secondly, an imaginative sympathy."
—Burns—Democracy ; Its Defects and Advantages.

হয়। কোন নাগরিক হয়ত নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অথচ, এই নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়া আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে সে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছে। এই অবস্থায় কখনই নাগরিক জীবসের চরম সার্থকতা আমরা দেখিতে পাই না। তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা কখনও সার্থক হয় না এবং জনসাধারণের সচেতনতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। মানুষ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার পিছনে আশুলাভের সম্ভাবনা দেখিতে পায় না তখনই সে এই সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইয়া পড়ে। নির্লিপ্ততার প্রধান কাজগুলি হইতেছে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের বৃহৎ আকারের দরুণ নাগরিক; অসংখ্য ভোট প্রদানকারীর মধ্যে একজন হিসাবে সে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনে করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নানা দিকে নাগরিকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, জীবন সংগ্রামে তীব্রতা, অভাব-অনটনে, বেকার সমস্যা প্রভৃতি কারণে নাগরিকের মন বিক্ষিপ্ত থাকিলে রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা বাড়িয়া যায়। চতুর্থতঃ, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা অনেকক্ষেত্রে মানসিক অসারতার সৃষ্টি করে এবং ইহা বহুলাংশে রাজনৈতিক নির্লিপ্ততার কারণ হয়। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার এবং সংবাদপত্রগুলি ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় নাগরিক জীবনের এই অন্তরায় ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

নাগরিক উদাসীন থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার নিরর্থক হইয়া পড়ে

সুনাগরিকতার দ্বিতীয় অন্তরায় হইতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় সুস্থ, সুন্দর নাগরিক জীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নাগরিকগণ যখন সমাজের এবং দেশের স্বার্থ অপেক্ষাও নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখে, তখন নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না। অনেক সময় এমন হয়, কতিপয় অর্থনৈতিক স্বার্থের সিদ্ধির জন্য নাগরিক নির্বাচনে অনুপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিয়া থাকে। নির্বাচনে ভোট দান করা একটি পবিত্র দায়িত্ব; নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া যদি অনুপযুক্ত প্রার্থীকে সমর্থন করা হয় তবে নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি নাগরিক জীবনের সার্থকতার পথে অন্তরায়

তৃতীয়ত, দলগত স্বার্থ অনেক সময় নাগরিকগণকে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী চলিতে দেয় না। গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচনে ভোটদান করিবার সময় নাগরিকগণকে নিজের দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য

রাখিতে হয় এবং দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হইতে হয়। অনেক সময় নাগরিকগণ বাধ্য হইয়া দলীয় স্বার্থের চাপে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির পক্ষে ভোট প্রদান করে। এই বিবেকবিরুদ্ধ কাজ তাঁহাদের করিতে হয় দলীয় রাজনীতির চাপে পড়িয়া। তাহাতে নাগরিক জীবন সহজ, সুন্দর এবং সার্থক হয় না। দলীয় স্বার্থে যখন নাগরিকগণ পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অপক্ষে নিজের দলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার প্রশ্নটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। দলীয় স্বার্থের প্রভাবে রাজনৈতিক জীবনে অনেকক্ষেত্রেই আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হইবার কারণ হইতেছে নাগরিকগণ কর্তৃক দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হওয়া। রাজনৈতিক দলগুলি যদি দুর্নীতিমূলক কাজকে প্রশ্রয় দেয়, সংবাদপত্রগুলি যদি সত্যনিষ্ঠ সংবাদ সরবরাহ করা হইতে বিরত থাকে; এবং দলীয় নেতাগণ যদি নিজেদের স্বৈরাচার বজায় রাখিবার জন্য জনস্বার্থবিরোধী কাজ করিতে থাকেন তবে সেই রাজনৈতিক দলের অনুগামীগণ সমাজের কল্যাণের জন্য সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করার সামর্থ্য হারান। ইহা সুনাগরিকতার পক্ষে একটি বড় অন্তরায়।

অনেকক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থে নাগরিক তাঁহার ব্যক্তিত্ব হারায় এবং বিবেক-বিরোধী কাজ করে।

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটি অনেকক্ষেত্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে। নাগরিকদের মধ্যে আত্মসংযম এবং শৃংখলাবোধের অভাব সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি দূর করার উপায় (Measures to remedy the hindrances to good citizenship) : সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়গুলি দূর করার উপায়গুলিকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে যথা, (১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান (constitutional remedies) এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান (moral remedies)।

নাগরিকজীবনের সার্থকতার পথে যে সকল বাধা আমরা দেখিতে পাই সেইগুলি দূর করিতে হইলে সরকারকে দুইটি নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম জাতি অনুযায়ী সরকারের কাঠামো, ক্রিয়া-কলাপ এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আমূল সংস্কার করিতে হইবে। ভোট দান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদান প্রথার প্রবর্তন, ক্ষেত্রবিশেষে গণনির্দেশ (Initiative) এবং গণভোট (Referendum) প্রথার প্রবর্তন এবং শাসনবিভাগে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতির অবসান করা, সরকারের ক্রিয়াকলাপের এইভাবে সংস্কার করিলে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহারা সুনাগরিক হইতে পারিবে। তবে বাধ্যতামূলকভাবে ভোট প্রদানের নীতি প্রবর্তন করা রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা দূর করিবার প্রকৃত উপায় নহে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান

তাহা ছাড়া, বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গণনির্দেশ, গণভোট, প্রভৃতি প্রথাব প্রবর্তন করাও সম্ভবপর নয়। রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা দূর করিবার প্রধান উপায় হইল নাগরিকদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা, শিক্ষা বিস্তার করা এবং রাজনৈতিক চেতনা জোরদার রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা। যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional representation) প্রথা প্রচলিত হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের সব নাগরিকেরই দলমত নির্বিচারে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সব রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সমানুপাতিক নির্বাচনে কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না। ইহাতে সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করিতে হয় এবং সরকার দুর্বল ও স্বল্পস্থায়ী হইয়া পড়ে। বাধ্যতামূলকভাবে ভোট দান প্রথার প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিক-জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, এই প্রথার একটা বিপদও আছে। অশিক্ষিত ভোটদাতাগণ অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশীমত ভোট দান করিতে পারে। গণনির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন সুইজারল্যাণ্ডে সম্ভবপর হইলেও বড় দেশগুলির পক্ষে ইহা চালু করা খুবই কষ্টসাধ্য! অবশ্য ইহা যে অসম্ভব তাহা নহে। শাসনব্যবস্থা হইতে সর্বপ্রকার দুর্নীতি নিঃশেষে দূর করিবার জন্য যদি সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জনগণের বিশ্বাসভঙ্গকারীর জন্য যদি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকে তবে নাগরিকজীবনে সকলেই শৃংখলা-পরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা করিবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান করা কতটা সম্ভবপব

নাগরিকদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে তবে নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে দ্রুত আগাইয়া যায়। কেহ যদি সুনাগরিক হইতে না পারে, তবে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। যদি প্রত্যেকে নিজের জীবনে উপযুক্ত সাধারণ এবং রাজনৈতিক শিক্ষা পায়, তবে প্রত্যেকেই সুন্দর নাগরিক জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবে। একটি জাতির প্রধান সম্পদ হইল শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ। দেশের সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত হয়, এবং কেহ যদি শিক্ষা অর্জন করা একটি আদর্শ বলিয়া মনে করে, শিক্ষার আলোক যদি সে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে এবং মানসিক দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে একজন সুনাগরিক হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে, বরং তাহার নাগরিকজীবন পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাধারণ শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন হইতেই লোকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। সেইজন্য সুন্দর নাগরিক

শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা

জীবনের একটি প্রধান শর্ত হইল নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা।

দ্বিতীয় নীতিটি অনুযায়ী সমাজে সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেমন উৎকোচ গ্রহণ করা অথবা অসাধু উপায়ে কোন কাজ কিংবা অর্থের লোভ দেখাইয়া ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা,—প্রভৃতি দুর্নীতি দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক যাহারা, সেই শিশুদের অল্প বয়স হইতে সংশিক্ষার ব্যবস্থা করা, নাগরিকদের মধ্যে শৃংখলাবোধ এবং সংযম বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি যাহাতে হয় সেই ব্যবস্থা করা, দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের অবসান করিবার ব্যবস্থা করাই হইতেতেছে সুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায়গুলি দূর করিবার নৈতিক প্রতিবিধান।

নৈতিক প্রতিবিধান

নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and People): নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ (People) এক নহে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। স্বজাতীর কোন লোক যদি কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও দেশের নাগরিক নহে। কোন বাঙ্গালী যদি ব্রিটেনের নাগরিকতা অর্জন করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করেন, তবে তিনি যে বাঙ্গালী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না। স্বজাতীয় লোক যদি ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে তাহাকে কোন্ দেশের নাগরিক অধিকার সে গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝায় একই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া এক গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নাগরিকের ন্যায় তাহাকে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Subject): নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু প্রজা সবসময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদা সম্পন্ন এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারে না। ভারতবাসীরা যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহারা প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। যাহাদের প্রজা বলা হয় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার অধিকার হয় না। প্রজার কোন অধিকার শাসকসম্প্রদায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চায় না। শাসকের ইচ্ছায় প্রজার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবন

নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে 'প্রজা' শব্দটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেননা গণতন্ত্রের যুগে এই শব্দটির কোন স্থান নাই।

নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizen and Elector) : অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সবসময় ঠিক নহে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক নাও হইতে পারে, আবার কেহ হয়ত নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে নাগরিক নাও হইতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও নির্বাচন অধিকার প্রদান করিতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিদেশীকে আমরা নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

নাগরিকদের অধিকার (Rights of the Citizens) : অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিয়াছি নাগরিকদের দুই প্রকার অধিকার থাকে যথা, নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights)। নৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের নীতিজ্ঞান, বিচার বুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয় না। কিন্তু আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। আইনগত অধিকারগুলিকে পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, সামাজিক অথবা পৌর অধিকার (Civil Rights) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এবং অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)।

নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (Civil Rights of the Citizens) :

১। জীবন রক্ষার অধিকার (Right to life)—পৌর অধিকারগুলির মধ্যে ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গোলযোগ হয় অথবা রাষ্ট্রের উপর যদি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবি করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

জীবন রক্ষার অধিকার

২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (Right to Move freely)—প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রুচি অনুযায়ী বিকাশ করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যাইবে না। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে নাগরিকদের এই অধিকার রাষ্ট্র

চলাফেরার অধিকার

খর্ব করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ অথবা জাতীয় জরুরী অবস্থা ছাড়া সব নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকার ভোগ করিয়া থাকে।

৩। **কাজ করিবার অধিকার (Right to Work)**—কাজ করিবার অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে।

কাজের অধিকার

৪। **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)**—সম্পত্তির অধিকারও নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকারটি সার্বজনীন নহে। সামাজিক কল্যাণের জন্য—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের শোষণমুক্ত করিবার জন্য রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিভিন্ন দেশে দেখা যায় রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই হস্তক্ষেপের মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (eminent domain). পুলিশী ক্ষমতা (Police Power) এবং করস্থাপন করিবার ক্ষমতা (power of taxation)। নিকোলাসের (Nicholas) ভাষায়, সর্বোচ্চ ক্ষমতা হইতেছে "The power of the sovereign to take property for public use without the owner's consent" রাষ্ট্র জনস্বার্থের খাতিরে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে সম্পত্তির অধিকারী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে। এমনিতে সাধারণ অবস্থায় নিজের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে।

সম্পত্তির অধিকার

৫। **স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (Right to Contract):** এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দিক। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনে চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে কোন বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করিবে। চুক্তি করার স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত।

চুক্তি করিবার অধিকার

৬। **বাক্-স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Speech):** বাক্‌স্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার।

এই পৌর অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ, ইহা একটি পৌর অধিকার। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার যদি মানুষ না পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব মানুষেরই থাকা উচিত। এই অধিকারটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য দায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, এই অধিকারটিও সার্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমাদের যাহা খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ যুদ্ধ অথবা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বাক-স্বাধীনতার অধিকার—কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা একটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়।

৭। **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press) :** সভ্য নাগরিকজীবন এবং ইহা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। নাগরিকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, সেইরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অনুযায়ী সরকারও প্রভাবান্বিত হয়। সংবাদপত্রে যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের খোলাখুলি সমালোচনা হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যুদ্ধের সময়ে অথবা দেশে জরুরী অবস্থান সৃষ্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব

৮। **সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right to Association) :** মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ

সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করেন তখন তাহারা একটি সমিতি গঠন করে। একটি সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। সুতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য সভাসমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকের থাকা আবশ্যক। এই অধিকারটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যদি নাগরিকগণ রাজনৈতিক সভাসমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভাসমিতি সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথা নাই।

সভা-সমিতি গঠনের অধিকার

৯। **পরিবার গঠনের স্বাধীনতা** (**Right to Family**) : সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না। তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রে কোন পুরুষ একজন স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না এবং কোন স্ত্রীলোক একজন স্বামী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না। মুসলমান ধর্মে অবশ্য বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ করিবার এবং পরিবার গঠন করিবার অধিকার যেমন নাগরিকদের আছে সেই প্রকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

পরিবার গঠনের অধিকার

১০। **ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা** (**Freedom of Worship and Conscience**) : মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য মানুষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনভাবে চালনা করিবার অধিকার থাকা উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মানুষের নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ), সেই সকল রাষ্ট্রেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা অনেক দেখিয়াছি। সুতরাং সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে।

ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা

১১। **শিক্ষার অধিকার** (**Right to Education**) : নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে সেইজন্য শিক্ষা পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিকগণকে প্রদান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না।

শিক্ষার অধিকার

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর অধিকার আছে, যেমন নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) : রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই।

১। **বাসস্থানের অধিকার (Right to Residence) :** এই অধিকার অনুযায়ী যে কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নির্বিশেষে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে পারিত, তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার (Right to move) কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

বাসস্থানের অধিকার

২। **বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (Right to Protection while staying abroad) :** কোন নাগরিক যদি বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবনরক্ষার অধিকার দাবি করিতে পারে।

বিদেশে জীবনরক্ষার অধিকার

৩। **ভোট প্রদান করিবার অধিকার (Right to vote) :** সমুদয় রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষতঃ, পরোক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এই অধিকারটি অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য সে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অথবা তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহা একটি মৌলিক অধিকার। বিদেশীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত।

ভোটপ্রদানের অধিকার

৪। **সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার (Right to hold public office) :** নাগরিকগণের সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার থাকিবে।

ইহার তাৎপর্য হইতেছে সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং বিদেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের অনুমতিতে এই অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িক ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, বিদেশী কখনই নাগরিকতা অর্জন করে না।

সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার

৫। আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition): নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের কারণ থাকে তবে তাহা দূর করিবার জন্য নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে।

আবেদন করার অধিকার

৬। স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right to Resist): প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোনো একটি বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহা লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে। তবে এই অধিকারের তাৎপর্য হইতেছে যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। সাধারণতঃ সভানুষ্ঠান করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া, এবং সংবাদপত্রের মারফৎ অথবা আইনসভার ভিতরে সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে শাসনতান্ত্রিক প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (Right to constitutional remedies)।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

উপরোক্ত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ছাড়াও অপর একটি বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার হইতেছে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং মতপ্রকাশের অধিকার (Freedom of Speech and Expression of Opinion)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। এইজন্য প্রয়োজন হইলে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিতে পারেন।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights): অর্থনৈতিক অধিকারগুলি পৌর অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিরক্ষার অধিকার এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার, নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি পাইবার অধিকার, প্রভৃতি হইতেছে প্রধান অর্থনৈতিক অধিকার। আধুনিক লেখকগণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে চাকুরি পাইবার অধিকার। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া

অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। দেশে যাহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরি পাইবার অধিকার নহে নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দাবি করিতে পারে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি অথবা সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থ নৈতিক অধিকার। শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে এবং তাহারা ন্যায্য মজুরি পাইল কিনা সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়া এবং ন্যায্য মজুরি পাওনা নাগরিকদের একটি মৌলিক অর্থ নৈতিক অধিকার। স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের আর একটি অর্থ নৈতিক অধিকার।

বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার শর্ত (System of guaranteeing these rights in different countries): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। অন্যান্য অধিকার হইতে এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এইগুলি যদি রাষ্ট্র পালন না করে তবে নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নকেও লিখিতভাবে নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেদেশে নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় এই অধিকারগুলির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ততটা গুরুত্ব তাহারা দিতে পারে না। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে নাগরিক অধিকারগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করে। ইংলণ্ডে লিখিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলেও নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে ইংলণ্ডের আইনের অনুশাসন (Rule of law) এবং প্রচলিত আইনগুলির (Conventions) সাহায্যে। ইংলণ্ডের বিচার বিভাগও এই প্রচলিত আইনগুলিকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিয়াছে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার ছিল না। পরে শাসনতন্ত্রের দশটি সংশোধন করিয়া নাগরিকদের অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ (Bill of Rights) করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রণীত কোন আইন নাগরিকদের স্বার্থের অধিকারের বিরোধী হইলে তাহাকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নাগরিকগণের সদা সচেতনতা।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of a Citizen) : নাগরিকগণ যে সকল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, সেগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে। তাহাতে অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করিয়া অপরাপর অধিকার হইতে পৃথক করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্র হইতেই এই অধিকারগুলি পায় বলিয়া সরকারের এই অধিকারগুলি স্বীকার না করিয়া লওয়ার ক্ষমতা নাই। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে তবে নাগরিকগণ বিচার বিভাগের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে।

আধুনিক কালে নাগরিকগণ যে সকল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ভোগ করে, সেইগুলি হইতেছে—(১) জীবনের অধিকার (Right to life) (২) কাজ করিবার অধিকার (Right to work), (৩) সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Right to property), (৪) যুক্তিসঙ্গত মজুরী ও নির্দিষ্ট কার্যকাল পাইবার অধিকার (Right to reasonable wages and hours of work), (৫) শিক্ষার অধিকার (Right to education), (৬) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience) (৭) বাক্ স্বাধীনতা (Freedom of speech), (৮) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press), সভা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right to association), (১০) ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা (Right to vote). (১১) সরকারী চাকুরি করিবার ক্ষমতা (Right to hold public offibes), (১২) সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করা এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার অধিকার) (Right to resist) এবং (১৩) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার (Right to Political Power)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আমরা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেখিতে পাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি যেরূপ লিখিত আছে, সেইপ্রকার নাগরিকদের বিভিন্ন কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং ঠিকভাবে কার্যকর হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে।

কর্তব্য (Duties)—অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। অধিকার যেরূপ নৈতিক এবং আইনসঙ্গত এই দুই প্রকার হইতে পারে কর্তব্যও সেই প্রকার নৈতিক কর্তব্য (Moral Duty) এবং আইনসঙ্গত কর্তব্য (Legal Duty) এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। নৈতিক কর্তব্য সমর্থিত হয় নাগরিকের বিবেক এবং সমাজের বিবেক দ্বারা—ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ধারণাই নৈতিক কর্তব্য পালনে নাগরিকের প্রেরণা দেয়। এই কর্তব্য পালনে বিমুখ হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু আইনসঙ্গত কর্তব্য যদি কেহ অবহেলা করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের আইনসঙ্গত কর্তব্য। কোন নাগরিক যদি এই কর্তব্য পালন না করে তবে রাষ্ট্র সেই নাগরিককে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। নৈতিক কর্তব্য এবং আইনসঙ্গত কর্তব্যের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ সব দেশে একপ্রকার নহে। কোন কোন রাষ্ট্র হয়ত একটি কর্তব্য নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়, অন্য কোন রাষ্ট্রে হয়ত ইহা একটি আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। নাগরিকদের ভোট প্রদান করা অধিকাংশ দেশেই একটি নৈতিক কর্তব্য ; কিন্তু, মেক্সিকো এবং আর্জেণ্টাইনে ইহা একটি আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties): নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে। মানুষের সমাজচেতনা হইতে অধিকার এবং কর্তব্য উভয়েরই সৃষ্টি হয়। সমাজজীবনে রাষ্ট্রের উক্ত কাজে নাগরিকদের কতিপয় দাবি থাকে, সেইগুলি হইতেছে নাগরিকদের অধিকার। আবার নাগরিকদের কাছেও রাষ্ট্রের এবং সমাজের কতিপয় দাবি থাকে এবং তাহা পূরণ করা হইতেছে নাগরিকদের কর্তব্য। নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। সমাজ জীবনে নাগরিকদের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর সীমা-রেখা অন্যান্য নাগরিকের অধিকারের উপর নির্ভর করে। কারণ, প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে সেই অধিকারগুলি ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় তখনই তাহার কর্তব্যবোধের উন্মেষ হয়

অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরও সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে।

নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আমার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য নাগরিকদের নিকট বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং অন্যান্য নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু আমারও এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমত আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমারও অধিকার পালনের মধ্য দিয়া আমি অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। হবহাউস (Hobhouse) এইক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়াছেন। আমার যদি রাস্তায় ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার থাকে, তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া। অনুরূপভাবে আমারও কর্তব্য অপরকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া; কারণ, অপরেরও অনুরূপভাবে রাস্তায় ধাক্কা না খাইয়া চলিবার অধিকার আছে। হবহাউসের ভাষায় "If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement .....your duty is to give me reasonable room." দ্বিতীয়তঃ, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে আমি যেমন হস্তক্ষেপ করিতে পারি না অন্যান্য নাগরিকগণও আমার অধিকারে সেইরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যান্য নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের।

রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা

আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ না করা। অন্য নাগরিকদেরও অধিকার আছে তাহাদের বাড়ীতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে না দেওয়া। আমার ভোটদানের অধিকার আছে; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিক-ভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের এলে অন্য নাগরিকের উপর যেমন কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়াছে. সেই প্রকার আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং

নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা

কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক ("Rights and duties are two aspects of the same thing.")। অধিকার এবং কর্তব্য, উভয়েরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ সুন্দর করা এবং শৃংখলার সৃষ্টি করা। আমার অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,—ইহাতে আবার এবং অপর সকলেরই স্বাধীনতা বজায় থাকিবে।

সুন্দর ও সার্থক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে নাগরিকের দায়িত্ব

সুন্দর ও সার্থক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের জন্য নাগরিকের যেমন অধিকার থাকা দরকার, সেই প্রকার কর্তব্য পালনেও দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। নাগরিকগণ অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেইভাবে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ নিজেদের অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তব্যের কথা বিস্মৃত না হয়। আবার, সব নাগরিকেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের সময় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সময়মত করপ্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি কাজে লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাসীন হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র যদি কখনও নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে নাগরিকদের তাহা জোর করিয়া আদায় করিবার অধিকার থাকা উচিত। দরকার হইলে ন্যায় এবং সত্যের জন্য বিদ্রোহ করাও নাগরিকদের যুগপৎ অধিকার এবং কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অধিকার কখনও ফাঁকা কথা নয়,—প্রতিটি অধিকার কর্তব্যবোধের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে। অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

নাগরিকদের কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে

বিদ্রোহের অধিকার ও কর্তব্য

সংক্ষিপ্তসার

১। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য আছে। বিদেশী সবরকম পৌর স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় না। বিদেশী হইতেছে

ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। তাহাদের বিধি নিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অথবা অসদাচরণের জন্য রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করানো যায় না।

২। নাগরিকতা অর্জন জন্মসূত্রে অথবা অর্জনের দ্বারা হইতে পারে। জন্মাধিকার রক্তগত (Jus Sanguinis) এবং জন্মভূমিগত (Jus Suli) হইতে পারে। অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অর্জিত নাগরিকতা (Naturalized Citizenship) বলা হয়। যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অর্জিত নাগরিকতা বলি।

৩। লর্ড ব্রাইসের মতে সুনাগরিকতার অন্তরায় হইতেছে নির্লিপ্ততা ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি। নাগরিকতাকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য ভোট-দান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোট প্রদান করার প্রথা প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন নির্দেশিত হইলেও এই ব্যবস্থাগুলি সর্বদা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। সুনাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য সর্বাগ্রে নাগরিকদের সুশিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন।

৪। নাগরিকদের অধিকারগুলিকে নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার এই দুইভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইনগত অধিকারগুলি পুনরায় পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারে বিভক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও আছে। নাগরিকদের পৌর অধিকারগুলি হইতেছে,—জীবনরক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার, কাজ করিবার এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, পরিবার গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার। নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইতেছে বাসস্থানের অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার, ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার। আবেদন করিবার অধিকার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার। ভারতবর্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। ইংলণ্ডের নাগরিকগণও আইনের নিয়ম এবং প্রথাগত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্যায় নাগরিকদের কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও থাকে। চাকুরি পাইবার অধিকার, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতনশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার এবং ন্যায্য মজুরি পাইবার অধিকার,—প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার। ইহা ছাড়া মানুষের কতিপয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার আছে। নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

Exercise

1. Citizenship has been defined as "the contribution of one's instructed judgment to the public good." (Laski). Examine the statement. Describe the different methods of acquring citizenship.

[নাগরিকতার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হইয়াছে এই যে ইহা হইতেছে জনকল্যাণে কোন একজনের শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বিচার বুদ্ধির অবদান,—উক্তিটি পরীক্ষা কর। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between (a) a citizen and an alien and (b) a natural citizen and a naturalised citizen.

[(ক) নাগরিক ও বিদেশী এবং (খ) স্বাভাবিক এবং অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] [১৭০-১৭৩ পৃষ্ঠা]

3. **How is citizenship lost ?**

[নাগরিকতা কিভাবে বিলুপ্ত হয় ? [১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা]

4. **What are the hindrances to good citizenship ? What measures do you suggest for removing these hindrances ?**

সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি কি কি ! এই অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য তুমি কি ব্যবস্থার সুপারিশ কর ? [১৭৪-১৭৮ পৃষ্ঠা]

5. Differentiate between Citizen, Subjects and Electors.

[নাগরিক, প্রজা এবং নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য কর। [১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা]

6. Define Rights. Distinguish between Civil and Political Rights. How are Civil Rights guaranteed in (a) England. (b) U. S. A., and (c) India.

[অধিকারের সংজ্ঞা প্রদান কর। পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে পৌর অধিকারগুলি কিভাবে সুনিশ্চিত আছে। অধ্যায় হইতে ১৩৯-১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; ১৭৯-১৮৪ : ১৮৫ পৃষ্ঠা]

7. Write a brief note on the Economic Rights enjoyed by a citizen in a modern democratic state.

[আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন নাগরিক যে অর্থনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করে সেগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। [১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা]

8. Enumerate the more important Fundamental Rights which a citizen in a modern state enjoys.

[একটি আধুনিক রাষ্ট্রে একজন নাগরিক যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করে সেগুলি বর্ণনা কর। [১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা]

9. "Rights and Duties are correlative."—Explain and illustrate.

[অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও। [১৮৭-১৮৯ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ—সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক

(State and Nationalism —Relation between Nationalism and Civilisation

[এই অধ্যায়ে প্রথমে জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। জাতীয় জনসমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির তাৎপর্য আলোচনা করিবার পর জাতিতত্ত্ব বা 'এক জাত এক রাষ্ট্র' নীতিটি পর্যালোচনা করা হইয়াছে জাতীয়তাবাদ হইতেছে একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। ইহার মূল্যায়ন করা এবং সভ্যতার সহিত ইহার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলেই এই আদর্শের তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি। জাতীয়তাবাদের আদর্শের নানাদিক আলোচনা করিবার পর আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে]

জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) : জাতীয় জনসমাজ গঠনের পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্টি (People) বলিতে কি বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় জনসমষ্টি বলিতে বুঝায় একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষা ও সাহিত্য, একটি সাধারণ ঐতিহ্য ও ইতিহাস, আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে। কিন্তু স্বজাতীয় মানুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই ঐতিহ্য এবং ঐক্যবোধের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্বজাতীয় জনসমষ্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজবন্ধনের মূল সূত্র। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব হইতেই জনসমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। কারণ ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং লিকক (Leacock) জনসমাজের বংশগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১] রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'Nationalism', বইয়ে জনসমাজ গঠনে রক্তের সম্বন্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সুইজারল্যাণ্ডের জনগণের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণে ইহা উল্লেখযোগ্য।[২]

স্বজাতীয় জনসমষ্টি কাহাকে বলে ?

১। "A nation is......a race, decented form common ancestors, and sharing some kind of blood consciousness." —Mazzini.

২। In Switzerland "in spite of race differences, the people have solidified into a nation......because they are of the same blood". —Rabindranath—*Nationalism*.

জাতীয় জনসমাজ (Nationality): জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীর ঐক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় একদল জনসমষ্টি লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে বংশগত ঐক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় জনসমাজে বংশগত ঐক্য থাকিবে; কারণ, ইংরাজী "Nationality" কথাটি আসিয়াছে "Natio" কথাটি হইতে। "Natio" কথাটির অর্থ হইল জন্ম। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতনা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বজাতীয় মানুষের নির্দিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকিতে পারে; যেমন, কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না অথবা ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু তাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল,—ইহাই তাহাদিগকে একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জাতীয় জনসমাজকে "রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসমষ্টি" (politically conscious People) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। জাতীয় জনসমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হইতেছে, (১) কুলগত ঐক্য; (২) ভাবগত ঐক্য; (৩) ভৌগোলিক ঐক্য; (৪) অর্থ নৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্য এবং (৫) আচার-ব্যবহারের ঐক্য। কিন্তু এই উপাদানগুলির কোনটিই জাতিগঠনের জন্য অপরিহার্য নহে।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality): জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা দুইটি ভাগ করিতে পারি, যথা—বাহ্যিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত ঐক্য (racial unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু বংশগত ঐক্য যে একেবারে অপরিহার্য তাহা নহে। জার্মান এবং ইংরাজ একই নিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালী এক বংশোদ্ভব না হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে।

বংশের ঐক্য একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু অপরিহার্য নয়

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাগত ঐক্য (sameness of language) জাতীয় জনসমাজ গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে অপরিহার্য নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয় নাই। সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা তিন ভাষায়কথা বলে; সোভিয়েত রাশিয়ায়ও অনেক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষম্যকখনই অখণ্ড

ভাষাগত ঐক্য—ইহাও অপরিহার্য নয়

জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত ঐক্য যে জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভাষাগত ঐক্যের জন্য সম্ভব হইয়াছে

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের আর একটি উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও যে সর্বদা অপরিহার্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহুদি জাতি বহুদিন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে বসবাস না করিয়াও নিজেদের ঐক্যবোধের প্রেরণায় জাতীয় জনসমাজ গঠন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে অবিভক্ত ভারতে একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দু এবং মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত একজাতিতে পরিণত হয় নাই।

ভৌগোলিক ঐক্য—ইহা অপরিহার্য নহে

চতুর্থতঃ ধর্মগত ঐক্য (Religious unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাস করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই।

ধর্মগত ঐক্য—ইহার গুরুত্বও কমিয়া গিয়াছে

প্রথমতঃ একই দেশে আচার-ব্যবহারের ঐক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্যও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু ইহাও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে।

উপরোক্ত চারিটি উপাদান হইতেছে জাতীয় জনসমাজ গঠনের বাহ্যিক উপাদান, ইহাদের কোনটিও অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের ভাবগত ঐক্য (spiritual unity) অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়। যদি একই ইতিহাসে ঘটনাপঞ্জীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হয় যদি, তাহাদের আত্মত্যাগ এবং সুখ-দুঃখের একই স্মৃতি থাকে এবং যদি একই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিজেদের ঐতিহ্য রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করে তখনই তাহাদের এই ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে এবং তাহারা নিজেদের

জাতীয় সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ভাবগত ঐক্য

অপরজাতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করে।[১] স্পেঙ্গলার বলেন জাতীয় সমাজের উপাদান কুলগত অথবা ভাষাগত ঐক্য নহে, ইহার প্রধান উপাদান ভাবগত ঐক্য।[২]

জাতি (Nation)—একটি জাতি হইল রাজনৈতিক হারে সংগঠিত এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যাহা অনুরূপভাবে সংগঠিত জাতীয় জনসমাজ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি এক নহে। জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সংগঠিত হয় এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, জাতি হইতেছে এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যাহা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করিয়া স্বাধীন হইয়াছে অথবা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। জিমার্ণের (Zimmern) মতে জাতি গঠনে ভাবগত ঐক্যের গভীরতা ও মর্যাদা খুবই বেশী এবং ইহা একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট।[৩]

জাতি ও রাষ্ট্র

কোন জাতি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তবে ইহা একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু, জাতি গঠিত হইলেই রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেননা, কোন জাতি হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীন নাও হইতে পারে; ইহা হয়ত স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে।[৪] কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই স্বাধীন এবং সার্বভৌম। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই জাতির সৃষ্টি হয় না; কিংবা রাষ্ট্রের বিলোপ হইলেই জাতির বিলোপ হয় না।

জাতীয়তাবোধ (Nationalism): জনসমাজ গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে ভাবগত ঐক্য (Spiritual unity)। জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতিকে বা জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতি আসে একটি মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

বার্ণস দেখাইয়াছেন, জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির পিছনে দুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, একটি হইতেছে রেনেসার (Renaissance) যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এবং আর একটি হইতেছে নিজস্ব সরকার গঠন করিবার বৈপ্লবিক

১। "...Neither biological nor linguistic unity, but a spiritual unity." —Spengler.

২। "It is sentiment of a common heritage of memories, whether of achievement or glory of suffering and sacrifice, together with a desire to live together and to transmit their heritage to their posterity."—C. D. Burns "*Political Ideals.*" Chapter on "Nationalism."

৩। "...a corporate sentiment of peculiar intensity, intimacy and dignity related to a definite home country."—Zimmern.

৪। A nation is a nationality which has organised itself into a political body, either independent or desiring to be independent.—Lord Bryce.

অধিকার। রেনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা (local independence) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজস্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাকিবে, এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বন্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল। এই দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ। বার্ণসের (Burns) ভাষায় "Out of Renaissance Sovereignty, combined with Revolutionary Rights comes Nationalism".[১]

একজাতি একরাষ্ট্র নীতি ((Principle of One Nation One State) : জাতীয় জনসমাজের সব আশা আকাক্ষা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মধ্যে। যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত।[২] ইহা হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of self-determination)। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয়; তখনই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের নিজস্ব ও পৃথক সরকার দাবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।[৩] অর্থাৎ, জন স্টুয়ার্ট মিল এক জাতি, এক রাষ্ট্র" ("one Nation one State") নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।[৪] একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (mono-national state) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। ১৭৭২ সালে যখন পোল্যাণ্ডের বিভাগ হয় তখন হইতেই কোন জাতীয় সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী কার্যকরী হইতে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন এই নীতির প্রধান সমর্থক। "একজাতি

"একজাতি এক রাষ্ট্র" নীতির তাৎপর্য

জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার

১। Burns—Political Ideals.

২। "It is in general a necessary condition of free institutions that the boundaries of government should coincide in the main with those of nationalities." Mill—Representative Government.

৩। "Where the sentiment of nationality exists in any form, there is prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government."

৪। "Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities."

এক রাষ্ট্র" নীতির পক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন জাতির স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা দেখিতে পারিবে না কিংবা অর্জন করিতে পারিবে না। এইজন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থেই একজাতীয় রাষ্ট্র (mono-national State) গঠন করা উচিত। প্রত্যেক জাতিরই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের বলেই কোন জাতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতে পারে অথবা ইহার রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা সার্থক করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে। একজাতীয় রাষ্ট্রের দাবী সমর্থন করিবার জন্য এই সমর্থকগণ বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের একটি বিচ্যুতি লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (poly-national state) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তুরস্কের শাসনাধীনে বল্কানের জনগণ প্রায়ই বিদ্রোহ করিত। ঠিক জাতি এবং শ্লোভাকগণ এবং দক্ষিণের শ্লাভগণ অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর শাসন পছন্দ করিত না। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইতে পারে

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্য-নীতি যাহা উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন।[১]

জাতীয় জনসমাজের আত্ম-নির্ধারণের অধিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত করিবে

১। "Self-determination is not a mere idle phrase; it is an imperative principle of action which statesmen will, henceforth, ignore at their own peril."
—Wilson.

একজাতি, এক রাষ্ট্র নীতির সমর্থকগণ মনে করেন কোন জাতিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিলে ইহা নিজের উন্নয়নের জন্য এবং নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে সেই জাতি অন্যজাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বরং অন্য জাতি হইতে নিজের বৈশিষ্ট্যকে পৃথক রাখিবে। কোন জাতির পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যকে উন্নত রাখিতে হইলে অপর একটি জাতির প্রতিযোগী না হইয়া ইহার সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। পৃথিবীতে যদি বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র সমন্বিত বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে তবে সমগ্র মানবসমাজই উপকৃত হইবে।[১]

কিন্তু লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) এবং গাম্‌প্লোউইক্‌ (Gumplowicz) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি সমর্থন করেন না। অ্যাক্টনের মতে, জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ।[২] একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ত্ব স্বয়ং।[৩] গাম্‌প্লোউইক্‌ (Gumplowicz) বলেন, একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের যে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা আছে এই মতের কোনও ঐতিহাসিক অথবা সমাজতান্ত্রিক যুক্তি নাই।[৪]

একজাতি এক রাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন অসুবিধা

"একজাতি, এক রাষ্ট্র" নীতির বিপক্ষে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

উন্নততর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনগ্রসর জাতিগুলি উন্নত হয়

প্রথমত, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিরও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার ফলে মানব সমাজের একটি অংশের বীর্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।[৫]

১। "If each nation is to develop its own characteristic, then each nation is valuable to every other not as a rival of exactly the same kind but as a contrast; and humanity at large is benefited by the preservation of so many distinct types." C. D. Burns—Political Ideals.

২। "The theory of Nationality is a retrograde step in history."—Acton.

৩। "The greatest adversary of the rights of nationality is the theory of nationality itself."

৪। "There is no historical or sociological justification of the view that mono-natioal states possess elements of advantage over those composed of a number of nationalities"

৫। "The combination of different nations in one state is as necessary a condition of civilised life as the combination of men in society. Inferior races are raised by living in political union with races intellectually superior.

দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। গণতন্ত্রের সহিত জাতীয়তাবাদের কোন সংঘাত নাই। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দেখা যায়

তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবে প্রযোগ করা অসুবিধাজনক

চতুর্থতঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকর করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমান কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকর হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আট্ষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ত্রিধা বিভক্ত হইবে।[১] ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই থাকিবে। আত্মনির্ধারণ নীতির দুইটি দিক্ আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয়

জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি-প্রযোগ করিতে গেলে অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে

Exhausted and decaying nations are revived by the contract of a younger vitality......this fertilising and regenerating process can only be obtained by living under one government. It is in the cauldron of the state that the fusion takes place by which the vigour, the knowledge, and the capacity of one portion of mankind may be communicated to another."

Acton—*History of Freedom and other Essays.*

১। It would redraw the political map of Europe and of the world—so that disjointed part of the same nationality would be knit together in a common polity and supranational empires would be broken up into their constituent national parts. It would make nationalities rather than state-units of international relationship and law." Hayes.

—"Nationalism" Encyclopaedia of Social Sciences.

জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে পারে।[১]

জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপর দিকে এই নীতি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির আত্মনির্ধারণ করিবার অধিকারের নীতিটি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিলে ইহা আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্প্রসারণের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) মনে করেন, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুয়েজখাল এবং পানামা খাল একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের অধীন থাকা উচিত।[২]

কোন জাতির আলাদা রাষ্ট্র থাকিলেও ইহা আত্মনির্ভরশীল নাও হইতে পারে

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। বরং বিভিন্ন জাতি সম্মিলিতভাবে একটি রাষ্ট্র গঠন করিলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং বোঝা-পড়ার সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হয়।

এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি অনুসৃত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা

ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করিতে পারে। উইলসন্ বলিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্যকর হইলে অনেক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে।

১। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, "The right of self-determination is a double-edged sword; it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become also a disintegrating force."

২। "It should be generally admitted that anything so internationally important as the Suez canal or the Panama canal should be under an international authority. The claim that those who happen to live on its banks should have the right to inflict enormous damage upon those who live elsewhere is one in which there is no justice. One might as well claim that two people who live opposite each other in Fifth Avenue should have the right to put a wall across the street." Bertrand Russell. "*Fact and Fiction.*" P. 1192. MacIver—Society,—Its Structure and Changes, P. 69.

সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। বস্তুতঃ, বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে। ভারতে আমরা বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ দেখিতে পাই। এই দেশে বিভিন্ন জাতির পক্ষে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক উন্নত

উপসংহার : 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিটির পক্ষে ও বিপক্ষে সব যুক্তি আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ব্রাইস এবং ম্যাকআইভার অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাইসের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য কোন জাতির সংগ্রাম হইতেছে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। ম্যাক আইভারও (Mac Iver) বলেন "It has prepared the way for our modern democracies since the demand for self-government expands into the demand that the nation really governs itself."

জাতিতত্ত্ব রাষ্ট্র গঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of a Nationality) : একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্ ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা মূলতঃ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী (Right to exist)।

জাতির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে।

এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টিঁকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা না থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি কখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

ভাষা রক্ষার অধিকার

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (Right to retention of local laws and customs) অধিকার প্রদান করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লীগ্ অফ নেশন্স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়।

স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and politcal equality) থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলেই সমান।

রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার

জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনের ইতিহাস (History of the growth of Nationalism) জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতিকে আমরা ভাবগত ঐক্য বলিতে পারি। শুধু কুলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত ঐক্য থাকিলেই যে এই অনুভূতি আসে তাহা নহে। এই অনুভূতি মূলতঃ একটি মানসিক স্বাজাত্যবোধ হইতে আসে। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন এবং পরিণতি আলোচনা করিবার জন্য যদি আমরা অতীতের দিকে তাকাই, তবে দেখিতে পাই ১৭৭২ সালে পোল্যাণ্ডের দ্বিখণ্ডীকরণ এবং পরবর্তী যুগে ইটালী ও জার্মানীর একত্রীকরণ (unification of Italy and Germany) জাতীয়তাবোধের উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরেও আমরা ফরাসী জাতির মধ্যে একটি বিশেষ জাতীয়তাবোধ দেখিতে পাই। জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি কবে হইয়াছে তাহার উৎস খুঁজিতে হইলে আমাদের রেনেসাঁ-যুগের দিকে তাকাইতে হইবে। রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব অর্জন করার বা স্থানীয় স্বাধীনতা অর্জন করার একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ফরাসী বিপ্লবের পর এই ধারণাই

জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, পোল্যাণ্ডের দ্বিখণ্ডীকরণ ইটালী ও জার্মানীর একত্রীকরণ

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কী ধরণের সরকার গঠিত হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের বা জনসমাজের। এই দুইটি ধারণার সংমিশ্রণেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়।[১] ধর্মসম্বন্ধ লইয়া ইংলণ্ড ও রোমের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপীযুদ্ধ ইংরাজদের মনে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। ইংরাজরা ভাবিতে শিখে যে তাঁহারা একটি পৃথক জাতি। অনুরূপভাবে ফ্রান্সেও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ম্যাটসিনি (Mazzini) মনে করিতেন যে প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব প্রতিভা আছে এবং সব জাতিরই প্রতিভার সম্মেলনে মানবজাতির সম্পদ গঠিত হয়।[২] ম্যাটসিনি প্রচার করেন যে একই ঐতিহ্য এবং বিধিব্যবস্থার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ইটালীয়ানরা একটি জাতি। ম্যাটসিনির পূর্বে ফিকটে (Fichte) জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রচার সুরু করিয়াছিলেন। ফিকটে ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রচারক। তাঁহার মতে জার্মান হইয়া জন্মগ্রহণ করার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করা। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে জাতি এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সব ধারণা পরিহার করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "Nationalism" বইয়ে বলিয়াছেন, "I am not against one nation in particular, but against general idea of all nations". জাতীয়তাবাদের সংকট দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতার প্রসার। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, ব্যক্তি পরিবারের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, পরিবার স্বার্থত্যাগ করে গ্রামের জন্য, গ্রাম স্বার্থত্যাগ করে জিলার জন্য, জিলা স্বার্থত্যাগ করে প্রদেশের জন্য, প্রদেশ স্বার্থত্যাগ করে জাতির জন্য এবং জাতি স্বার্থত্যাগ করে সকলের জন্য।[৩] আন্তর্জাতিকতার জন্য জাতিকেও স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

ম্যাটসিনির উদার জাতীয়তাবাদ এবং ফিকটের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ধারণা

জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি—জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা : (Value and Limitations of the ideal of Nationalism—Ideal of Nationalism and civilisation) : জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism),

১। "Out of Renaissance Sovereignty combined with Revolutionary Rights comes Nationalism."—C. D Burns.

২। "Mazzini thought, 'each nation possessed certain talents which, taken together, formed the wealth of the human race' " ! Lloyd : *Democracy and Its Rivals* ; and Mazzini : The Duties of Man.

৩। "The individual, being pure, sacrifices for the family, the latter for the village, the village for the district, the district for the province, the province for the nation, the nation for all." —Mahatma Gandhi—*Young India*.

যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে - 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও'। নিজে বাঁচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথবা কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে।[১] যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়।[২] প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক এবং আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক। জিমার্নের ভাষায় "Nationalism is a highway to internationalism." প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রধান গুণ হইল ইহা একদিকে বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে ও উন্নত করিতে অনুপ্রাণিত করে, অপরদিকে ইহা একটি

জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক

আদর্শ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

আদর্শ জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক

১। "The world has become so interdependent that an unfettered will of a state may be fatal to the peace of other States"—Laski—Introduction to Politics—Chapter-4.

২। এ ক্ষেত্রে বার্নস্ (Burns) বলেন, "The value of Nationalism, so far as it implies a relation of one nation to the other is but a fuller development of the same value as that which each finds in independence. For if each nation is to develop its own characteristics, then each nation is valuable to every other not as a rival of exactly the same kind but as a contrast; and humanity at large is benefited by the preservation of so many distinct types."

—Burns—Political Ideals, Chapter on Nationalism p. 164.

জাতিকে অপর জাতির সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিয়া অপর জাতির যাহা কিছু ভাল ও সুন্দর তাহা উপলব্ধি করিতে উৎসাহিত করে। ইহাতে একটি জাতি অপর জাতির প্রতিযোগী হয় না। বরং একটি জাতি অপর জাতির নিকট নিজেকে মূল্যবান রূপে পরিণত করে। ইহাতে সমগ্র মানব জাতি উন্নত হয়।

আদর্শ জাতীয়তাবাদ কোন অবস্থায়ই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নয়। ম্যাটসিনি ইটালীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান হোতা ছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতীয়তাবাদের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার মূল বিষয় ইটালীর শ্রেষ্ঠত্ব হইলেও উহা অন্যান্য জাতির সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পরিপন্থী নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়া বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে কোন জাতিকে ইহার স্বাতন্ত্র্য অথবা জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দিতে হইবে। বরং একটি জাতি যদি অপর জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় জাতিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নত হয়।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই আদর্শের একটি ত্রুটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তা-

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে

বোধের বিকৃত (perverted) বিকাশ দেখিতে পাই। সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্য-বাদের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[১] বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক।[২] জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তা-বাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের

১। "As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism".

২। এই ক্ষেত্রে হায়েস বলেন, "It is doubtful whether recasting of political geography on national lines has actually promoted either humanity or justice and whether nationalism is a reliable harbinger of a quieter and better world in the immediate future."

—Hayes, "Nationalism" Encyclopaedia of Social Sciences XI.

প্রথম পর্যায় হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর ক্রমশঃ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে।" অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলি বিক্রয়করণের জন্য অথবা শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক সত্ত্বেরও অবতারণা করে,—যেমন, দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের উন্নত করা, ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তাবোধ এবং সাম্রাজ্যবাধ কখনই আন্তর্জাতিক অনুশাসনের সহিত সুসমঞ্জস নহে। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতে হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইহা একটি ত্রুটি। যদি "একজাতি একরাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-States) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের আশংকা থাকে।[১] জাতীয়তাবাদের ভিতরেই ইহার বিনাশের বীজ নিহিত থাকে। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন যে ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির প্রতি বাধ্য-বাধকতা কিংবা আন্তর্জাতিক আইন পালন করিবার যৌক্তিকতার কথাও বিস্মৃত হয়। নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাখিবার জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ভাল হউক তাহা চাহে না এবং প্রয়োজন হইলে অপর জাতিকে নিজের পদানত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত

বিকৃত জাতীয়তাবাদ দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ করিতে প্রণোদিত করে

বিকৃত জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে ক্ষতিকর

১। অধ্যাপক লাস্কি জাতীয়তাবাদের এই অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "the scale of modern civilisation has made the national and sovereign state an institutional expedient of which the political unwisdom and moral danger are both manifest."

জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে। তাহা ছাড়াও যদি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি বহু জাতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুন পাঠান-মোগল এক দেশে লীন হইয়াছে। কিন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক

আন্তর্জাতিকতা (**Internationalism**): আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক্ আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় যদি জাতীয়জীবন হইতেও পরবিদ্বেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর লিপ্সা দূর করা যায় তবে আর কখনই আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং কলহের সম্ভাবনা থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতি-জাতীয় আন্দোলন (Super-national Movement) সমর্থন করেন। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন পৃথিবীতে যতক্ষণ পরস্পর বিবদমান ও প্রতিযোগী জাতি-রাষ্ট্র থাকিবে ততক্ষণ সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।[১] অতি-জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন আন্তর্জাতিকতা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করা। জাতিরাষ্ট্রের পতনের উল্লেখ করিয়া লিপসন যথার্থই বলিয়াছেন, "If the nation-state floated into history on the wave of sea power,

১। "A world of competing nation-states, each of which is a law unto itself, produces a civilisation incapable of survival."

Laski :—*The Danger of Being a Gentleman.* P. 81.

it sank under assault from the air."[১] যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয় তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষ অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের (Family of Nations) সদস্য হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,—তাহা হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি।

আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ

আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। অতি-জাতীয় আন্দোলন (Super-national Movement, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘ যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হইলে অতি-জাতীয় আন্দোলন এতদিনে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত এবং ইহাতে আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইত। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় আন্তর্জাতিকতার সহযোগিতা প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক।

আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছা প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে

১। Lipson—*The Great Issues of Politics* P, 31.

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের উপযোগিতা

আন্তর্জাতিকতা সম্প্রসারণের প্রধান উপযোগিতা হইতেছে এই যে ইহার ফলে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিকতা যতই সম্প্রসারিত হইবে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলি ততই পরস্পরের নিকটতর হইবে এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হইবে। ইহার ফলে শুধু যে বিশ্বশান্তি সুরক্ষিত থাকিবে তাহাই নহে ; বিভিন্ন জাতি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা হইতে উপকৃত হইবে। একটি জাতি অপর জাতির উন্নতিকে তখন বিদ্বেষের চোখে না দেখিয়া প্রীতির চোখে দেখিবে। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগের, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (Economic and Social Council) বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ হইতেই আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারি। আণবিক শক্তির অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির সদিচ্ছার সম্প্রসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন এবং এইজন্য আন্তর্জাতিকতার উপযোগিতা খুবই বেশী।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় জনসমাজ, জাতি, ও রাষ্ট্র—জাতীয় জনসমাজের নিম্নলিখিত উপাদান থাকে ;—বংশের ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, এবং ভৌগোলিক ঐক—কিন্তু জাতীয় জনসমাজের পক্ষে এইগুলি হইতেছে বাহ্যিক উপাদান ; ইহাদের কোনটিই অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যদি জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবগত ঐক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়।

আমরা একটি জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই,—(১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অথবা ভৌগোলিক ঐক্য, (২) একটি জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং আচার-ব্যবহারগত ঐক্য থাকে, (৩) একটি সরকার যাহা স্বাধীন হইতে পারে অথবা স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবে। কিন্তু, জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। যদি কোনও জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তবেই ইহা রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি—প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ন রাখিতে। গত শতাব্দীতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" সমর্থন করিয়াছিলেন। মিলের মতে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার স্বার্থেই 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি গ্রহণ করা উচিত।

একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (Mono-national State) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টি'কিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার মতে অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। যদি অনেকগুলি জাত লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে, তবে ,সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

'এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতির বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানো যাইতে পাবে। (১) অ্যাক্টনের (Acton) মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলি উন্নত হয়। (২) বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। (৩) আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মধ্যে এক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। (৪) আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকর করিলে অনেক রাষ্ট্রেই বর্তমান কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। (৫) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে কোন জাতি আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট জাতিগুলি নিজেরা রাষ্ট্র গঠন করিয়া বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। (৬) জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি একবার কার্যকর করিতে আরম্ভ করিলে কোনদিনই ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ইহাতে ছোট ছোট অসংখ্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। (৭) অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

তবে পরিশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত, কোন কোন ক্ষেত্রে জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদিও সবক্ষেত্রেই জাতিতত্ত্ব রাষ্ট্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of Nationalities): একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। (খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষা রক্ষার অধিকার। (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (Right to retention of local laws and

customs) প্রদান করা উচিত। (ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and political equality) থাকা উচিত।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) : আন্তর্জাতিকতাও শুধু মাত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্বে (Universal brotherhood) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই, —তাহা হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্বরূপ জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় সমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিতে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না।

Exercise

1. Define People and Nationality. What are the basic elements of Nationality ? Is everyone of them absolutely essential ?

[জনসমাজ এবং জাতীয় জনসমাজের সংজ্ঞা প্রদান কর। জাতীয় জনসমাজের মূল উপাদান কি কি ? ইহাদের প্রত্যেকটি কি অপরিহার্য ?] (১৯২-১৯৫ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors that create a sense of unity in a State.

[কোন রাষ্ট্রে ঐক্যবোধের সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি আলোচনা কর।] (১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা)

3. What are the factors that tend to create a Nationality ? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities ? (C. U. 1954' '54)

[জাতীয় জনসমাজ গঠনকারী উপাদানগুলি কি কি ? বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ সম্পন্ন দেশে কিভাবে একটি জাতির সৃষ্টি হয় ?] (১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between (a) Nationality, (b) Nation and (c) State.

[(ক) জাতীয় জনসমাজ, (খ) জাতি ও (গ) রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।]
(১৯৩ পৃষ্ঠা ; ১৯৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the value and limitations of the doctrine of Self-determination as a political principle.

[রাষ্ট্রনৈতিক নীতি হিসাবে আত্মনির্ধারনের অধিকার নীতিটির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।] (১৯৬-২০১ পৃষ্ঠা)

6. "Self-determination is not a mere idle phrase. It is an imperative principle to action which statesmen will henceforth ignore at their peril."—
—Examine the statement.

["আত্মনির্ধারণের অধিকার নিছক অলস বাক্য নয়, ইহা এমনই একটি পালনীয় কাজের নীতি যাহা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদের বিনিময়ে উপেক্ষা করিতে পারেন" এই উক্তিটি পরীক্ষা কর।]
(১৯৯-২০১ পৃষ্ঠা)

7. Examine the theory of "One Nation, One State." Do you think that the theory of Nationality is a retrograde step in history ?"

["এক জাতি, এক রাষ্ট্র"নীতি পরীক্ষা কর। তুমি কি মনে কর জাতীয় জনসমাজের তত্ত্ব ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ। জাতীয় জনসমাজ কি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে। (১৯৬-২০১ পৃষ্ঠা)

8. What are the rights of Nationalities ?

[জাতীয় জনসমাজের অধিকার কি কি ?] (২০১-২০২ পৃষ্ঠা)

9. What are the essential elements of Nationality ? Can Nationality act as a basis of statehood ? Give reasons for your answer.
(C. U, B. A. Part I, 1967)

[জাতীয় জনসমাজের প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি ? জাতীয় জনসমাজ কি ? রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তিপ্রদান কর।]
(১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা : ১৯৬-২০১ পৃষ্ঠা)

10. Do you think that Nationalism is incompatible with an international order ? Give reasons for your answer. Write a note on "Internationalism."

[তুমি কি মনে কর জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন ? তোমার উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দেখাও। আন্তর্জাতিকতার উপর একটি টীকা লিখ।] (২০৩-২০৯ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the problem of Nationalism vs. Internationalism.
(C. U. B. A. Part I 1962)

[জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতার সমস্যাটি আলোচনা কর।] (২০৩-২০৯ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the basis and utility of Internationalism as a political ideal.
(C. U. B. A. Part I, Old Regulation 1966).

[রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি এবং উপযোগিতা আলোচনা কর]
(২০৭-২০৯ পৃষ্ঠা)

14. Explain the meanings of Nation, Nationality and Nationalism. Is Nationality a satisfactory basis of modern States ? (C. U. B. A. Part I. 1965)

[জাতি, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতীয়তাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা কর। জাতীয় জনসমাজ কি আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সন্তোষজনক ভিত্তি।] (১৯৩ পৃষ্ঠা : ১৯৫-২০১ পৃষ্ঠা)

15. Should boundaries of State coincide with the boundaries of Nationalities ? Give reasons for your answer.
(C. U. B. A. Part I, 1966 B. B. U. Part I, 1965)

[কোন রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া উচিত। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।] (১৯৬-২০১ পৃষ্ঠা)

16. Define Nationalism. Is Nationalism a menace to Civilization ? Give reasons for your answer. (B. U. B. A. Part I 1963)

[জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা প্রদান কর। জাতীয়তাবাদ কি সভ্যতার প্রতিবন্ধক ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।] (১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা : ২০৩-২০৯ পৃষ্ঠা)

(এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমে দেখাইতে হইবে কেন অনেকে মনে করেন যে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রথমে জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপটি আলোচনা করিতে হইবে। উহার পর দেখাইতে হইবে যে জাতীয়তাবাদ সর্বদাই যে আক্রমণাত্মক অথবা বিকৃতরূপসম্পন্ন হইবে, তাহা নহে। ইহার একটি ভাল দিকও আছে এবং সেইদিক হইতে ইহা আন্তর্জাতিকতার সম্প্রসারণের পক্ষে সহায়ক ; ইহাই হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ।)

17. "Nationalism is a perverted ideal"—Discuss. [B. U. (M) 1965]

["জাতীয়তাবাদ একটি বিকৃত আদর্শ" (উক্তিটি আলোচনা কর।] (২০৫-২০৭ পৃষ্ঠা)

18. Attempt an evaluation of internationalism as a political ideal. (C. U. B. A. 1964)

[আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতার মূল্যায়ন কর।] (২০৭-২০৯ পৃষ্ঠা)

19. What do you mean by the right of self-determination of a nation ? Is it a desirable ideal ? Give reasons for your answer.

[জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার' বলিতে তুমি কি বুঝ ? ইহা কি একটি বাঞ্ছনীয় আদর্শ ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

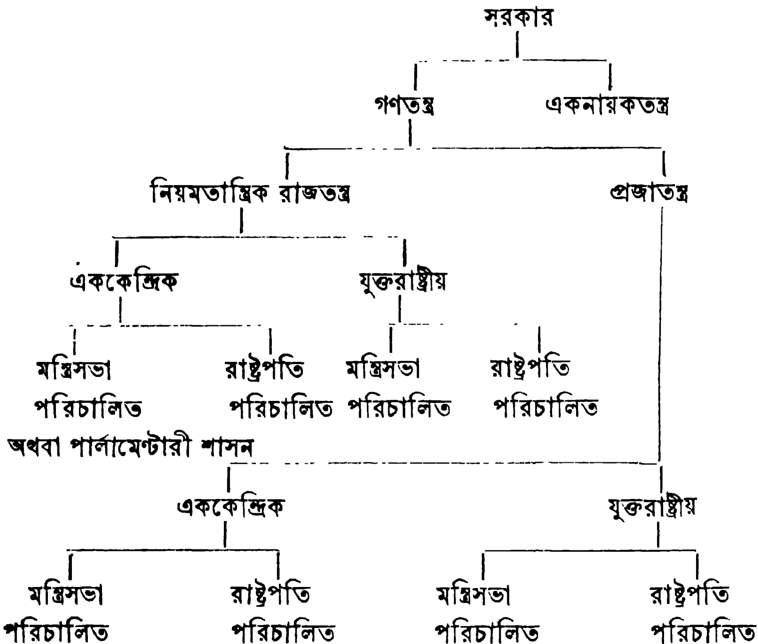
একাদশ অধ্যায়

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Governments)

এরিস্টটল কর্তৃক শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's Classification of States) : গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটল (১) সংখ্যা নীতি এবং (২) উদ্দেশ্য ও নীতি (Teleology) অনুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। সংখ্যানীতি অনুযায়ী এরিস্টটল বিচার করিয়াছিলেন কয়জন ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থা নির্ধারণ করা এই নীতির লক্ষ্য। সংখ্যানীতি অনুযায়ী এরিস্টটল রাষ্ট্রগুলিকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র দুই প্রকারের হইতে পারে,—স্বাভাবিক (normal) অথবা বিকৃত (Perverted)। যে সকল রাষ্ট্র জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক রাষ্ট্র আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে। কোন দেশে অবশ্য যুগপৎ দুইপ্রকারের সরকার রহিয়াছে ; যেমন ভারতের ক্ষেত্রে হইয়াছে। রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক

সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) অথবা এককেন্দ্রিক (Unitary) হইতে পারে। ডক্টর লিকক্ (Dr. Leacock) নিম্নলিখিতভাবে আধুনিক সরকারগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—



লিককের শ্রেণীবিভাগের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আমরা যাহাকে একনায়কতন্ত্র বলি তাহাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া একনায়কের আবির্ভাব সামরিক ইতিহাসে বিরল নয়। তাহা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) দেখিতে পাই যদিও বস্তুতঃ ইহা কমিউনিষ্ট দলের একনায়কতন্ত্র। লিকক সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় এই জিনিসগুলি বিবেচনাকরেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজনের শাসন বা অভিজাততন্ত্রের উল্লেখ লিককের শ্রেণী-বিভাগে দেখা যায় না। যদিও লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগের একটি বিচ্যুতি আছে, তবুও আধুনিককালে লীকক কর্তৃক অনুসৃত সরকারের শ্রেণীবিভাগই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগে মূলতঃ তিনটি নীতি অনুসৃত হয়। গেটেলের

লিককের শ্রেণী-বিভাগের ত্রুটি

মতে এই তিনটি নীতি হইল,—(১) সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্যা নির্ণয় করা, (২) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিশেষতঃ, শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন বিবেচনা করা।

আধুনিক শ্রেণী-বিভাগের নীতি

প্রথম নীতি অনুযায়ী সরকারকে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী সরকারকে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। তৃতীয় নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়। ইহাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে পারে। যেমন ভারতের শাসনব্যবস্থায় আমরা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং মন্ত্রিসভা চালিত সরকার দেখিতে পাই।

রাজতন্ত্র (Monarchy) রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন "I am the State" তাঁহাকে "Grand Monarch" বলা হইত। আজকাল চরম রাজতন্ত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবে সৌদী আরব. ইথিওপিয়া, নেপাল, ভুটান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী। ১৯৫০ সালের আগেও মিশরের রাজা ফারুক অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে চরম রাজতন্ত্র ইতিহাসের ঘটনা হইয়া দাড়াইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই বর্তমানকালে বিশেষভাবে দেখা যায়; ইংলণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহার ঐতিহাসিক রূপ। রাষ্ট্র বিবর্তনের আদি যুগে চরম রাজতন্ত্রই ছিল সরকারের একমাত্র রূপ। জাতীয় রাজতন্ত্রের (National Monarchy) সমর্থনেই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহার পিছনে ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে এই শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠনের সরলতা, শাসনকাজে ঐক্য, রাজার দল-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গুণাবলীর জন্য চরম রাজতন্ত্র এখনও উপযোগিতা হারায় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল এই যে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব চলিতে থাকায় একজন ভাল রাজার উত্তরাধিকারীও যে ভাল রাজা হইবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। চরম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পরিপন্থী। কারণ, চরম রাজতন্ত্র যদি স্বেচ্ছাচারিতার রূপ গ্রহণ

চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি, ইহার ঐতিহাসিক সমর্থন এবং আধুনিককালে ইহার উপকারিতা

করে তবে দেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইতিহাসে এই জাতীয় বহু নজির আছে। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে রাজতন্ত্র কখনই সমর্থনযোগ্য নহে, গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা সেই ক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য রাজা যদি ভাল লোক অথবা ভাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে ;— যেমন প্রশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ এবং অষ্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় যোসেপ (Joshep II) কল্যাণকারক স্বৈরতন্ত্র (Benevolent Despotism) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চরম রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের সরকার ; শুধু রাজতন্ত্রই নহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে,

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সর্বদা সমর্থনযোগ্য নহে

ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয়।[১] নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবহৃত হয়। নিয়মপ্রতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সরকারের যতই সংস্কার করা হউক না কেন, সরকার মূলতঃ রাজতন্ত্রই থাকিয়া যায়। যদি জনমতের সমর্থন না পাওয়া যায় অথবা জনগণ যদি অংশ গ্রহণ না করে, কোন প্রকার সংস্কারই ভাল ফল দিতে পারে না। তাহা ছাড়া, রাজতন্ত্র যে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজতন্ত্রে প্রত্যেক রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কখনই সক্রিয় নহে। কারণ এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। রাজা শুধু একজন "আড়ম্বরপূর্ণ সাক্ষীগোপালের" (magnificent cipher) ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। ("He reigns, but does not govern.")

অভিজাততন্ত্র (**Aristocracy**)—গ্রীক ভাষায় 'aristos' কথাটির অর্থ হইতেছে "সর্বশ্রেষ্ঠ"। দেশের শাসনব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন থাকে তখনই তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। গুণী ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ অল্প থাকে ; সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে শাসকের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু যখনই এই ধরণের সরকারে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তখনই ইহা ধনিকতন্ত্রে (oligarchy) পরিণত হয়। এই অর্থে সকল সরকারই অল্পবিস্তর অভিজাততান্ত্রিক। আধুনিক পার্লামেণ্টারী শাসনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীই সরকারকে পরিচালনা করেন।

অভিজাততন্ত্রের পক্ষে যুক্তি

অভিজাততন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে সরকারের স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বজায় থাকে। এই জাতীয় সরকারে গণতন্ত্রের আবেগ থাকে না বলিয়া ইহা

১। "Good government is no substitute for self-government."

সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র সর্বদাই বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিহার করিয়া চলে।

অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে ইহা যেহেতু জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেইজন্য ইহা কখনও কাম্য নয়। আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণ কখনই নিজেদের মূর্খ মনে করে না। তাহার নিজেদের শাসনব্যবস্থার রূপ কি প্রকার হইবে, তাহা নিজেরাই স্থির করিতে চায়। এককথায় গণতন্ত্রের সমর্থকগণ কখনই এই ধরণের সরকার গ্রহণ করিতে রাজী থাকেন না। ক্ষমতার লোভে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাসক প্রায়ই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। অভিজাততন্ত্রের প্রায়ই বিকৃতরূপ ধারণ করার আশঙ্কা থাকে।

ইহা জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল নয়

যাঁহারা মনে করেন অভিজাততন্ত্রে সুদক্ষ শাসকগণই দেশ শাসন করেন না, তাঁহারা ইহা বুঝাইতে পারেন না যে কিভাবে অল্পসংখ্যক শাসক নির্বাচিত হইবেন। জনসাধারণ নিজেরাই যদি শাসক নির্বাচন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে তবে তাহারা নিজেরাও শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এক দিক হইতে বিবেচনা করিলে অভিজাততন্ত্র অযৌক্তিক।

ইহা অযৌক্তিক

এই শাসনব্যবস্থার চতুর্থ ত্রুটি হইতেছে, ইহাতে জনসাধারণ শাসনকাজে অংশগ্রহণ করিবার এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায় না। তাহা ছাড়া, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সন্ধান লাভ করাও খুবই কঠিন। সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে সরকার যে সর্বদাই খুব ভাল হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু, যদি প্রকৃতই সৎশাসক দেশে বিরল না হয়, তবে অভিজাততন্ত্র যে একটি উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থা সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাসনব্যবস্থা শাসকের সংখ্যার উপরে নহে, গুণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে। এই শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের উন্মাদনা এবং অবাধ রাজতন্ত্র প্রসূত স্বৈরাচারের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করে। মণ্টেস্কুর (Montesquieu) মতে "The very soul of it is moderation founded on virtue" আধুনিককালে অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই; অভিজাততন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গণতন্ত্র। কিন্তু, একথা ঠিক, তথাকথিত গণতন্ত্রে যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মন্ত্রী দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, সেখানে অভিজাততন্ত্রের বেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ইহা প্রগতির অন্তরায়

গণতন্ত্রের অর্থ (Meaning of Democracy): গণতান্ত্রিক সরকার ও 'গণতন্ত্র' বলিতে একই জিনিস বুঝায় না। 'গণতন্ত্র' হইতেছে একটি আদর্শ। আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক। আবার গণতন্ত্র

শব্দটির দ্বারা বিশেষ একটি সমাজব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা একটি শাসনব্যবস্থা বুঝাইতে পারে।

গণতন্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার। গ্রীক শব্দ "Demos" হইতে Democracy" কথাটি আসিয়াছে। "Demos" কথাটির অর্থ হইল, জনসমূহ। সেইজন্য গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' ("Government of the People, by the People and for the People,") কিন্তু, গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তানায়ক বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ হইবার ফলে, গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট এবং সার্থক ধারণা রহিয়া গিয়াছে। ম্যাবট (Mabbot) তাঁহার "The State and the Citizen" বইয়ে গণতন্ত্রকে "The most elusive and antiguous of all political terms" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক আদর্শ

গণতন্ত্রের আদর্শ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। মূলতঃ ইহা একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। কিন্তু ইহার সামাজিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করে। ইহার মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারেরও একটি বিশেষ স্থান আছে কিন্তু, শুধু গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে গণতন্ত্রের সব দিক বুঝায় না;—ইহা গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে জড়িত, আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র আরও ব্যাপক। সিলির (Seely) মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেরই একটি অংশ আছে।[১] ডাইসির (Dicey) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ।[২] লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না,—ইহা দেওয়া হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের সদস্যদের।[৩] উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করে। কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু একপ্রকার সরকার নয়,—ইহা একটি বিশেষ ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা। গণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ ব্যবস্থাকেও গঠন করিতে পারে।

১। "...a government in which everyone has share." —Seely

২। "...one in which the governing body is a comparatively large fraction of the total population." —Dicey

৩। "...a form of government in which the ruling power is largely vested not in any one particular class or classes but in the members of the community as a whole."—Bryce

গণতান্ত্রিক শাসনকে বলা হয় জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা শাসন এবং জনগণের জন্য শাসন (Government of the people, by the people and for the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে সুইজির (Sweezy) মতে বুঝায় (১) জনগণই সরকারের উৎস এবং (২) সরকারকে জনগণ হইতে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে জনগণের আনুগত্য (obedience) বুঝায় না। গণতন্ত্র হইতেছে 'জনগণের দ্বারা শাসন'। এই কথাটির তাৎপর্য হইতেছে এই যে—গণতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডাইসির মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ। অবশ্য বাস্তব জীবনে গণতন্ত্র হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল তাৎপর্য হইতেছে এই যে ইহা জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল। জনগণের প্রত্যেকের অধিকার থাকে সরকারের ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করার, এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর। 'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের জন্য' কথাটির অর্থ অনুযায়ী এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা,—ব্যক্তিবিশেষের অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের স্বার্থসিদ্ধি করা নহে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তাৎপর্য

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (direct democracy) ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার

গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

সকলকেই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে নাগরিকদের কর্ম-নৈপুণ্যের বৈষম্য যথাযথ ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়।

বার্ণসের (Burns) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত সমাজ নয়,—গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী,—যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজে অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।[১] সমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই সমান অধিকার।

বার্ণস্ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও তাৎপর্য বুঝিতে পারি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না, অথবা তাহাদের মধ্যে সেইজন্য সুযোগ সুবিধার তারতম্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার তারতম্য করা হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার, ইত্যাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরি-চালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়াসে (free private enterprise) কোনপ্রকার গোলযোগ অথবা শিল্প বিরোধের (industrial disputes) কারণগুলি দূর করা যায়। কোন কোন চিন্তানায়কের মতে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) পরস্পর-বিরোধী কর্মসূচী। অষ্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক হায়েক (Prof Hayek) বলেন, "Economic planning is a road to serfdom". কিন্তু ভারতবর্ষে গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) চালু করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, ইহা সফল হইবে। এই তিন প্রকার গণতন্ত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য

১। "...a society, not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."—Burns

জোয়াডের (Joad) মতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কখনই সফল হয় না।

গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা, নৈতিক ধারণা ও সামাজিক অবস্থা

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা (a political status), একটি নৈতিক ধারণা (an ethical concept) এবং একটি সামাজিক অবস্থা (a social condition)। রাজনৈতিক মর্যাদা বলিতে বুঝায় যে গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিলে সব সরকারকেই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। সাম্য হইতেছে গণতন্ত্রের ভিত্তি ; তবে সেই সাম্য রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক সাম্য হইবে ; অর্থনৈতিক সাম্য নহে। গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণ হইতে মুক্তি ; কিন্তু ইহাতে অর্থনৈতিক সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

নৈতিক ধারণা হিসাবে গণতন্ত্র একটি মহান আদর্শের ধারক ও বাহক। সব মানুষই সমান এবং প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। একক স্বার্থে কেহ চলিতে পারে না। এই নৈতিক ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি বিশেষ রূপ।

সামাজিক অবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। সামাজিক বৈষম্য গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী। গণতন্ত্রে সব লোকেরই সমান অধিকার, কিন্তু সেইজন্য প্রত্যেকেই সমান নহে—প্রত্যেককে সমান অধিকার প্রদান করিয়া যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুঁজিয়া লওয়া হয়।[১] তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া সরকারকে কাজ করিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য "সকলের তরে সকলে আমরা" এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। সরকার যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত হয়।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Democracy)

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল

প্রাচীনকালে আমরা গ্রীক শহরগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) দেখিতে পাইতাম। নির্দিষ্ট সময়ে নাগরিকগণ কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া

আর যে সকল সরকার শুধু শাসন পরিচালকদের নিজেদের স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, সেইগুলিকে এরিস্টটল বিকৃত আখ্যা দিয়াছিলেন।

১। "Democracy in practice is the hypothesis that all men are equal which is used in order to discover who are the best." —C. D. Burns.

নিম্নলিখিতভাবে এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো যাইতে পারে :

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচার (Tyranny)
অল্প কতিপয় ব্যক্তি	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
বহু ব্যক্তি	গণতন্ত্র (Polity)	বিকৃত গণতন্ত্র (Democracy)

এরিস্টটলের মতে শাসন-পরিচালকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। কিন্তু, আমরা রাষ্ট্রের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, শুধু শাসন-পরিচালকের সংখ্যানুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এযুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক অথবা অল্প কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি থাকা অবশ্য অবাঞ্ছনীয় নয়। তবে ইহাও ঠিক যে আধুনিককালে তত্ত্বগতভাবে সকল রাষ্ট্রই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত থাকে। এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ সংখ্যানীতি এবং উদ্দেশ্য নীতির উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু, ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করে নাই। এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান সম্মত নহে। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কোন রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচার করেন।

এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে

তৃতীয়তঃ, সিলি বলেন, এরিস্টটল শুধু শহর-রাষ্ট্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রাচীনকালের শহর-রাষ্ট্রগুলি বর্তমানকালের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি হইতে অনেক স্বতন্ত্র ছিল। সুতরাং শহর-রাষ্ট্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের তথা সরকারের শ্রেণীবিভাগ বর্তমান কালের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই যুক্তির পক্ষে C. F. Strong বলেন, 'রাজতন্ত্র' বলিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বুঝায় কিনা এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ হইতে তাহা প্রতীয়মান হয় না। আধুনিক যুগে অধিকাংশ সরকারই মিশ্রভাবে গঠিত এবং ইহা এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ দ্বারা বুঝানো যায় না। অনুরূপভাবে গণতন্ত্র বলিতে আমরা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার বুঝিতে পারি, রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারও বুঝিতে পারি।

এই শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগে অচল

চতুর্থতঃ, এরিস্টটল প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখান নাই। এই শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে সরকারের শ্রেণীবিভাগ। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং আইনগত প্রকৃতি সরকারের কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সরকারের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই সরকারের সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে।[১]

এই শ্রেণীবিভাগ রাষ্ট্রের নহে, সরকারের

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (**Classification of Governments**) **ঃ** সরকারের যে আধুনিক শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখি তাহাকে বিশেষভাবে রূপায়িত করিয়াছেন ম্যারিয়ট(I.A.R—Marriot) এবং ডক্টর লিকক (Dr. Leacock)। ম্যারিয়ট মনে করেন, এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ মৌলিক হইলেও বর্তমান যুগের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ। সেইজন্য তিনি তাঁহার শ্রেণীবিভাগকে শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের (Territorial Distribution) উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই নীতি অনুযায়ী সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন ছাড়াও অপর একটি নীতির উপরেও ম্যারিয়ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক। এই দ্বিতীয় নীতিটি অনুযায়ী সরকারকে পার্লামেণ্টারী অথবা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগে ম্যারিয়ট কর্তৃক অনুসৃত দুইটি নীতি

ডক্টর লিকক সরকারের সাম্প্রতিক রূপের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাগের সহিত লিকক যে শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার সাদৃশ্য আছে। তিনি প্রথমে গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচার অথবা একনায়কতন্ত্রের (Despotism or Dictatorship) মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। গণতান্ত্রিক আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

লিককের শ্রেণীবিভাগ নীতি

আধুনিককালে আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাই :— (ক) রাজতন্ত্র (Monarchy), (খ) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), (গ) গণতন্ত্র (Democracy), (ঘ) একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং (ঙ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ (Direct); কিন্তু বর্তমানে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই।

গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে,—ইহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত একটি

১। "The essential characteristic of the state is its political and legal nature. This is manifested in its governmental organization ; hence the most satisfactory classification is based on the similarities and differences of governmental forms."

আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজগুলি সম্পাদন করিত এবং মাঝে মাঝে বিচারবিভাগীয় কাজও তাহারা সম্পাদন করিতও প্রাচীন গ্রীসে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসন করিবার কোন প্রথা প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলিতে (City States) যাহা সম্ভবপর হইত, বর্তমান কালে বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকার ছাড়া বর্তমান পৃথীবীতে অন্যত্র কোথাও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দেখা যায় না।

পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে গণতন্ত্রে সমগ্র জনসংখ্যা অথবা ইহার একটি অতি বৃহৎ অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে।[১] জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যে সর্বদাই জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করে তাহা নহে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ কবিতে হইলে জনসাধারণকে পরবর্তী নির্বাচন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

আগেই বলা হইয়াছে আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোট প্রদান করিয়া আইনসভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভাকে ইহার কাজের জন্য আইনসভার সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, কিন্তু জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠিত হয়। সেই আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, সরকারের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

কোনও রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্রিক কিনা তাহা বিচার করিবার উপায় আছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীন মত প্রচারের, বিরোধী দল গঠনের এবং নাগরিকদের সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ যে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক

১। "......the whole people or some numerous portion of them exercise governing power through deputies periodically elected by themselves."

সরকারের পরিবর্তন করিতে পারে। গণতন্ত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) : গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum), পদচ্যুতি (Recall) এবং নির্বিশেষে গণভোট (Plebiscite) প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই ব্যবস্থাগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

গণভোট (Referendum) : গণভোট পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভা যদি কোনও আইন প্রণয়ন করে, তবে ইহা জনগণের অনুমোদনের জন্য ভোট-দাতাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা এই আইন অনুমোদন করে, তবেই ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণভোট অনেক সময়ে আবশ্যিক (compulsory) হয়; আবার কোন কোন সময় ইহা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক (optional) হয়। আবশ্যিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, এমনকি শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও জনগণের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। ঐচ্ছিক গণভোটে নির্বাচকদের অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ অংশ কোনও একটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্য দাবী জানাইলে, ইহা নির্বাচকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে সমুদয় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। আমেরিকার কতিপয় মূলরাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তনের সহিত জড়িত আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। ভারতবর্ষে দেশবিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের সীমান্তে অঞ্চলবিশেষের ভারত অথবা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণভোটের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

গণভোট আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক হইতে পারে

পদচ্যুতি (Recall) : কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদাতা-গণের নির্দেশ অমান্য করিয়া রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যান, তখন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার আগেই "পদচ্যুতির" সাহায্যে তাহাকে অপসারণ করা চলে।

পদচ্যুতি

গণ-উদ্যোগ (Initiaive)—গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটদাতা-গণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনও আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়া সেই খসড়া আইনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দিবার জন্য আইন-পরিষদের নিকট দাবী জানাইতে পারে। সুইস্ ক্যণ্টন-গুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন মূলরাষ্ট্রে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এবং

গণ-উদ্যোগ

আমেরিকার মূলরাষ্ট্রগুলিতে শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বিল গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আইন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে।

নির্বিশেষ গণভোট (Plebiscite): গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির জন্য আজকাল অনেক রাষ্ট্রে নির্বিশেষ গণভোট পদ্ধতির (Plebiscite) প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে শুধু তথাকথিত ভোটদাতাগণই নহে, জনসাধারণের সকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

নির্বিশেষ গণভোট

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Direct Democratic checks): গণভোট, পদচ্যুতি প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এবং ইহাতে প্রতিনিধি এবং নির্বাচকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করার সুযোগ জনসাধারণ পায়।

এই ব্যবস্থাগুলির পক্ষে যুক্তি

এই ব্যবস্থাগুলি সর্বদা অবলম্বিত হইলে আইনসভার ক্ষমতা ও উপযোগিতা বিশেষভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক বিষয়ই যদি গণভোটের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয় তবে আইনের স্থায়িত্ব এবং উপযোগিতা অথবা উদ্দেশ্য বহুলাংশে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান কালের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলি প্রযুক্ত করা সম্ভবপর নহে, এবং প্রযুক্ত করা উচিতও নহে। কারণ ইহাতে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইবে এবং প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে।

এই ব্যবস্থাগুলিব বিপক্ষে যুক্তি: ইহাতে আইনসভার উপযোগিতা নষ্ট হয়

তৃতীয়তঃ, বর্তমানকালে রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের জটিলতা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এইজন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী আইনের কাঠামো গঠন করা উচিত। এইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা অথবা সরকারের কার্যনীতি বিচার করা সর্বক্ষেত্রে সুফলদায়ক হয় না। সর্বশেষে, গণ-উদ্যোগ, গণভোট, পদচ্যুতি প্রভৃতি ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী দলগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের এই দোষগুলি থাকার দরুণ বর্তমানযুগে অধিকাংশ দেশেই ইহা অচল।

বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা প্রয়োগ করা কঠিন

ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের জটিলতা বাড়ে

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy): উদারনৈতিক গণতন্ত্র হইতেছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ। ১৭৭৬ সালে

আমেরিকা কর্তৃক "স্বাধীনতার ঘোষণায়" বলা হইয়াছিল যে সব মানুষই স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই স্বাধীনতার ভিত্তিতেই মানুষ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করে। জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ করার অধিকার মানুষ জন্ম হইতেই ভোগ করিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮) আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬) এবং ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সূচনা নির্দেশ করে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলনীতি হইতেছে ব্যক্তিস্বাধীনতা (Personal liberty), বিভিন্ন অধিকার (Rights) এবং শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার (Government based upon consent)। নাগরিক-জীবনের সমুদয় পৌর ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি, আইনের অনুশাসন মানিয়া চলা এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা করা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূলনীতি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক গণতন্ত্রেরও সংস্কার হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার স্থান অধিকার করিতেছে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তত্ত্বগত বিরোধ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রকে যথেষ্ট সংকুচিত করিয়াছে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)—গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান কারণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বদাই ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্ব না থাকিলে কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ইহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না

পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং জনগণের স্বার্থে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজন হইল একটি সদা সচেতন, সুশিক্ষিত এবং সুদৃঢ় জনমত।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। কোন সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবী করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন ব্যবস্থার জনসাধারণই সেইগুলি সংরক্ষণের জন্য সতর্ক থাকে।

জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য

গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয় এবং ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থা উন্নত হয়। হিত-বাদীদের (utilitarians) মতে এইজন্য গণতন্ত্রই হইতেছে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।

রাজনৈতিক শিক্ষা পূর্ণতা অর্জন করে

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে যদি গণতন্ত্রের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব নাগরিককেই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ সুদৃঢ় করিতে পারে। কোনও বিশেষ দল অথবা শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণতন্ত্রে কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর।

নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা অপরিহার্য

পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকারক। নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে গণতন্ত্রের বিশেষ শিক্ষামূলক মূল্য আছে। গণতন্ত্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি উন্নত করে, সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দেয় এবং শাসনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া স্বদেশপ্রেম বাড়াইয়া দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাভ করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিশেষভাবে সম্মানিত হয়,—কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়, ইহা তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে।[১] সব রকম সরকারই মানুষের শিক্ষার বাহক ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার হইতেছে নিজের পরিচালিত সরকার এবং তাহাই গণতন্ত্র।[২]

ইহা জনসাধারণের মানসিক উন্নতি অর্জনে সহায়ক

ষষ্ঠতঃ, গতিশীল সমাজের সহিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব

১। "The manhood of the individual is dignified by his political enfranchisement and he is usually raised to a higher level by the sense of duty which it throws upon him." —Lord Bryce.

২। "All government is a method of education, but the best education is self-education ; therefore, the best government is self-government which is democracy." —C. D. Burns.

বলিয়া গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে। কারণ, জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি এবং মন্ত্রিমণ্ডলী এবং সরকারী কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র। গণতন্ত্র দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধ গভীর করে। সেইজন্য গণতন্ত্রে আইন ও শৃংখলা বজায় থাকে। জনপ্রিয় সরকারে এমন ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশা আকাংখা সরকার জানিতে পারে এবং সেইভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। যদি কখনও সরকারের সহিত জনগণের মতভেদ হয় তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা সম্ভবপর। ইহাই জনপ্রিয় সরকারের সার্থকতা এবং এইজন্যই জনপ্রিয় সরকার হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিতে পারি। জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতার জন্যই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।[১]

গণতান্ত্রিক সরকারই সর্বাধিক জনপ্রিয় ইহা জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে

অধ্যাপক বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিযাছেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে গণতন্ত্রেই একমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[২] স্বাধীনতা (Liberty) সাম্য (Equality) এবং ন্যায়ের (Justice) আদর্শ কার্যকর করা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাহা অনুসরণ করা একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভবপর। বার্কার গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণের সর্ববিধ মানসিক উন্নতি সম্ভবপর। জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার "Representative Government" বইয়ে গণতন্ত্রের এই বিশেষ গুণটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits of Democracy) : গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহা অযোগ্যতার পরিচালনাধীন। ("Democracy is the cult of incompetence")। এরিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। Ausburg'-এর একটি রূপকচিত্রে গণতন্ত্রকে এক হল্লাকারী জনতা কর্তৃক পরিবৃত মাতাল, Cleon-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। Cleon ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের একজন জননেতা। এই চিত্রাঙ্কন খুবই

গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য এবং অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হয়

১। "The value of popular government is that it provides the means through which the wishes of the people may be known and felt, and that thus the conduct of a state may be brought into conformity thereto." —Gettell

২। এইক্ষেত্রে Henry B. Mayo-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য "It (democracy) is the system best able to produce justice."

—Henry B. Mayo : An Introduction to Democratic Theory

অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গণতন্ত্রে অনেক নাগরিকই সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে খুব বেশী উৎসাহ বোধ করে না। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়।[১] গণতন্ত্র যদি প্রকৃতই অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে ইহা জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থার অভাব সূচিত করে। কিন্তু এই সমালোচনা যে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। গণতন্ত্রের পরিচালনাভার বর্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত হয়। তাহারা প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহা নহে। যদি গণতন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে আমরা গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক,—প্রত্যেকেই যেখানে বিভিন্ন সমান অধিকার ভোগ করে, সেখানে যোগ্যতার সমাদর হইবেই। গণতন্ত্রের আর একটি দোষ হইতেছে, ইহা শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ মনে করেন, গণতন্ত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসাধারণের বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা গিয়াছে। স্যার হেনরী মেইন বলেন যে বিভিন্ন ধরনের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রই হইতেছে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল, দলাদলি পূর্ণ, এবং অসহনশীল এবং সমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন।[২]

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। গণতন্ত্র উৎকৃষ্টতর সরকার অথবা অধিকতর স্বাধীনতা কোনটিই প্রতিষ্ঠা করে না। ("Democracy insures neither better government, nor greater liberty")। গণতান্ত্রিক সরকারে অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গণতন্ত্রে সর্বদাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা) পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার্যকর করেন। আইনসভার ভিতরেও

১। "Democracy is a government by the poorest, the most ignorant, the most incapable, who are necessarily the most numerous." —Lecky

২। "...of all forms of government, democracy is the most intelligent and extravagant, the most factional and intolerant, the most hostile or indifferent to true progress." —Sir Henry Maine

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

দলপ্রথার জন্য ত্রুটি

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে শাসকগণ যে সর্বদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকেন তাহা নহে। যদিও শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা নিজের কাজের জন্য আইনসভার সদস্যগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও শুধু মাত্র দলীয় রাজনীতি-প্রসূত সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রিগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই দেন না। এই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভাব দেখা যায়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার দিকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আগ্রহ বেশী দেখা যায়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের জন্য অলীক স্বাধীনতায় পরিণত হয়। সাধারণ জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির দরকার, সাধারণ জনগণের তাহা নাই। তাহারা গতানুগতিকভাবে নিজেদের কাজ করিয়া যায়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার প্রয়াস তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

ইহা একটি রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থা

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক মেইন, লেকি প্রমুখ চিন্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। কলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রায়ই উদাসীন।[১] অর্থাৎ, ইহা হইতেছে একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা।

ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ অন্যান্য শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা নিম্নস্তরের সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠন করে। এই রকম বলা হয় যে সাধারণ লোকের ত্রুটিগুলি সমস্ত সামাজিক জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে।[২] গণতন্ত্রে সভ্যতার স্তর খুবই সাধারণ।

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয়-বাহুল্য খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয়

১। "Democracies are indifferent, if not hostile, to the growth of art, literature and science."

২। "Common man's defects corrupt all social life and destroy the excellences of the exceptional." —Burns.

সংকোচনের জন্য কেহই চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়মানুবর্তিতাও অল্প থাকে।

অষ্টমতঃ, অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার মূলতঃ ধনতান্ত্রিক। ইহা পুঁজিবাদের এবং কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য দেয়। কারণ, যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শাসক প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারকে পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহারা সর্বদাই নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে সমাজে রাষ্ট্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে,—সেই সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের কোনই সার্থকতা নাই। তাহা ছাড়া, শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথাটিও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। একজন লোক কখনই অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না।

কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য ও পুঁজিবাদের প্রশ্রয়

সবশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা (committee system) দেখিতে পাই। কোন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে। তাহাতে আইন প্রণীত হইতে যথেষ্ট দেরী হয় এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইহা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

আইন প্রণয়নে বিলম্ব

গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণতন্ত্রের সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। এখনও গণতন্ত্রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান আশানুরূপ উন্নত হয়না এবং গণতন্ত্র একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা,—একথা যে আদৌ ঠিক নয় তাহা বিশ্বের গণতন্ত্র দেশগুলির দিকে তাকাইলেই পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন দেশে (যেমন, মিশর, ইরাক ইত্যাদি) রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে ; অবশ্য ইহাদের সব রাষ্ট্রই যে গণতান্ত্রিক তাহা নহে। তবে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত, গণতন্ত্রের এই মূলনীতিকে সব রাষ্ট্রই সম্মান করে। তবুও একথা ঠিক, বর্তমানে বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নহে। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু কোন দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। প্রকৃতভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। জনসাধারণের যদি উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মোদ্যোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকে, তবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১]

১। **"It is the most rational in principle, but the most difficult in practice. Just as it seeks to achieve the greatest good, so it demands of the people the largest amount of intelligence, tact, initiative and political consciousness."**

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপায় (Conditions for the success of Democracy): জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, যদি গণতন্ত্রকে সফল করিতে হয় তবে "(১) জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে; (২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি রক্ষা করিতে হইবে।"

উপরোক্ত সর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত সর্তগুলি থাকা উচিত। প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে এবং সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা, এবং পরস্পরের প্রতি সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর অনুভূতি (feeling of fraternity) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহা সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

জনগণের সদা সতর্কতা

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। নাগরিকদের আলস্য এবং ঔদাসীনতা গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক। গণতন্ত্র নাগরিকদের নিকট হইতে সহিষ্ণুতাও দাবী করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে যদি সহনশীলতা না থাকে তবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানিয়া লইতে হইবে, সেই প্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভার সংখ্যাধিক্যের অভিমত অনুযায়ী প্রণীত আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন করা।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। জনসাধারণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলা উচিত এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। জনসাধারণের যাহা কিছু ভাল এবং সুন্দর তাহার যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয় সেইদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি না হইলে জনসাধারণ কখনই গণতন্ত্রের সাফল্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নেতাদের যেমন বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে এবং জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিবার জন্য তৎপর থাকিতে হইবে, নাগরিকদের এবং রাজনৈতিক দলগুলিরও সেই প্রকার আত্মসংযম (democratic self-control) বজায় রাখা দরকার। সরকারী কর্মচারীদেরও সৎ, সুদক্ষ ও উদ্যমশীল হওয়া দরকার ; তাহা না হইলে গণতান্ত্রিক সরকার কখনই সাফল্যজনকভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে না।

নেতাদের বিবেক সম্পন্ন ও নাগরিকদেরও সংযমী হওয়া প্রয়োজন

সর্বশেষে, গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণকে সুশিক্ষিত হইতে হইবে এবং সর্বপ্রকার অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। শিক্ষার সম্প্রসারণ না হইলে রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে না, এবং রাজনৈতিক চেতনা না বাড়িলে গণতন্ত্র কখনই সফল হয় না।

সুদক্ষ ও উদ্যমশীল কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy) : প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ এবং ইটালীতে নাৎসীবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন হইতেই সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারাইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদিও ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদের ধ্বংস হইয়াছে, তবুও যুদ্ধোত্তরকালে সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্য স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র টিঁকিয়া থাকিবে কিনা। তাহা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতেই জনস্বার্থের অনুকূল হওয়ায় সাধারণ মানুষেরও একনায়কতন্ত্রের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে ভাল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই যে চিরকাল টিঁকিয়া থাকিবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই বর্তমানে সকলে ধারণা করিতেছে।

কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে, একনায়কতন্ত্র একটি সাময়িক শাসন-ব্যবস্থা মাত্র। জার্মানী এবং ইটালিতে একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হয় নাই। গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে। কিন্তু, সেইগুলি অনতিক্রমণীয় নহে। গণতন্ত্রই হয়ত শ্রেষ্ঠ সরকার নহে। কিন্তু, অতীতের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের একটি স্থায়ী মূল্য আছে। আজ আমরা গণতন্ত্রের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাই, অতীতে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল।[১] একনায়কতন্ত্রে বাহিরের চাপে মানুষ পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ গণতন্ত্রে নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চলাফেরা করিবার সুযোগ পায়। গণতন্ত্র কখনই একনায়কতন্ত্রের বিকল্প সরকার নয়। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ভুল করিলেও নিজেই চলার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে তাহাকে চালনা করিতে হয় এবং তাহা করিবার দায়িত্ব

১। "In comparison with Governments in the past, Democracy has justified itself. Things may be bad to day ; but they were worse yesterday."

একনায়কের।[১] একনায়কতন্ত্রে শুধু যে ব্যক্তিস্বাধীনতাই ক্ষুণ্ণ হয় তাহা নহে, শাসকও ক্ষমতা মদে মত্ত হইয়া দেশের শাসনব্যবস্থাকে গলদে পূর্ণ করে। একনায়কের পক্ষে যে জনমত মানিয়া চলা কঠিন, এবং জনগণের আশা-আকাংখার যে কোন মূল্যাই একনায়কতন্ত্রে নাই তাহা বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবার পূর্বে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে আমরা দেখিয়াছিলাম। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিশ্বের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের মনে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিতে পাই, গণতন্ত্রের হয়ত সাময়িক বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার পুনরুজ্জীবনও ঘটিয়াছে। একনায়কতন্ত্রের যতই কর্মকুশলতা থাকুক না কেন, দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারই যে সকলের কাম্য, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একমাত্র সরকার ; সেজন্য গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার নহে। পূর্বে ধারণা ছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশ হইলেই একনায়কতন্ত্র অনুযায়ী সরকার গঠিত হইবে। কিন্তু, বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (democratic socialism) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজকাল গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র আজকাল একটি নৈতিক ধারণায় (ethical concept) পরিণত হইয়াছে। যাহা কিছু গণতান্ত্রিক তাহাই জনসাধারণ পরিত্যাগ করিতে চায়। সুতরাং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত নহে।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সংকট দেখা গিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে অধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক ন্যায়ের অভাব এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অভাব, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দলগুলিতে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা যায়। স্বভাবতঃই সেই দেশ সম্বন্ধে নিপীড়িত ও শোষিত সাধারণ মানুষের একটি আগ্রহ থাকে ; গণতন্ত্র যদি মানুষকে অর্থনৈতিক ন্যায় এবং শোষণ-মুক্তির আশ্বাস দিতে পারিত, তবে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ লইয়া কোন দুশ্চিন্তার কারণ হইত না।

এইক্ষেত্রে অধ্যাপক লাস্কির একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। লাস্কি বলেন, "গণতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত অর্থই হইতেছে এই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ইহা জনগণের সকল দাবী এক পর্যায়ে বিবেচনা করে। যে সমাজ অর্থ-নৈতিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে

১। "The common man in a Democracy may go wrong, but he goes ; that subservient in an authoritarian rule waits to be pushed."

না।"[১] গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয় তবে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ভাল গুণগুলির মধ্যে একটি সংমিশ্রণ হইতে পারে এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলিতেছে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সেই প্রচেষ্টার সহায়ক হইতেছে। এই "গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা" (Democratic Planning) এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" (Democratic Socialism) ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে অনেক উজ্জ্বল করিয়াছে। স্যামপিটারের (Schumpeter) মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতি আনুগত্য গণতন্ত্রে বিভেদের সৃষ্টি করে ; সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা আনুগত্য এই বিভেদ দূর করিতে পারে।[২] লয়েড বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্র মানুষের মনে এই বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিতেছে যে গণতন্ত্র হইতেছে এমনই একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে মানুষ অভাব এবং অত্যাচারের ভয় হইতে মুক্ত থাকিতে পারে এবং পুরুষ এবং নারী নিজেদের যাহা কিছু ভাল তাহা স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করিতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং গণতন্ত্র টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।[৩]

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে। স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানুষের কাছে গণতন্ত্রের একটি চিরন্তন আবেদন আছে। সাম্যনীতি, আইনসভার প্রাধান্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহ-অবস্থান, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা, চিন্তা করার, কথা বলার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং গণসার্বভৌমত্ব—গণতন্ত্রের এই মূলনীতিগুলির আবেদন মানুষের কাছে কোনদিনই নষ্ট হইবে না। অপরদিকে সমাজতন্ত্রেরও একটি বিশেষ আবেদন মানুষের কাছে চিরদিন আছে। জনগণের আনুগত্য আদায় করার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র অনেক সময়েই গণতন্ত্রের প্রতিযোগী। এইজন্য গণতন্ত্রকে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে সমাজতন্ত্রের সহিত সংমিশ্রিত হইতে হইবে, সমাজতন্ত্র কর্তৃক অতিক্রান্ত হইলে চলিবে না।[৪]

১। "The real meaning of democratic government is the equal weighing of individual claims to happiness by social institutions. A society built upon economic inequality cannot attempt that sort of measure." —Laski

২। "So many people have renounced and so many more are going to renounce allegiance to the standards of capitalist society and on this ground alone democracy is bound to work with increasing frictions. At the stage visualised, however, socialism may remove the rift."
—Schumpeter : Capitalism, Socialism and Democracy.

৩। "Unless Democracy justifies the belief that it is a form of government under which men may live out their lives free from fear of want and oppression, unless it gives every man and woman the opportunity to realise freely whatever good there is in them, it will not survive."
Lloyd : Democracy and its Rivals.

৪। "For its survival Democracy should be diluted with and not polluted by Socialism."

পরিশেষে বলিতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিকল্প এমন কোন সরকার খুজিয়া না পাওয়া যাইতেছে যাহা জনগণ সবদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি "ভাল সরকার স্বায়ত্ত সরকারের বিকল্প নহে" ("Good Government is no substitute for self-government"), ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের হাত হইতে সভ্যতাকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবে গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে।

একনায়কতন্ত্র (**Dictatorship**): একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। স্বৈরাচারের প্রথম রূপ দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু একনায়কতন্ত্র কথাটি তখন ব্যবহৃত হইত না। তখন 'স্বৈরাচার' ('Tyranny') কথাটি ব্যবহৃত হইত। একনায়ক বা ডিক্টেটর কথাটি রোমান শাসনতান্ত্রিক আইনে (Roman Constitutional Law) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাতন্ত্রী রোমে একনায়কতন্ত্র বলিতে বুঝাইত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা যাহা ভাবি তাহা প্রাচীনকালের রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের ধারণা হইতে পৃথক। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন বা অল্প কয়েকজন লোকের একচ্ছত্র শাসন যিনি বা যাঁহারা সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে বিনা বাধায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।[১] কিন্তু রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্র ছিল একটি সংকটকালীন শাসনব্যবস্থা।

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য হইতেছে এই যে রাজা উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী হন এবং তিনি কোন বিশেষ দলের নেতা নহেন। কিন্তু একনায়ক সামরিক শক্তির জোরে অথবা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া ক্ষমতার শিখরে আসেন এবং তিনি নিজেই তাঁহার অনুগামীদের লইয়া দল গঠন করেন। হিটলার এবং মুসোলিনী যদিও একনায়ক ছিলেন,—তাঁহারা ছিলেন, নিজেদের দলের একমাত্র অধিনায়ক।

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টির পক্ষে একনায়কগণ কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একটি শ্লোগানের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথম

১। **By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the State exercising it without restraint.**

Veuman—*Democratic and the Authoritarian State.*

মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালীতে মুসোলিনী যথাক্রমে নাৎসীবাদ (Nazism) এবং ফ্যাসীবাদ (Fascism) প্রচার করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সমুদয় ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। গণতন্ত্র যখনই মানুষের সমুদয় চাহিদাকে পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়, যখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শুধু নিজেদের স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে,—জনস্বার্থের কথা ভুলিয়া যায়, তখনই সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক ধনিকতন্ত্র (Economic oligarchy)। সেই অবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ তিনি নিজের সামরিক ক্ষমতার জোরেই হউক বা দলগত সমর্থনের জোরেই হউক নিজে সব ক্ষমতার ভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তানে আয়ুব খান ও পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খান এবং প্রজাতন্ত্রী মিশরে কর্ণেল নাসের এইভাবেই প্রথমে ক্ষমতা হস্তগত করেন। পরে অবশ্য পাকিস্তানে আয়ুব খান এবং মিশরে প্রেসিডেন্ট নাসের নিজের নিজের দেশে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন। দেখা যাইতেছে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য জনগণের মধ্যে সামর্থ্য ও আগ্রহের অভাবই একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারের দুর্বলতাই যদি প্রকট হইয়া উঠে এবং ইহা যদি সাধারণ মানুষের মনে শুধু অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি করিয়া গণতন্ত্রের আদর্শ অবলম্বনে বাধার সৃষ্টি করে, ক্ষমতালোভী শাসক এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের শাসন কায়েম করেন।

একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টির পক্ষে যুক্তি

গণতন্ত্রের ব্যর্থতাই একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে

একনায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন দেখা যায় জার্মান দার্শনিক নীটশের (Nietzsche) লেখায়। তাঁহার মতে যাহা মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলে তাহাই বর্জনীয়। তাঁহার মতে গণতান্ত্রিক সাম্য মানুষকে নিষ্ক্রিয় করিয়া পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করে; অর্থাৎ মানুষ ইহাতে নিবীর্য হইয়া পড়ে।[১] ইহার ফলে মহৎ কিছু সৃষ্ট হইতে পারে না। তিনি ছিলেন বীরপূজার (Hero-worship) সমর্থক। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি মানব জাতির উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকে সামরিক মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে তিনি মৃত্যুকে জর্জরিত করেন নাই।[২] তাঁহার মতে উচিত সব দুর্বলতা পরিহার করিয়া যিনি যোগ্যতম এবং বীর, তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত

একনায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত সমর্থন

নীটশের যুক্তি

১। "...Everybody comes to resemble everybody else; even the sexes apporximate—the men become women and the women become men." The Will to Power.

২। "Napoleon was not a butcher but a benefactor, he gave men death with military honours instead of death by economic attritions. Will Durant from Neitzsche's "*Beyond Good and Evil*".

হইয়া নিজেকে সবল করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তা করিয়া নীটশে মনে করেন একজন অসাধারণ ব্যক্তিই (Superman) মানবজাতিকে এই ভাবে পরিচালিত করিতে পারেন।

একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different types of Dictatorship) ঃ একনায়কতন্ত্র বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যাপক-ভাবে আমরা তিন প্রকার একনায়কতন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। যথা (১) সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship), (২) ফ্যাসীবাদী কিংবা নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Fascist or Nazi Dictatorship) এবং (৩) সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্র (Communist Dictatorship)। উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আমরা একনায়কতন্ত্রের অন্যান্য রূপ দেখিতে পারি। যেমন, চরম রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজা তাঁহার রাজত্ব-কালকে একনায়কতন্ত্রের রূপ দিতে পারেন। আবার, পালামেণ্টারী শাসনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য মন্ত্রিসভাভিত্তিক একনায়কতন্ত্র (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বস্তুতঃ, অধিকাংশ মন্ত্রিসভা পরিচালিত দেশগুলিতে আমরা মন্ত্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্ব বা Cabinet Dictatorship দেখিতে পাই। কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে বলা হয় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (Dicatatorship of the Proletariat)।

একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র এক জিনিস নহে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে,— এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্ট্র থাকে।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

একনায়কতন্ত্রের রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই নায়ক নির্বাচিত হন। একনেতা লইয়া গঠিত সমুদয় শাসন ক্ষমতা একজনের অথবা একটি দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এমন রাষ্ট্রকেই "Totalitarian State" বলা হয়। স্পেন এবং পর্তুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতন্ত্র মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজ-নৈতিক দলের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন।

একনায়কতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করেন।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship): একনায়কতন্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র অনেক বেশী কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহা কার্যকর করিতে পারেন। বহুজনের মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য সুদৃঢ়ভাবে কার্যকর করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর।

একনায়কতন্ত্রের কর্ম-কুশলতা বেশী

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। গণতন্ত্রে যদি কখনও শৃংখলাবোধ, ঐক্য এবং সংহতির অভাব দেখা যায়, একনায়কতন্ত্র তখন একটি সুদক্ষ এবং সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া শক্তির উৎস হিসাবে বিরাজ করে।[১]

সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও সরকারী কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়কতন্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে কোনও হাত থাকে না। যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃবোধ থাকে না তাহা নহে। রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত হন না, দলীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রেও সরকার পক্ষের দলীয় নেতার নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হয়।

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয়

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি (Demerits of Dictatorship):

প্রথমতঃ, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা নাগরিকদের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়

১। "...a society in crisis will be urged to submit to a pattern of discipline and thus reassert its unity and solidarity. Authoritarianism will be represented as a source of strength because it is supposed to be efficient."

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদই একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হয়। ইটালী এবং জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহাই একটি প্রধান দোষ ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে

ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেয়

তৃতীয়তঃ, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ যে একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারেন তাহা নহে। অনেকক্ষেত্রে একনায়কের কর্মকুশলতার অভাবে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। গণতন্ত্র যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা কম কর্মকুশল তাহা নহে।

ইহা সর্বদা কর্মকুশল নহে

চতুর্থতঃ, ক্ষমতার লোভ একনায়ককে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতাশালীও করে। তাহা ছাড়া, একনায়ক যদি কোন ভুল করেন তবে সমগ্র দেশকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়। অথচ একনায়কের ভুল-ত্রুটি দেখাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা বা বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে থাকে না।

ইহা দুর্নীতি গ্রস্ত

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য (Distinction between Democracy and Dictatorship): গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী,—কিন্তু একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্বাস করে না। একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। একনায়ক-তন্ত্রে সার্বভৌমত্ব এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত; কিন্তু গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হইয়া জনগণেরই হাতে ন্যস্ত।

সার্বভৌমত্বের অবস্থা বিভিন্ন

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের সমালোচনা করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না,—শুধু একটি দলই থাকে। একনায়কতন্ত্রে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে পারে; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। কোন কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায়; যেমন আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে দেখিয়াছিলাম।

গণতন্ত্রে দলব্যবস্থা থাকে এবং বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে নাগরিকদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় থাকে। জনগণ স্বাধীন সরকারের সমালোচনা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। সরকারের সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার থাকে না বলিয়া জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অবদান থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে পদদলিত করা হয়।

গণতন্ত্রে সরকারের সমালোচনা করা যায় এবং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়

চতুর্থতঃ, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আড়ালে গণতন্ত্রেও যে মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্বশীলতাই সরকারের দক্ষতা সূচিত করে। একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল হইতে পারে যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু হয় সরকারের ভালমন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা কতটা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে অর্জিত করা যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (constitutional rule) একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাল।

গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল ; একনায়কতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল সরকার দায়িত্বশীল নহে

পঞ্চমতঃ, তত্ত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তত্ত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রে সার্বভৌমের বহুত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একস্থানে কেন্দ্রীভূত (monistic)। একনায়কতন্ত্র একটি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তিশীল। যেমন, হিটলারের একনায়কতন্ত্র নাৎসীবাদের উপর, মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্র ফ্যাসীবাদের উপর এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্র সাম্যবাদের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু গণতন্ত্রে এই প্রকার নির্দিষ্ট তত্ত্বের স্থান থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্র একদিকে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে, অপরদিকে গণতন্ত্রের আদর্শকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। একনায়কতন্ত্রে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতার শিখরে আসিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে উচ্ছেদ করে, কিন্তু গণতন্ত্রে বিরোধীদলের অস্তিত্ব থাকে।

তত্ত্বের দিক হইতে পার্থক্য

ফ্যাসীবাদ (Fascism): সাম্যবাদ যেমন একটি সুশৃংখল দার্শনিক তত্ত্ব এবং রাষ্ট্রাদর্শের উপর ভিত্তিশীল, ফ্যাসীবাদ সেই প্রকার কোন শৃংখলিত দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দলের নেতা মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল দেশের তৎকালীন বিশৃংখল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে ফ্যাসীবাদের প্রচারকগণ নানা উৎস হইতে বিভিন্ন ভাব ও ধারণা সংগ্রহ করিয়া ইহাদের সংমিশ্রণে এই মতবাদ প্রচার করেন।

ফ্যাসীবাদের বিষয়বস্তু

ফ্যাসীবাদ মার্ক্সীয় দর্শনের বিরোধী এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ফ্যাসীবাদের প্রচারকগণ মার্ক্সকে খাটো করিবার জন্য হেগেলের কিছু কিছু যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্যাসীবাদ অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌম রূপ গ্রহণ করিবে; কিন্তু সাম্যবাদ অনুযায়ী সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ফ্যাসীবাদ প্রচার করে যে একনায়ক সর্বদাই জনসাধারণের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে এবং সবদিকে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবে। জনসাধারণের নিজস্ব বক্তব্য থাকিবে না; জনসাধারণের পক্ষে একনায়কই রাষ্ট্রের সব কাজ সম্পাদন করিবেন।[১] ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দল এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিল বলিয়া এই মতবাদ ফ্যাসীবাদ বলিয়া পরিচিত। ফ্যাসীবাদ উদারনৈতিক মতবাদের পরিপন্থী। একপক্ষে রাষ্ট্রের হাতে চরম কর্তৃত্ব থাকিবে এবং সেই কর্তৃত্ব কোন নৈতিক এবং ধর্মীয় ভাবধারার (যাহা ব্যক্তিমানসকে প্রভাবিত করিতে পারে) সহিত আপোষ করিবে না। রাষ্ট্র জনচেতনার বাস্তব রূপ।[২]

১। "The foundation of Fascism is the conception of State, its character, its duty, and its aim. Fascism conceives of the state as an absolute, in comparison with which all individuals or groups are relative, only to be conceived of in their relation to the state...the Fascist state is itself conscious and itself a will and personality—thus it may be called the 'ethic' state—Mussolini.—Selection from Mussolini's ***The Political and Social Doctrine of Fascism in Modern Political Thought.***

by William Ebenstein, P. 332.

২। "Fascism has its own solution of the paradox of liberty and authority. The authority of the state is absotute. It does not compromise, it does not bargain, it dose not surrender any portion of its field to other moral or religious principle which may interfere with the individual conscience. But on the other hand, the State becomes a reality only in the consciousness of its individuals." Gentile in Spahr—Reading in Recent Political Philosophy P. 700

ফ্যাসীবাদের মধ্যে আমরা কতিপয় বিসদৃশ উপাদানের এক অদ্ভুত রকমের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। একদিকে ইহা জাতি-রাষ্ট্র, আচার এবং প্রথাকে স্বীকার করে, অপরদিকে ইহা একজন অতিমানবের প্রতিভাকে বড় করিয়া দেখে এবং রাষ্ট্রের সর্বময় শক্তি প্রয়োগের দিকটি বড় করিয়া দেখে। মুসোলিনীর মতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র চারিটি বিষয়কে অস্বীকার করে,—এই বিষয়গুলি হইতেছে শান্তিবাদ (Pacifism), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism), গণতন্ত্র (Democracy) এবং সমাজতন্ত্র (Socialism)।

ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র শান্তিবাদকে অস্বীকার করে। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করে। মুসোলিনীর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি হইতেছে "ভীরুর স্বপ্ন" এবং সাম্রাজ্যবাদ হইল জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম।" মুসোলিনীর মতে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাতৃত্ব যেরূপ অপরিহার্য, পুরুষের পক্ষে যুদ্ধও সেই প্রকার অপরিহার্য।

ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র শান্তিবাদীকে অস্বীকার করে

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকার করে না। ফ্যাসীবাদের মূল বক্তব্য হইতেছে, "*Everything for the state ; nothing against the state ; nothing outside the state.*" ফ্যাসীবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনযাত্রার ভার কোন অবস্থায় ব্যক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না ; এই ভার গ্রহণ করিবে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র ; আর রাষ্ট্রের অধিনায়ক রাষ্ট্রের পক্ষে সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিস্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যেই নিহিত। রাষ্ট্র-বিরোধী কোন ব্যক্তি-স্বার্থের যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে অবিলম্বে ইহা বিনষ্ট করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই সর্বময় ক্ষমতাই ফ্যাসীবাদের ভিত্তি। লয়েডের (Lloyd) ভাষায় রাষ্ট্রের গোপনীয়তা হইতেছে ফ্যাসীবাদের ভিত্তি। ('Privacy of the State is the basis of Fascism.')

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে

পূর্বেই বলা হইয়াছে ফ্যাসীবাদ মার্ক্সীয় দর্শনের বিরোধী। এইজন্য সমাজতন্ত্রের সহিত ফ্যাসীবাদের বিরোধ দেখা যায়। ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সমর্থন করে না ; তবে ফ্যাসীবাদ বিশ্বাস করে যে সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ দরকার। অর্থনৈতিক সাম্য, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র, —সমাজতন্ত্রের এই ধারণাগুলির কোন আবেদনে ফ্যাসীবাদের নিকট নাই।

ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রও অস্বীকার করে

ফ্যাসীবাদ বীরপূজা বা নেতৃপূজায় (Hero worship) বিশ্বাসী। সুতরাং ইহা জনগণের সম্মতির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ভিত্তিশীল করে না অথবা সাধারণের ইচ্ছাকে (General will) সম্মান প্রদর্শন করে না। গণতান্ত্রিক সরকার হইতেছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা গঠিত এবং জনগণের সরকার ; কিন্তু ফ্যাসিষ্ট

ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রেও আস্থাবান নহে

সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত একনায়কের সরকার ; তাঁহার ইচ্ছাকে জনগণ নিজেদের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

ইটালীতে জনসাধারণ মুসোলিনীকে নিজেদের একমাত্র নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া মুসোলিনী-পূজা আরম্ভ করে। মুসোলিনীও ইটালীর জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ফ্যাসীবাদের মাধ্যমেই তিনি পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন , কিন্তু মুসোলিনীর এই স্বপ্ন কোন দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল ছিল না এবং সেইজন্য ইহার পিছনে কোন প্রকার নীতিগত কিংবা তত্ত্বগত সমর্থন মুসোলিনীর পতনের পর দেখা যায় নাই। মুসোলিনীর পতনের পর ইটালীতে ফ্যাসীবাদেরও পতন হয়। বর্তমানে পর্তুগালে সালাজার ফ্যাসীবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে যদি কোন ভাবাদর্শ (ideology) না থাকে এবং আন্দোলন যদি জনসাধারণকে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ না করে, তবে কোন আন্দোলনই স্থায়ী হয় না। ইটালীতে ফ্যাসীবাদের পতনের কারণ ছিল একটি সুশৃংখল দার্শনিক তত্ত্ব এবং ভাবাদর্শের অভাব।

নাৎসীবাদ (Nazism) : ফ্যাসীবাদ অপেক্ষা নাৎসীবাদ আরও কম পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল। ফ্যাসীবাদ তবুও যাহা হউক হেগেলের চিন্তাধারায় কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিল ; কিন্তু নাৎসীবাদ কোন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল ছিল না। তবে নাৎসীবাদ একটি রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শের (Political ideology) সৃষ্টি করিয়াছিল। নাৎসী-বাদের স্রষ্টা হইতেছেন হিটলার। নাৎসীবাদের সৃষ্টি হয় ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ঐতিহ্যগত জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ প্রকাশ হইতে ; কিন্তু নাৎসীবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল জাতিতত্ত্বের (racialism) ভিত্তিতে। এই জাতিতত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জার্মান ঐতিহ্যের (জার্মানীর একত্রীকরণের সময় হইতে) অঙ্গীভূত ছিল। হিটলার সেই ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত ও সচল করিয়া তুলেন। হিটলার জার্মান জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যকে এত উঁচু করিয়া জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে জার্মানগণ ইহাকে একটি অতিমানবীয় সংস্থা হিসাবে গণ্য করিতে লাগিল এবং ফ্যাসীবাদের অনুকরণে নেতৃপূজা আরম্ভ করিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে আদর্শবাদের তত্ত্ব (Idealist theory of the State) অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাষ্ট্রের নিকট জনসাধারণ নিজেদের সত্তা ও স্বার্থ বিসর্জন দিল। এইভাবে হিটলার ব্যক্তি-জীবনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া দিলেন এবং ইহার পূর্ণ সামরিকীকরণ (regimentation) করিলেন। জার্মান অধিবাসীদের স্বাধীন চিন্তা বা ভাবধারা বলিয়া আলাদা কিছু রহিল না। যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া এবং

নাৎসীবাদের কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব না থাকিলেও ভাবাদর্শ আছে

কোন প্রকার তত্ত্বগত ধারণাকে আমল না দিয়া জার্মানগণ নেতৃপূজা আরম্ভ করিলেন।

ফ্যাসীবাদের ন্যায় নাৎসীবাদও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, শান্তিবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বসময় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রনায়কের একচ্ছত্র ক্ষমতা নাৎসীবাদ স্বীকার করিত। মুসোলিনীর ন্যায় হিটলারও মনে করিতেন যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য। ব্যক্তিজীবনের সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ, গণতন্ত্রের ধ্বংস, জার্মান জাতিকে বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা এবং নেতৃপূজাই ছিল নাৎসী জার্মানীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিটলারের নির্দেশে জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাধ্যতামূলকভাবে জনগণকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে জাতিকে সর্বদিক হইতে শক্তিশালী করিবার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা হিটলারের আমলে জার্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা, জার্মান ভাষা সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্থিরতা বজায় রাখাই ছিল হিটলার অনুসৃত নীতির উদ্দেশ্য। নাৎসীবাদেও অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হয় নাই। নাৎসীবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল। নাৎসীবাদ মার্ক্সীয় দর্শনেরও বিরোধী ছিল, গণতন্ত্রেরও বিরোধী ছিল। দেশের আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের কাজে রাষ্ট্রের অধিনায়কের ইচ্ছা ছিল চরম। গণতন্ত্রে 'জনসাধারণের ইচ্ছা' আইন প্রণয়নে যে ভূমিকা অবলম্বন করে, নাৎসীবাদে তাহা কিছুই করে না। নাৎসীবাদে জনসাধারণের ইচ্ছা রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যেই প্রতিভাত হয়।

ফ্যাসীবাদের ন্যায় নাৎসীবাদও শান্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী

নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসীবাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকায় এবং উভয়েই একযোগে যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী হওয়ায় এই দুইটি মতবাদের মিলন আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম। হিটলার ও মুসোলিনীর এই মিলনের পরিণতি হইয়াছিল একদিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক বিভিন্নদেশ, এবং অপরদিকে নাৎসীবাদী জার্মানী এবং ফ্যাসীবাদী ইটালী এই দুই দলের মধ্যে মহাযুদ্ধ। নাৎসীবাদের পতন হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে এখনও নাৎসীবাদী একটি ছোট অ-রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নাৎসীবাদ এখন কোন দেশেই সরকারী মর্যাদা পায় না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদ কুগ্রহের মত আবির্ভূত হইয়াছিল। ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদের ভিত্তিতে ইটালী এবং জার্মানী সংহত হইয়া পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদের শক্তি এত বেশী

হইতেছিল যে ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার

১। **এরিষ্টটল কর্তৃক সাধারণ শ্রেণীবিভাগ**—এরিষ্টটল রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। একজন মাত্র শাসক থাকিলে সরকারের স্বাভাবিক রূপ হইবে রাজতন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হইতেছে স্বৈরাচার। অল্প কতিপয় ব্যক্তি শাসক হইলে সরকারের স্বাভাবিক রূপ হইবে অভিজাততন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হইবে ধনিকতন্ত্র। যদি বহু ব্যক্তি শাসক হয় তবে সরকারের স্বাভাবিকরূপ হইবে গণতন্ত্র এবং বিকৃতরূপ হইবে বিকৃত গণতন্ত্র। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগকে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

২। **রাজতন্ত্র**—রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে, অবাধ রাজতন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। অবাধ রাজতন্ত্র গণ-স্বাধীনতা বিরোধী, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। রাজতন্ত্র যে কোন সময়ে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে, কারণ, রাজা যে একজন সুদক্ষ শাসক হইবেন, এরকম কোন নিশ্চয়তা নাই। বর্তমানে আমরা সৌদী আরব, নেপাল ইথিওপিয়া এবং থাইল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রকে বিশেষ শক্তিশালী দেখিতে পাই। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক।

৩। **অভিজাততন্ত্র**—গ্রীক অর্থে যখন দেশের শাসনব্যবস্থা অল্প কতিপয় গুণী ব্যক্তির পরিচালনাধীন থাকে, তখন ইহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। যদি এই মুষ্টিমেয় শাসকমণ্ডলী ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা চালিত হয় তবে শাসনব্যবস্থা ধনিকতন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হয়। অভিজাততন্ত্র জনগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে না বলিয়া প্রকৃতি রাজনৈতিক শিক্ষা পায় না। তবে স্বৈরাচারী অপেক্ষা অভিজাততন্ত্র ভাল। আধুনিককালে অভিজাততন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গণতন্ত্র।

৪। **গণতন্ত্র**—গণতন্ত্র হইতেছে জনগণের নিজেদের সরকার। আগেকার দিনে বিশেষতঃ গ্রীসে আমরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেখিতে পাইতাম। বর্তমানে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার মন্ত্রিসভা-চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত যে কোন একপ্রকার হইতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বদাই জনগণের নিকট কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে। গণতন্ত্রে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই জনগণের মধ্যে সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করে না; গণতন্ত্রের বিভিন্ন গুণগুলি নিম্নরূপ:—(ক) ইহাতে জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, (খ) জনগণ শাসনতন্ত্রে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, (গ) ইহা নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর, (ঘ) গণতন্ত্র নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াইয়া দেয়, এবং (ঙ) গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে।

গণতন্ত্রের কতিপয় দোষও আছে। সেগুলি নিম্নরূপ—(ক) ইহা অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য লোকের পরিচালনাধীন থাকে, (খ) ইহা শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, (গ) সরকারের কর্মদক্ষতা আশানুরূপ থাকে না, (ঘ) আধুনিক গণতন্ত্রে

মুষ্টিমেয় কয়েকজন মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতিই প্রকৃতপক্ষে শাসনকাজ চালান, জনসাধারণ সরকার বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, (ঙ) ইহা সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক, (চ) ইহাতে ব্যয়বাহুল্য খুবই বেশী, এবং (ছ) দেশে জরুরী অবস্থার পক্ষে অথবা দ্রুত আইন প্রণয়নের পক্ষে গণতন্ত্র সুবিধাজনক নয়। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, তবে ভবিষ্যতে টিকিয়া থাকিবার জন্য গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মতে একটি আপোষ হওয়া দরকার।

৫। **একনায়কতন্ত্র**—যখন দেশে মাত্র একজন নেতার হাতে সরকার পরিচালনার ভার দেওয়া হয় তখন যদি একই জাতি ও একই রাষ্ট্র থাকে, তবে এই প্রকার শাসনব্যবস্থাকে আমরা একনায়কতন্ত্র বলি। হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী একনায়কতন্ত্র যথাক্রমে নাৎসীবাদও ফ্যাসীবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণ হইতেছে, (ক) ইহা গণতন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী কর্মকুশল, (খ) একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়, (গ) একনায়কতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা অযোগ্য লোকের পরিচালনাধীন থাকে না এবং একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে, বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রের কতিপয় দোষও আছে, যথা (ক) একনায়কতন্ত্রে জনগণ শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতার সুযোগ পায় না বলিয়া ইহা নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, (খ) একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় এবং (গ) দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারে না। একনায়কতন্ত্র যে সর্বদাই গণতন্ত্র অপেক্ষা কর্মকুশল তাহা নহে।

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ—ফ্যাসীবাদ কোন সুনির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল নহে। ফ্যাসীবাদ শান্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করে। ফ্যাসিষ্টদের মতে ব্যক্তির জীবনযাত্রার ভার কখনই ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়াদেওযা যায়না। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রই জনগণের ভার গ্রহণ করিবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালীতে মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসীবাদ প্রচারিত হয়। হিটলার জার্মান জাতিতত্ত্বের (racialism) ভিত্তিতে নাৎসীবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং জার্মান ঐতিহ্যকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য শান্তিবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়া নাৎসীবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম উপায় ছিল ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ইহার পূর্ণ সামরিকীকরণ করা। জার্মান অধিবাসীদের স্বাধীন চিন্তা বা ভাবধারা আলাদা কিছু রহিল না।

Exercise

1. How would you classify the forms of Government ?

[তুমি কিভাবে সরকারের শ্রেণী-বিভাগ করিবে।] (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা ; ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on Monarchy and Aristocracy and point out their respective merits and demerits.

[রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের উপর টীকা লিখ এবং ইহাদের আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা দেখাও।] (২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the meaning of Democracy as an ideal.

[আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের অর্থ আলোচনা কর।] (২১৭-২২১ পৃষ্ঠা)

4 "Democracy as an ideal is a society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole." (C. D. Burns)—Discuss the statement.

["গণতন্ত্র একই ধরনের লো হইয়া গঠিত সমাজ নহে ; ইহা গঠিত হয় এমন লোকের

যাহারা যাহারা সকলেই সমান, যাঁহারা প্রত্যেকেই সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ"—উক্তিটি আলোচনা কর।] (২১৭-২২১ পৃষ্ঠা)

5. Estimate the strength and weakness of modern Democracy as a form of Government.

[সরকার হিসাবে আধুনিক গণতন্ত্রের গুণাগুণের বিবরণী দাও।] (২২৭-২৩২ পৃষ্ঠা)

6. "Democracy is the best form of Government." "Democracy means government by the ignorant and unfit." —Comment on the statements.

["গণতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরনের সরকার।" "গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় অজ্ঞ এবং অসমর্থ লোকের সরকার।"—উক্তি দুইটির উপর মন্তব্য কর।] (২২৭-২৩২ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the value and limitations of Democracy. Under what conditions is Democracy successful ?

[গণতন্ত্রের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। কোন্ অবস্থায় গণতন্ত্র সফল হইতে পারে ?] (২২৭—২৩৪ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the aims and ideals of totalitarian States. How far do these ideals from those of democratic States ?

[একনায়কাধীন রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য ও আদর্শ আলোচনা কর। এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ হইতে কতটা পৃথক ?] (২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা ; ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা)

9. Distinguish between Democracy and "Totalitarian State."

[গণতন্ত্র এবং একনায়কাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা)

10. What are the different types of dictatorship ? Discuss the merits and demerits of Dictatorship,

[একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ কি কি ? একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।]
(২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা ; ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা)

11. Write notes on (a) Fascism and (b) Nazism.

[(ক) ফ্যাসীবাদ ও (খ) নাৎসীবাদের উপর টীকা লিখ।] (২৪৩-২৪৭ পৃষ্ঠা)

12. Write a note on Aristotelian classification of States.

[এরিষ্টটল কর্তৃক রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের উপর টীকা লিখ।] (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা)

13. Explain the nature of the direct democratic checks and point out their merits and demerits.

[প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের গুণাগুণ আলোচনা কর।]
(২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা ; ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা)

14. What are the different forms of Democracy.

[গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ কি কি ?] (২২১-২২৩ পৃষ্ঠা ; ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা)

15. Write a short note on Liberal Democraey.

[উদার গণতন্ত্রের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা)

16. Write a note on the future of Democracy.

[গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের উপর একটি টীকা লিখ।] (২৩৪-২৩৭ পৃষ্ঠা)

17. Distinguish Democracy from Dictatorship and discuss the conditions which are necessary for the success of Democracy.

(C. U. B. A, 1962, 1965, 1967)

[একনায়কতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রের পার্থক্য দেখাও এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি আলোচনা কর।] (২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা ; ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠা)

18. Democracy, meaning thereby Government by the people, is neither desirable nor possible. Discuss the statement. (B. U. 1965)

["জনগণের সরকার এই অর্থে গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয়ও নহে, সম্ভবও নহে।" উক্তিটি আলোচনা কর।] (২২৯-২৩৪ পৃষ্ঠা)

সংকেত ঃ প্রথমে সংক্ষেপে গণতন্ত্র কাহাকে বলে তাহা লিখিতে হইবে, তারপর গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলি আলোচনা করিতে হইবে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ম যে সর্তগুলি পূরণ হওয়া দরকার, তাহা যে সবক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

19. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which one do you prefer and why ? (C. U. B. A. 1969, 1971)

[গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র—ইহাদের মধ্যে তোমাদের মতে কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?] (২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা)

সংকেত ঃ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে গুণ ও দোষের অনুপাতে গণতন্ত্র যে একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাহাই বলিতে হইবে। ২২৭-২২৯ পৃষ্ঠায় গণতন্ত্রের গুণ এবং ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠায় একনায়কতন্ত্রের দোষ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

(Federal and Unitary System of Government)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of Federation) ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃতি জানিতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতে সৃষ্ট হইতে পারে। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে (integration by absorption) যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে।

কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রথমটি হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ঐক্যানুভূতি পরিলক্ষিত হইবে ; এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ পরস্পরের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিতে চাহিবে কিন্তু সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না। ডাইসির ভাষায় "They must desire Union

যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ডাইসির মত

but not unity." হোয়েরে (K. C. Wheare) অনুরূপ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন "Communities or states must desire to be united, but not to be *unitary*" যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার প্রধান সর্তগুলি হইতেছে অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক সান্নিধ্য, জাতীয় ঐক্যানুভূতি, মিলনের স্পৃহা এবং আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাংখা। হোয়েয়ার বিভিন্ন মূল রাজ্যের পরস্পর মিলিত হইবার আকাংখার কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন বলিয়াছেন যে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার আকাংখা, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং একই প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বিভিন্ন রাজ্যকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মিলিত হইবার জন্য প্রণোদিত করে। বিভিন্ন রাজ্যর মিলিত হইবার আকাংখা যেমন সৃষ্ট হইতে পারে, অনুরূপ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে দুইটি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। একটি হইতেছে centripetal tendency বা কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব। অপরটি হইতেছে centrifugal tendency বা কেন্দ্রাতিগ প্রভাব। ডাইসি কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য বড় এককেন্দ্রিক রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহা হইতেছে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব।

অঙ্গরাজ্যগুলির মিলিত হইবার স্পৃহা কেন হয়

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্য সাধারণ স্বার্থগুলির সম্পর্কিত ব্যাপারে সমগ্র দেশের জন্য একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে এবং এই সরকার সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন মুদ্রাব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালনা) সমগ্র দেশের উপর নিয়ন্ত্রণী শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেরই নিজস্ব কতিপয় সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীন, আঞ্চলিক সরকারের এইভাবেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন থাকিয়াও কেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চাহে সেই সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্ত্র্য জাতীয় চরিত্র, ভাষা এবং সংস্কৃতির আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার আগ্রহ বিভিন্ন রাজ্যকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে পারে; আবার কোন কোন রাজ্য হয়ত কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি স্বাধীন সরকারের অধীনে থাকিতে চাহিতে পারে;

বিভিন্ন রাজ্যগুলি কোন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চাহে

তাহাদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই প্রকৃষ্ট।[১] অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয়, বংশগত এবং সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার আগ্রহও রাজ্যগুলিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে অনুপ্রাণিত করে। একদিকে পরস্পর মিলিত হইবার আকাংখা এবং অপরদিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার আকাংখা এই দুইটি বিপরীত ধর্মী শক্তির সংমিশ্রণেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই।[২] ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ গঠন করিবার পক্ষে অনুকূল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে। এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (Union) গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে। এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। জাতীয় সংহতি বজায় রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন হয়। আবার প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজস্ব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার দরকার হয়। এই দুইটি প্রয়োজনের বাস্তব রূপ হইতেছে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেখানে সব অঙ্গরাজ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু ক্ষমতা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র সংস্থার নিকট অর্জন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৩] কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের

জাতীয় ঐক্য এবং রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীনতার সংমিশ্রণ

যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়

১। "......Federal government is appropriate for a group of State or Communities if, at one and the same time, they desire to be united under a single independent government for some purposes and to be organised under independent regional governments for others."

২। "A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty." Discuss.

৩। "In Federal constitution the powers of government are divided between a government for the whole country and government for parts of the country in such a way that each government is legally independent within its sphere." —K. C. Wheare: *Modern Constitutions*

হোরেয়ার আরও বলেন: "By the Federal Principle I mean the method of dividing powers so that general and regional Governments are each within a sphere, co-ordinate and independent."

স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত শাসনতন্ত্র। সেইজন্য এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক ঐক্য এই জাতীর শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ (ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে কোন রাজ্যের অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে (আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই, তবু ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেঐক্যবোধ প্রসারিত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও বাঁটোয়ারা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার সার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজ্য সরকারই স্বীকার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি রাজনৈতিক কৌশল।[১] যদি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা থাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা।

লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

দ্বৈত নাগরিকতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সমান মর্যাদা

১। "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights."—Dicey

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টন করিবার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা বিশেষভাবে অনুভূত হয় বড় বড় দেশগুলির ক্ষেত্রে। দুইভাবে আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টন হইতে পারে। প্রথমটি হইতেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)। এই ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার সমগ্র ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিয়া নিজের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি করে এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা আরোপ করে। দ্বিতীয়টি হইতেছে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহ গঠিত হয় এবং শাসনতন্ত্রের দ্বারাই ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী সরকার এককেন্দ্রিক থাকে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়।

আঞ্চলিক ক্ষমতার বণ্টন :
(১) বিকেন্দ্রীকরণ
(২) ক্ষমতার বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (**Characteristics of Federal State**) **:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান (co-existence of governments) থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

১। দুই ধরণের সরকার,—কেন্দ্রীয় সরকার, এবং রাজ্য-সরকার

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের অসাধারণ ও সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদান করা হয়। শাসনতন্ত্রে লিখিত নাই এইরূপ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary power) বলা হয়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে অঙ্গরাজ্যগুলিই এই ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে।

২। ক্ষমতা বণ্টন

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে।

৩। লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা এবং কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কোন অবস্থায় শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব লংঘন করিতে পারে না। যদি ক্ষমতা-বণ্টন অথবা কার্যপরিধির পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় কিংবা শাসনতন্ত্র সংশোধিত করিবার দরকার হয় তবে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সংশোধন পদ্ধতির মারফৎ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্যই শাসনতন্ত্রটি লিখিত এবং অনমনীয় হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক আইনসভাকেই অ-সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law-making Body) হইতে হইবে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য যাহাতে সর্বদা বজায় থাকে সেইজন্য শাসনতন্ত্রের অভিভাবক এবং ব্যাখ্যা কর্তা হিসাবে কাজ করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা।

৪। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—ইহার মূলসূত্র

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে। অবশ্য আঞ্চলিক সরকারগুলিরও আলাদা আদালত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা (existence of an independent and impartial judiciary)। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরণের বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে সেজন্য, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও বিচারব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের নিরপেক্ষ অভিভাবক (Guardian of the constitution) বলা হয়।

৫। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা (double citizenship) থাকে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা চালু করা হয় নাই। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাগরিক। রাজ্যসরকারের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে হয় না।

৬। দ্বিনাগরিকতা

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকারগুলি ইহাদের

নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দেশের মোট রাজস্বের একটি অংশ পাইয়া থাকে।*

৭। রাজস্ব বণ্টন

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যসরকার (সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করিয়া আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এইপ্রকার ব্যবচ্ছেদের (secession) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একই রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি পরিচালনা করিয়া থাকে। সেই দেশে দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোনও রাজ্যের ব্যবচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট রাজ্যসরকারের আনুগত্য

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত (Conditions essential to the formation of a Federal Union): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয়। ইহার মধ্যে একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই ভাবকে আমরা কেন্দ্রাভিগামী ভাব (centripetal tendency) বলিতে পারি। ডাইসি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নিজের কাজের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন করে এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইহাকে আমরা "Federation by disaggregation" বলিতে পারি। এই প্রভাবকে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব (centrifugal tendency) বলা হয়। ডাইসি ইহার উল্লেখ করেন নাই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে উভয় প্রভাবই কার্যকর হইতেছে; তবে বেশীর ভাগ কেন্দ্রে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবটিই কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত হইতেছে, বিভিন্ন রাজ্য একদিকে যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলনের আকাংখায় অনুপ্রাণিত হয়, অপরদিকে ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধও টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সর্ত আছে।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (geographical contiguity) থাকা প্রয়োজন। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবোধ আসে। যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বতন অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র ছিল না। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যুদয় পূর্বতন পাকিস্তানের ভৌগোলিক যোগসূত্রের অভাবের অন্যতম পরিণতি।

ভৌগোলিক যোগসূত্র

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম, ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। যদি অঙ্গরাজ্যগুলির বিকৃত জাতীয়তাবোধ (perverted nationalism) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের পারস্পরিক সংঘাত সর্বদা লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের।

জাতীয়তাবোধ

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও সম্পদ, এবং রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মূলরাজ্যগুলির আয়তন এবং সম্পদের বৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মূলরাজ্যেরই সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি মূলরাজ্য বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর মূলরাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক সমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্যানাডার সিনেট সভাও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহার ফলে কোনও মূলরাজ্য সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া অন্যান্য রাজ্যকে নিজের অধীনে আনিতে পারে না। কিন্তু ভারতে পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষে বিভিন্ন মূল রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই।

মূলরাজ্যগুলির মধ্যে সমতা

চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও

সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আঞ্চলিক বৈষম্য (regional disparities) দূর করার প্রচেষ্টা।

আঞ্চলিকস্বার্থের সংরক্ষণ

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ; এই আদর্শ হইতেছে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিলনের আকাংখা হয় নিম্নলিখিত কারণে :

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং একই প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। আবার, নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার আগ্রহ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখার প্রেরণা দেয়। এই দুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠন সফল হয় না। এই দুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ হইতেও সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে পারে। সামগ্রিকভাবে দেশের ঐক্য ও সংহতি যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিকে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা সত্ত্বেও একযোগে কাজ করিতে হয় এবং ঐক্যবদ্ধ হইতে হয়. এইজন্য জাতীয় ঐক্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। সদাসচেতন জনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

জাতীয়তাবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা অপরিহার্য। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতানির্দেশ করে ইহার পর সমুদয় ক্ষমতা (residuary powers) বিভিন্ন মূলরাজ্য অথবা রাজ্য সরকারের হাতে আসে। যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরস্পরের মধ্যে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সেজন্য শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে মূলরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্যই একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাহা

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যে লিখিত শাসনতন্ত্রের ভূমিকা

ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ত্র। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রটিকে লিখিত হইতেই হইবে। তাহা না হইলে শাসনব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই লিখিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম উপাদান ভৌগোলিক যোগসূত্র ভারতে আছে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকায় ভারতে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অধিবাসীগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে একজাতীয়তাবোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই থাকিতে চায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একই প্রকার। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হইয়াছে,—রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নহে। ভারতে দ্বিনাগরিকতা প্রথাও নাই এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ক্রমশঃই এককেন্দ্রিক সরকারের (Unitary Government) দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ভারতে এই সর্তগুলি কতটা পূরণ হইয়াছে

ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ এবং অঙ্গরাজ্যগুলির একই প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতীয়দের দ্বিনাগরিকতা নাই

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সাম্প্রতিক ঝোঁক—সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটা ঝোঁক দেখিতে পাইতেছি। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি কয়েকটি আরব রাষ্ট্রও একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদের দেখিতে হইবে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণা কোথা হইতে আসে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে। সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার জন্য এবং আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই আরব-সিরিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। পূর্বতন ইরাক-জর্ডন যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে

রক্ষা করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল (যদিও ইহার পিছনে বাগদাদ চুক্তির দেশগুলির যথেষ্ট উস্কানি ছিল)। দেখা যাইতেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্র যাহাতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে সেজন্য অনেক সময় তাহারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণ

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণও অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ইরাক ও জর্ডনের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে এই যুক্তি খাটে। তৃতীয়তঃ, যদি কোন কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ এক প্রকার হয়, এবং তাহাদের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে, তবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। চতুর্থতঃ, একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে অনুপ্রাণিত হয়। মিশর, সিরিয়া এবং ইয়েমেন একই আরব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে সকল সুবিধা সেগুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্যও বিভিন্নরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সুবিধা, নিজেদের সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। সে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহারা বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়ক। এজন্য অনেকে আজকাল বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র (World Federation) গঠনের পক্ষপাতী। বিংশ শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের জনমত বুঝিতে পারিয়াছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সকলকে শুধু ধ্বংসেরই পথে লইয়া যাইবে। এই সংকট হইতে মুক্ত হইবার উপায় হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের সেতু সৃষ্টি করা। এই কাজের প্রথম ধাপ হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

একই অর্থনৈতিক স্বার্থ

একই জাতীয়তাবোধ

যে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (geographical contiguity) থাকে, সেগুলি অনেক সময়েই বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করিবার অন্যতম উপায় হইতেছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। অনেকগুলি রাষ্ট্র যখন একত্রিত হইবার তাগিদ অনুভব করে, তখন তাহাদের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার কারণ হইল নিজেদের স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ভৌগোলিক সান্নিধ্য এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা

এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Strength of a Federal Government): ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ইহা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব এবং কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিবার উপায় নির্দেশ করে।[১] যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলি কয়েকটি বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের সুবিধাদি ভোগ করিতে চায়, অথচ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনও বজায় রাখিতে চায়। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এই সুবিধা পাইয়া থাকে। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আইন প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণয়ন করা সম্ভব। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের আশা-আকাংখা অনুযায়ী আপন আপন শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং তাহা যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভবপর। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর উপযোগী। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাষা, সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। নাগাল্যাণ্ড, পাঞ্জাব রাজ্য, হরিয়ানা রাজ্য, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ দৃঢ় করা হইয়াছে। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিশেষ উপযোগী। বড় বড় বহুজাতি সমন্বিত

মূল রাজ্যের লোকেরা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে সন্তুষ্ট থাকে, বড় বড় দেশের পক্ষে ইহা উপযোগী

১। "It furnishes the means of maintaining an equilibrium between the centrifugal and centtipetal forces in a state of widely different tendencies."

দেশগুলির পক্ষে অথবা ভৌগোলিক, বংশগত অথবা অন্যান্ত ব্যবধানের জন্ত বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীদের লইয়া গঠিত দেশগুলির জন্ত যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী। এই দেশগুলিকে যদি আংশিক স্থানীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই ইহারা নিজেদের স্বার্থে ঐক্য বজায় রাখিতে খুবই সচেষ্ট হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

লর্ড ব্রাইস নির্দেশ গুণ

তৃতীয়তঃ, লর্ড ব্রাইস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা লইয়া এইরূপভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদা সরকার থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করিবার এমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হওয়ায় শাসনকাজে অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিরও সঙ্গত কারণ থাকে।

শাসনব্যবস্থা উন্নত হয়

যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ (Demerits of Federal Government): যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে।

অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বিব্রত করিতে পারে

প্রথমতঃ, শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলি প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের দাবীতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের দাবীতে নিজেদের সন্ধি-সর্তগুলি কার্যকর করিতে জাতীয় সরকারকে বাধ্য করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে।[১] ক্ষমতা বণ্টন লইয়া এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি এবং

১। "The members of the federal union, because of their rights over persons and property and their right to legislate in certain matters, may seriously embarrass the national government in enforcing its treaty obligations, The experience of the U. S. bears witness to this difficulty."

—Gettell

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ এবং কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, কোন অঙ্গরাজ্যে যদি সেই দল সরকার গঠন না করে, তবে উভয় সরকারের মধ্যে প্রতি পদে মতভেদের আশংকা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল, মন্থর ও জটিল

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুণ সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুই প্রকার সরকার থাকায় সরকারের ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব ঘটিয়া থাকে ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি পৃথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসীও হইতে পারে।

ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণীত হওয়া উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্র দেশে একই ধরনের আইন না হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইলে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন লইয়া বিরোধের সৃষ্টিও বিরল নহে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরস্পরবিরোধী আইনের সৃষ্টি হইতে পারে। আমেরিকায় আমরা ইহা দেখিয়াছি। বর্তমানে অনেক দেশেই শিল্প-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিটি অনুভূত হইয়াছে।

উপসংহার :—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত অপগুণগুলি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। বরং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত

না হইলে সেই দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় ঐক্য বজায় আছে। সুইজারল্যাণ্ডে যদি উনিশটি ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধ-ক্যাণ্টন সম্মিলিতভাবে টিকিয়া না থাকিত তবে ইউরোপের শান্তি অনেকবার নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ঘটিত। কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে সম্মিলিতভাবে বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ আজ বিশেষভাবে ঐক্যের মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Federal Union and a Confederation): একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-সমবায় (confederation) গঠিত হয়। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়। রাষ্ট্রসমবায়ের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া হল (Hall) বলিয়াছেন,[১] "রাষ্ট্র-সমবায় হইতেছে এমন কতিপয় রাষ্ট্রের সমবায় যাহারা স্বেচ্ছায় কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের স্বাধীনতার কিছু অংশ চিরকালের জন্য ত্যাগ করে।" তবে রাষ্ট্র-সমবায়ে নূতন কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। ইহা কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়। সাধারণতঃ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অথবা একই ধরণের পররাষ্ট্রনীতি সুদৃঢ় করিবার জন্য রাষ্ট্র-সমবায় গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা রাষ্ট্র-সমবায় অনেক বেশী নমনীয় (flexible)। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমবায়ে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের একটি পরিষদ থাকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক-ভাবে একটি রাষ্ট্র-সমবায় ছিল; পরে ইহারা যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক স্তর বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই।

যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সার্বভৌমত্ব থাকে না : রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব থাকে না। অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নিজেদের সার্বভৌম সত্তা সম্পূর্ণ-ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের কাছে সমর্পণ করে। কিন্তু, রাষ্ট্র-সমবারের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌমসত্তা বিসর্জন দেয় না। রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যরাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম, যে কোন সময়েই ইহারা রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারে।

১। "A confederation is a Union of......States which consent to forego permanently a part of their liberty for certain specific objects."—Hall.

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জাতি ও অঙ্গরাজ্যের সম্মিলনে নূতন ঐক্যানুভূতির সৃষ্টি হয়, এবং তাহাতে একটি নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র-সমবায়ে বিভিন্ন জাতি এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে বলিয়া এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না বলিয়া নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

রাষ্ট্রসমবায়ে আলাদা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না, যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূভাগ, নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্র-সমবায়ের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অথবা জনসমষ্টি নাই, এবং ইহার এমন কোন বিচার-ব্যবস্থা নাই যাহা অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন সমগ্র দেশের প্রতি প্রযুক্ত হয়, রাষ্ট্র-সমবায়ের কেন্দ্রীয় পরিষদের এই রকম আইন প্রণয়ন করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। ইহার শুধু সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে কতিপয় সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেগুলির অস্তিত্বও সদস্যরাষ্ট্রগুলির অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অথবা বিচার ব্যবস্থা নাই।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং ইহা সাধারণতঃ অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই লিখিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য বিধান (Separation of Powers) করা হয়। অপরপক্ষে রাষ্ট্র-সমবায় বিভিন্ন স্বাধীন এবং সার্বভৌম সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রসমবায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার অথবা ইহার ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের কোন প্রশ্নই উঠে না। সরকারের শাসনক্ষমতার বিভাজন হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে একটি উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্র-সমবায়ে কোনপ্রকার উচ্চ বিচারালয়ের অস্তিত্ব থাকে না।

রাষ্ট্রসমবায়ে পূর্ণাঙ্গ কোন সরকার থাকে না, ইহা চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দ্বৈত নাগরিকতা থাকে। সেজন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরই খাস নাগরিক থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ে আলাদাভাবে নাগরিকতার প্রশ্ন থাকে না। সদস্যরাষ্ট্রগুলির নাগরিকেরাই রাষ্ট্র-সমবায়ের নাগরিক।

রাষ্ট্র-সমবায়ের আলাদা নাগরিকতা থাকে না

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কখনও (রাশিয়া ব্যতীত) বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। রাশিয়ায়ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু থাকায় অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয়

সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু, রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যে কোন সময়েই রাষ্ট্র-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য রাষ্ট্র-সমবায় সর্বদাই অস্থায়ী। কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র পারস্পারিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-সমবায় গঠন করিয়া থাকে। প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেই সদস্যরাষ্ট্র-গুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র-সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জার্মান-ভাষায় যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে সম্মিলিত রাষ্ট্র অথবা Bundestaat-এবং রাষ্ট্র-সমবায় হইতেছে রাষ্ট্রের সম্মিলন অথবা Staatenbund.

রাষ্ট্র-সমবায় হইতে কোন সদস্যরাষ্ট্র বাহির হইয়া আসিতে পারে

যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রমৈত্রী (Federation and Alliance) : বর্তমানে রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে রাষ্ট্রমৈত্রী (Alliance) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রমৈত্রী আক্রমণমূলক (Offensive) এবং প্রতিরক্ষামূলক (Defensive) উভয়ই হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা শক্তিরসমতা (Balance of Power) বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রমৈত্রী গঠিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে একটি রাষ্ট্রমৈত্রী ব্যবস্থা সংগঠিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের প্রচেষ্টায় ইউরোপের তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) গঠন করে। এই ক্ষুদ্র আঁতাত ফ্রান্সের রাষ্ট্রমৈত্রী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রমৈত্রীর ফলে কোন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় না। মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সময়েই মৈত্রীচুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইলে ইটালী এই মৈত্রীচুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসে। এই মৈত্রীচুক্তি প্রকৃত রাজ্যসংঘ বা Real Union হইতে পৃথক। প্রকৃত রাজ্যসংঘে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট চুক্তির সাহায্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রমৈত্রী নিছক বন্ধুত্বের বন্ধন। যতক্ষণ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে একমত থাকিবে ততক্ষণই এই মৈত্রী অটুট থাকিবে। মৈত্রীর সর্ত লংঘিত হইলে মৈত্রীও নষ্ট হইয়া যাইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইহার যে সাদৃশ্য নাই, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অভাব হইতেই প্রতীয়মান হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র মৈত্রীর পার্থক্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকার ভেদ (Different types of Federation) : যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা দেখা যায় তাহা যদি আমরা

পর্যালোচনা করি তবে দেখিতে পাই কাঠামোর দিক হইতে অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রই এক প্রকার। দুইধরণের সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গ-রাজ্যগুলির সরকার), শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার বণ্টন, প্রভৃতি সব যুক্তরাষ্ট্রেই দেখা যায়। কিন্তু, তবুও বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি কারণে প্রকার ভেদ হইতে পারে। প্রথমতঃ, সব যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের নীতি একপ্রকার নহে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র সংশোধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; এই তিনটি কারণে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার রূপের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে পারে।

তিনটি কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে

ক্ষমতা বণ্টন নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, এবং ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। যদিও কেন্দ্র এবং মূলরাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন যে কোন যুক্তরাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য, ইহা অপরদিকে একটি সমস্যাও বটে। অনেক দেশই কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে আইন প্রণয়নের কতিপয় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) অঙ্গ রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু, ক্ষমতা বণ্টনের আরও একটি নীতি আছে, তাহা হইতেছে। রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রদান করা। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রে অনুরূপভাবে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের ৯১ ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার বহির্ভূত সমুদয় বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। অবশ্য প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের উপর ভেটো প্রয়োগ করার অথবা ইহা বাতিল করিবার অধিকার ক্যানাডা সরকারের আছে; কিন্তু এই ক্ষমতা খুব অল্পই প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের তিনটি তালিকা (List) করা হইয়াছে, যথা ইউনিয়ন তালিকা (Union List), যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) এবং রাজ্য তালিকা (State List)। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪৬ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা হইতেছে পার্লামেন্টের। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন, পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের প্রকার ভেদ, —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও ভারতবর্ষ।

থাকিলেও শাসনতন্ত্রের ২৬৩ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের এই ক্ষমতা ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের দ্বারা সীমিত। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে রাজ্যে সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইনটি কার্যকর হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Power) অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

শাসনতন্ত্রে প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্নতার উদাহরণ হিসাবে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দুই নম্বর এবং তিন নম্বর ধারা এবং ছয় নম্বর ধারার দুই নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বপ্রকার বিবাদবিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে। অপরদিকে সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভাই এই কাজ করিয়া থাকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Tribunal) নহে। সুইজারল্যাণ্ডের যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ইহার ক্ষমতা খুবই সীমিত; শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবেও সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কোন কাজ করিতে পারে না; যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তুলিতে পারে না। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ত্রিশ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন দাবী করিলে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়।

২। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার বিভিন্ন পদ্ধতি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তার পার্থক্য থাকিবার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র খুবই কঠোর। ভারতবর্ষ এবং সুইজারল্যাণ্ডেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইন সভার সম্মতি ব্যতীত শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা যায় না। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গ-রাজ্যগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। সুইজারল্যাণ্ডে শুধু গণ-উদ্যোগের

৩। শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে এবং পরে গণভোট দ্বারা গৃহীত হইলে ইহা আইনে পরিণত হয়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি প্রকারভেদ নির্দেশ করা হয়,—এই প্রকারভেদ হইতেছে "দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র" (Dualistic Federation) এবং "সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের" (Co-operative Federalism) মধ্যে। দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র বলিতে আমরা বুঝি আগেকার দিনের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং অঙ্গরাজ্য সমূহের দ্বৈত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপে অঙ্গরাজ্যগুলি আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিতেছেনা; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফলে বর্তমানে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সচরাচর দেখা যায় তাহাকে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়।

৪। সম্প্রতি দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র এবং সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র এই দুইপ্রকার যুক্তরাষ্ট্র দেখা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ (Prospects of Federalism): বর্তমানে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রগুলির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিলে প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে উদিত হয়, তাহা হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটা উজ্জ্বল সেই সম্পর্কিত। বর্তমানে বহু যুক্তরাষ্ট্রেই এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সম্প্রতি অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রিকতার দিকে যুক্তরাষ্ট্রগুলির ঝোক প্রবল হইবার কারণগুলি হইতেছে, (১) যুদ্ধ, (২) আর্থিক সংকট, (৩) পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী অধিক পরিমাণে গ্রহণ এবং কল্যাণ-রাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনার বৃদ্ধি, এবং (৫) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুউচ্চ মান বজায় রাখিবার জন্য—সব যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনকার্যে কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। বিশেষতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল, ঝোঁক দেখা যায়। এই জন্যই প্রশ্ন উঠিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কিনা। হোয়েয়ার (Wheare) মনে করেন, একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, অপর দিকে সেই প্রকার অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যেও আত্মসচেতনতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার

বর্তমানে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য অনেক কমিয়া গিয়াছে

কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক কেন দেখা যায়

আকাংখা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।[১] সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট উজ্জ্বল।

তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; ইহার মূল কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক। কিন্তু, এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নিশ্চয়ই কাম্য এবং সেইজন্য বড় বড় দেশগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো গ্রহণ করিতেছে। গতিশীল সমাজে অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সরকারের কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং সেই জন্য হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিতে কেন্দ্রিকতার প্রবল ঝোঁক দেখিতে পাই। কিন্তু তবুও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যে-সকল রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে, তাহারা কাঠামোর দিক হইতে কখনই এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে না। সেইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ লইয়া কোন চিন্তার কারণ নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রী ভাব থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গরাজ্যগুলি নিজেদের আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত দেশের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিয়া এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। তবে যদি কোন দেশে একনায়ক-তন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং স্বৈরাচারী একনায়ক যদি সমস্ত দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চাহেন, তবে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গঠিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই আশংকা থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত নহে

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of a Unitary Government): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থায় এককভাবে কর্তৃত্ব করে। এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে নিজের সুবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে,—আবার ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া সমগ্র দেশে নিজেকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটিমাত্র সরকার এবং একটিমাত্র আইনসভা থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সর-কারের একক কর্তৃত্ব থাকে

১। "...there has been a strong increase in the sense of importance, in the self-consciousness and self-assertiveness of regional governments."

—K. C. Wheare, Federal Government

এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকে।[১] ডাইসি (Dicey) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে "একই কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার স্বভাবজাত প্রয়োগ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত হইতে পারে। ইংলণ্ডে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই এবং সেই দেশের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য থাকে না বলিয়া শাসনতন্ত্রটিও অনমনীয় হয় না। এই ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টের প্রাধান্য এবং সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করে। সার্বভৌম আইন সভা যে কোন সময়েই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র নমনীয় থাকে এবং পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে

যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between a Federal State and a Unitary State) : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোন প্রকার সরকার নাই; সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যে স্থানীয় শাসন বিভাগ (local administration) থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যেমন স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে; আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বণ্টন হয়; এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে

১। "The essence of a unitary State is that the power of the Central Government is unrestricted, for the constitution......does not admit any other law-making body than the central one".—C. F. Strong.

২। "The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power."—Dicey.

শাসনব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সহিত জড়িত সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা একমাত্র এককেন্দ্রিক সরকারের।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র শাসন পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেসর্বা

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার ক্ষমতা থাকে না। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির বিভিন্ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত থাকে না

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। কিন্তু, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। কিন্তু ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র লিখিত। তাহা ছাড়া, ইহা ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মত খুব নমনীয় নয়।

আইন সভার প্রাধান্য

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার-গুলির বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে অনেকক্ষেত্রেই যেমন ইংলণ্ডে আমরা সার্বভৌম আইন-সভা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন অঙ্গরাজ্যের বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য যেমন একটি স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থাকে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সেইপ্রকার স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় নাই।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র যে সর্বদাই বিকেন্দ্রীভূত থাকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলণ্ডে অনেক সময়েই স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আবার ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলির অনেক ক্ষেত্রেই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অনেক সময়েই কম প্রদান করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of a Unitary form of Government): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অনুসৃত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন এবং শাসনপরিচালনায় সরকারের একই নীতি অনুসরণ করা হয় বলিয়া শাসনতন্ত্র কোন সময়েই জটিল ও বিরাট হয় না।

ছোট ছোট দেশের ক্ষেত্রে যেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে না, সেই-গুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া, যে সকল দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী।

আইন ও শাসন-পরিকল্পনার অখণ্ডতা

যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষানীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রুতসিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না।[১] সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়।

শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তা এবং ব্যয়সংকোচন, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণ

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে এই ধরণের শাসনব্যবস্থার যখন খুশী তখনই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়। গতিশীল সমাজের চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া পার্লামেণ্টও যখন যেমন প্রয়োজন সেই প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উৎকর্ষের সূচনা করে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উৎকর্ষের সূচক

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of a Unitary form the Government): বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে না। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া. যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই বেশী এবং যাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা

ইহা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

১। "There can be no conflict of authority, no confusion regarding responsibility, no duplication of work, and no overlapping of jurisdiction" —Gettell.

কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও সে সেইদেশে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহার প্রধান কারণ হইল, ইংরাজদের জাতীয় চরিত্রে সংরক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই বেশী। সংরক্ষণতার প্রভাবে তাঁহারা রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলণ্ড খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুণ ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শাসনকার্যের উৎকর্ষ নষ্ট করে

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সরকারী ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে বহুলাংশে নিরুৎসাহী করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়, এবং এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্মে স্থানীয় স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্যবিধানের অবকাশ খুব অল্প থাকে।[১] এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহার ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পদে হস্তক্ষেপ করে। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

১। **যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য**—যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :—প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সহাবস্থান থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার শাসনতন্ত্রে, বিচার বিভাগের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা থাকে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরণের বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলা হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতা দেখিতে পাই। অর্থাৎ, নাগরিকগণ মূলরাষ্ট্রের এবং মূলরাজ্যের উভয়েরই নাগরিকতা অর্জন করে। ষষ্ঠতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব

১। "The unitary system tends to discourage popular interest in public affairs and to repress local initiative. It tends to develop a centralized bureaucracy which follows routine methods instead of making flexible adjustments"—Gettell.

বণ্টন করা হয়। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়।

২। **যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সাফল্যের উপায়**—প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তা-বোধের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, ধর্ম, ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও সম্পদ এবং প্রধানতঃ, রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সফল হয় না। চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনক-ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং উহার সাফল্যের জন্য একটি লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য।

৩। **যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Merits of a Federal Government)**—যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণীত হয়, আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করা যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয়। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উপযোগী। কারণ, সেই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়।

৪। **যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ**—প্রথমতঃ, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ জাতীয় সরকারকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুণ সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ অঙ্গরাজ্য মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খুবই জনপ্রিয়। সেইজন্য আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এই ঝোঁকের প্রথম কারণই হইল দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্নরাষ্ট্রকে গঠনের প্রেরণা দেয়। তাহার পিছনেও আমরা দেখিতে পাই সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ।

৫। **এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য**—এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনপ্রকার সরকার নাই ; সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকে না। তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত ও অনমনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ন্যায় শাসনতন্ত্র যে সর্বদাই লিখিত অথবা নমনীয় হইবে, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন বিচারালয় থাকে না।

৬। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of a Unitary Form of Government)—এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে একই প্রকার শাসননীতি অনুসৃত হয়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে; এইপ্রকার দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে ; ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়।

৭। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ—বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা নাই। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত ; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী এবং, যাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজগণ সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলণ্ড খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুণ, ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে।

Exercise

1. "A Federal State is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of State rights." Discuss the statement.

["যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সঙ্গে রাজ্যসমূহের অধিকার বজায় রাখার মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি রাজনৈতিক কৌশল"—উক্তিটি আলোচনা কর।]

(২৫০–২৫৪ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the nature and characteristics of a Federal Union.

[যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।] (২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা)

3. "Federalism means the distribution of the force of the State among a number of co-ordinate bodies each originating and controlled by the constitution."—Discuss the statement and point out the salient features of a federal State.

[যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতেছে শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি নির্দিষ্ট সংস্থার মধ্যে রাষ্ট্রের শক্তিবণ্টন করিবার উপায়।"—উক্তিটি আলোচনা কর এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।] (২৫০–২৫৫ পৃষ্ঠা)

4. What are the conditions essential to the formation of a Federal Union? Explain the necessity of a written constitution for a Federal Union. How far do the conditions essential to the formation of a Federal Union exist in India?

[যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য কি কি সর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক? যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। যুক্তরাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয় সর্তগুলি ভারতে কতটা বর্তমান?] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা)

5. Account for the recent tendencies towards a federal state.

[যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাম্প্রতিক ঝোঁকের কারণ দেখাও।] (২৫৯-২৬১ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the strength and weakness of Federation.

[যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও দুর্বলতা আলোচনা কর।] (২৬১-২৬৪ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the characteristics of a true Federal Union as contradistinguished from (a) Confederation and (b) Unitary State. Illustrate your answer.

[(ক) রাষ্ট্রসমবায় এবং (খ) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকৃত পার্থক্য উল্লেখ করিয়া প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। উদাহরণসহ উত্তর দাও।] (২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা)

8. "The usual belief that a Unitary State is always centralized and that a Federal State is invariably decentralized is not necessarily true."—Discuss the statement.

["এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সর্বদা কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা কেন্দ্রাত, এই সাধারণ বিশ্বাস সর্বতা সত্য নয়।"—উক্তিটি আলোচনা কর।] (২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা ; ২৫৪-পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদ)

9. Estimate the strength and weaknes of a unitary form of Government.

[এককেন্দ্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতার একটি বিবরণী দাও।] (২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠা)

10. How is a Federation formed?

[যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে গঠিত হয়?] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা)

11. What are the different factors that induce the States to form a federation?

[কি কি উপাদান একটি রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে প্রণোদিত করে?] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the nature of federalism.

[যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনা কর।] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা)

13. Distinguish between

(a) A Federation and Confederation.

(b) A Federation and an Alliance.

[(ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র সমবায়, এবং (খ) যুক্তরাষ্ট্র ও মৈত্রীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা)

14. Give an outline of the various types of Federation and account for these variations.

[বিভিন্ন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিবরণী দাও এবং] (২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠা)

15. Write a note on the prospects of Federal Government.

[যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভবিষ্যতের উপর টীকা লিখ।] (২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the essential features of a Federal Government. Under what conditions is the formation of a federation advisable ?

(C. U. B. A, Part I, (old) 1966)

[যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। কি কি অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন বাঞ্ছনীয় ?] (২৫৪-২৫৯ পৃষ্ঠা)

17. Explain the nature of a Federal Union and distinguish a Federal Union from a Unitary State.

[যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর, এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।] (২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা ; ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা)

18. Distinguish between unitary and federal government and point out the advantages and disadvantages of the federal from of government.

(C. U. B. A. 1971)

[এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।] (২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা ; ২৬১-২৬৪ পৃষ্ঠা)

19. Explain the chief features of Federation and point out its merits and defects. (C, U. B. A. 1969)

[যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণের বিবরণ দাও।]

(২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা ; ২৬১-২৬৪ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা

(Parliamentary system and Presidential system of Government)

শাসনবিভাগের সহিত আইনবিভাগের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি হইতেছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইন সভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, এবং আইনসভার অধিকার থাকে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয় না।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার বা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Parliamentary form of Government): পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে একজন নামসর্বস্ব শাসন-বিভাগের প্রধান (Titular Executive Head) থাকেন এবং তিনি শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান (Real Executive Head) হইতে পৃথক। যিনি নামসর্বস্ব শাসক বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head), তিনি সর্বদা মন্ত্রিসভার পরামর্শ এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইতেছেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং জাতির প্রতীক; কিন্তু তিনি জাতিকে শাসন করেন না। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি রাজত্বই করেন, শাসন করেন না ("He reigns and does not govern")। শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, প্রকৃত প্রধান নহেন। কারণ ভারতে প্রকৃতপক্ষে একটি পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার হস্তেই শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা ন্যস্ত। ভারতে প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান; তাঁহার নেতৃত্বেই মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে। শাসনবিভাগের যিনি নামসর্বস্ব প্রধান, তাঁহার মর্যাদা অপরিসীম, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা নাই।

নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বস্ব প্রধানকে পার্লামেণ্টের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় না। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে নিজের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ইহাকে বলা হয় মন্ত্রিসভার দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সরকারের নীতি এবং শাসনবিভাগের পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। যে-সমস্ত দেশে আইন সভার দুইটি কক্ষ আছে, সেই দেশগুলিতে মন্ত্রিসভাকে সাধারণতঃ আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাকে হাউস অফ্ কমন্সের নিকট দায়ী থাকিতে হয়; হাউস অফ্ লর্ডসের নিকট নহে। ভারতবর্ষেও মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকে। আইনসভা যদি (১) মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে; (২) মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে কোন বেসরকারী বিল অনুমোদন করে; (৩) মন্ত্রিসভা কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট অথবা অন্য যে কোন বিল না-মঞ্জুর করে; এবং (৪) মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ না করিয়া অথবা মন্ত্রিসভার মত না লইয়া মন্ত্রিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি কমাইয়া দেয়, তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যে কোন মন্ত্রীকে সরকারের শাসনবিভাগের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন

মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা

করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও সেইজন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকার ভঙ্গ হইতে পারে এই জাতীয় কাজও করিতে পারেন না।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিদের পার্লামেন্টের নিকট যৌথ দায়িত্ব (Collective Resposnibility) থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইতেছে, যে কোন মন্ত্রীর দোষের জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভাই দায়ী থাকেন। তাহা ছাড়া, সরকারী নীতিতে কোন মন্ত্রীর হয়ত কতিপয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত আপত্তি বা মতভেদের কারণ থাকিতে পারে। তিনি তাঁহার বক্তব্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করিতে পারেন; কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নীতি গৃহীত হইবে, সেই সময় তাঁহার ব্যক্তিগত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইবেন এবং পার্লামেন্টের নিকট সেইজন্য জবাবদিহি করিবেন কিংবা পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের অংশীদার হইবেন।

যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য

কোন কোন পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেমন ইংলণ্ডে, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব দেখা যায়। আবার কোন কোন পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেমন ভারতবর্ষে, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা হইলেই যে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব থাকিবে তাহা নহে। তবে শাসনবিভাগকে পার্লামেন্টের নিকট সর্বদা দায়ী থাকিতে হইবে। ইংলণ্ডে রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট (King-in Parliament) হইতেছে আইন অনুমোদিত সার্বভৌম এবং পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নিকট মন্ত্রিসভাকে দায়ী থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে পার্লামেণ্ট সার্বভৌম নহে; অথচ ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভাকে নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া এই দেশে শাসনতন্ত্র হইতেছে সার্বভৌম। ভারতে শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, এই জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সুতরাং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একটি প্রধান সর্ত হইতেছে, যে দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে সেই দলকে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে। যদি কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে এবং যদি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-party System) কার্যকর থাকে, তবে একাধিকদল সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry)

পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে

গঠন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারে ততক্ষণই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার সাফল্যজনকভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসভার হাতে এমন ক্ষমতা থাকা দরকার যে ইচ্ছা করিলে প্রধানমন্ত্রী নামসর্বস্ব শাসককে দিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ভারতের লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের একবৎসর আগেই পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইতে পারে

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিদের মধ্যে একই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, সংহতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ("homogeneity, solidarity, and common loyalty to the chief") থাকা দরকার। সি. এফ্ ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, যদি দল-ব্যবস্থা ক্যাবিনেটকে ইহার একাত্মক রূপ প্রদান করে, তবে প্রধানমন্ত্রী ইহাকে সুসংহত করেন।[১] মন্ত্রিসভার যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের সকলকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৫ নম্বর ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ছয় মাসের জন্য পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে তিনি আর মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও দেখা যায় (যেমন, ইংলণ্ড), আবার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায় (যেমন, ভারতবর্ষ)।

মন্ত্রিসভার সংহতি

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে। যে দেশে মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দলই পার্লামেণ্টের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে (যেমন ইংলণ্ড), অর্থাৎ, যে দেশে পার্লামেণ্টীয় রাজনীতিতে আমরা দ্বিদলীয় ব্যবস্থা Bi-Party System দেখিতে পাই, সেই দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা তখনই সার্থক হয় যখন বিরোধীদল মন্ত্রিসভাকে সরকারী নীতি নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। বিরোধীদল যত শক্তিশালী হইবে, তত ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিহত হইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিরোধী দলের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আইভর জেনিংস (Ivor

বিরোধী দলের সংহতি অস্তিত্ব

১। "If it is the Party system wich gives the cabinet its homogeneity it is the position of the Prime Minister which gives it solidarity'" C. F. Strong: Modern Political Constitutions, P 221.

Jennings) বলেন "Opposition is not just a nuisance to be tolerated, but is a definite and essential part of the constitution"। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিশেষ মর্যদা দেওয়া হয় এবং এইজন্য ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমন্সের বিরোধী দলকে "His (Her) Majesty's loyal opposition" বলা হয়।

পার্লামেণ্টারী অথবা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের গুণাবলী (Merits of the Parliamentary Government): পার্লামেণ্টারী সরকারকে বেজহট (Bagehot) "Knuckle Joint" অথবা আঙ্গুলের গাঁট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কারণ এই ধরণের সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। সরকারের এই দুইটি বিভাগ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, এবং দুইটি বিভাগের সৃজনীশক্তিমূলক পারস্পরিক ক্রিয়া একটি সুদক্ষ সরকার গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।[১]

এইধরণের সরকারের পার্লামেণ্টের ভিতর মন্ত্রিসভার উপস্থিতি এবং মন্ত্রিদের পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক থাকায় পার্লামেণ্টও আইন প্রণয়নে শাসনবিভাগের নিকট হইতে নেতৃত্ব পায় এবং ইহাতে সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেশের শাসনকার্য চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর। মন্ত্রিদের পক্ষেও পার্লামেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকায়, বিতর্কে অংশগ্রহণ করায়, এবং বিরোধীদলের ও নিজের দলের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায়—আইনসভায় প্রকাশিত মতামত এবং জনমত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সম্ভবপর হয়।[২] সুতরাং মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের সাধারণ শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে। যদি কখনও মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে অথবা যদি কখনও কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গিয়া যায় তবে পার্লামেণ্টের পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিয়া জনসাধারণের মতামত জানিয়া লইবার সুযোগ পার্লামেণ্টারী সরকারের থাকে।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা জনমতের সহিত সম্পর্ক যুক্ত

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করার ক্ষমতা মন্ত্রিসভা-চালিত

১। "It secures an essential co-ordination between bodies whose creative interplay is the condition of effective Government."—Laski—Grammar of Politics P. 99.

২। "Being in constant contact with those of their own they have opportunities of feeling the pulse of the assembly and through it the pulse of public opinion.—Bryce. Modern Democracies P. 464.

সরকারের একটি বিশেষ গুণ। যদি জনমতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোন মন্ত্রিসভা কাজ চালাইতে থাকে তবে জনমতের চাপে পার্লামেণ্টের পক্ষে একটি মন্ত্রিসভার স্থলে অপর একটি সরকার যাহাতে গঠিত হয় সেই ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। এইভাবে অনেক সময়ে যে কোন মন্ত্রীর অথবা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে এণ্টনী ইডেনের স্থলে ম্যাকমিলান এবং ম্যাকমিলানের স্থলে ডগলাস হিউমের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়াও সরকারের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষেও চীনা আক্রমণের পর কৃষ্ণমেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে চ্যবনকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এইজন্য বেজহট মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের নমনীয়তাকে একটি প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সরকারের নমনীয়তা এবং সমন্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধান

তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টারী সরকারে যাঁহারা মন্ত্রিসভার সদস্য হন তাঁহারা প্রত্যেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া মন্ত্রী হন। সুতরাং দেশের লোক কী চায় এবং সরকারের ক্ষমতা ও কাজের কোথায় সীমারেখা থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট অবহিত থাকেন। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের এই গুণটি খুব কমই থাকে।[১]

মন্ত্রিদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডে যে মন্ত্রিসভা চালিত সরকার গঠিত হইয়াছে ইহাতে গণতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়া যদি ইংলণ্ডকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইত তবে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা ছিল না।

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংহতি সাধন করা সম্ভবপর

সর্বশেষে, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়। দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া পার্লামেণ্টারী সরকার চলিতে পারে না। দলীয় ব্যবস্থা যত উন্নত হয়, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাও তত উন্নত হয়। দলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর। মন্ত্রিসভা চালিত সরকার যত সুদক্ষ হয় এবং বিরোধী দলগুলি

১। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের উল্লেখ করিয়া লাস্কি বলিয়াছেন, "The average American President represented, at the best, a leap in the dark; his average cabinet rarely represents at all. But the average member of an English Cabinet has been tried and tested over a long period in the public view. He has the feel of his task long before he comes to that task."—Laski—Grammar of Polities, P. 300,

যত দৃঢ় ও সংহত হয়, দলীয় ব্যবস্থাও তত উন্নত হয় এবং ইহা নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াইয়া দেয়।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের ত্রুটি (**Demerits of the Cabinet System**)—মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের অন্যতম ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় না। মন্ত্রিসভা শুধু যে শাসনবিভাগেরই প্রকৃত প্রধান তাহা নহে; ইহা পার্লামেণ্টকেও নেতৃত্ব প্রদান করে। এমন কি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই জাতীয় সরকারে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। সেইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের অভাবে আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা মূল্যহীন।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের অভাব

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের সরকার মন্ত্রিসভাকে স্বৈরাচারীতে পরিণত করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং ইহার পর দলীয় শৃংখলা এত কঠোরভাবে অনুসৃত হয় যে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টর কোন অবস্থায়ই মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরোধিতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এই জাতীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মন্ত্রিসভারই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয়। লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) ইহাকে নয়া স্বৈরাচার (New Despotism) আখ্যা দিয়াছেন। পার্লামেণ্টারী সরকার খুবই নমনীয়। কারণ একটি মন্ত্রিসভার উপর যদি পার্লামেণ্টের আস্থার অভাব দেখা যায় তবে অপর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। বিশেষতঃ, পার্লামেণ্টে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারিলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতে পারে; ইহাতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়। সুশাসনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারের একটি দৃঢ় শাসননীতি। কিন্তু মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে ইহা দেখা যায় না।

নয়া স্বৈরাচার

সরকারের নমনীয়তা ত্রুটি হিসাবে দেখা দিতে পারে

তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হয় যে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হয়ত জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যে সুদক্ষ শাসক হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। যাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করেন তাঁহারা নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট পান। কিন্তু এইজন্য সরকার গঠিত হইবার পর তাঁহারা যে সুদক্ষ মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

দক্ষতার দিক হইতে সমালোচনা

চতুর্থতঃ, অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব যে অনেক সময় নষ্ট হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতে নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের হিড়িক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আইনসভার সদস্যদের অনবরত দলত্যাগের ফলে কোন কোন রাজ্যে গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ইহার ফলে তখন ছয়টি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল।

অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব নষ্ট হইতে পারে

উপসংহার—যদিও পার্লামেণ্টারী সরকারের বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে তবুও বর্তমানকালে পার্লামেণ্টারী সরকার খুবই জনপ্রিয়। ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অপর কোন দেশে নাই। ইংলণ্ডেই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের কার্যকারিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। ভারতেও এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জাতীয় সরকারের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেইগুলি সংশোধনের অতীত নহে। এই জাতীয় সরকারে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয় না বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তাহার উত্তরে বলিতে হয় বর্তমানকালে কোন দেশেই সঠিকভাবে এই নীতি অনুসৃত হয় না। অথচ ইংলণ্ড এবং ভারতের জনগণ সর্বাধিক পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেন। এই জাতীয় সরকারে দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন নীতি অনুসৃত হয় না অথবা সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না,—এই ধরনের অভিযোগ যে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নহে, ভারতের পার্লামেণ্টারী সরকারের অভিজ্ঞতাই ইহা প্রমাণ করে।

পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের সর্ত (Conditions for the success of the Parliamentary System): পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রধান সর্ত হইতেছে একটি সুগঠিত বিরোধীদল; যদি একাধিক বিরোধী দল থাকে, তবে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ সুগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদল না থাকিলে এবং সেই দলের শক্তি অন্ততঃ সরকার পক্ষীয় দলের সমপর্যায়ের না হইলে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে। ঐক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষ সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমতকে সর্বদা সচেতন রাখিতে পারে এবং সরকারপক্ষীয় দলের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বেশী রাজনৈতিক দল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। দলীয় শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকাও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা

পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের সর্ত

জনসাধারণের যে সমস্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পার্লামেণ্টে পাঠানো হয় তাঁহাদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সুতরাং কি ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও দূরদর্শিতার উপর। এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Presidential System of Government): রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জাতীয় সরকারে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহার অধস্তন সচিবগণ আইনসভার সদস্য নহেন কিংবা আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। শাসন বিভাগের প্রধান কতদিনের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহা নিরূপণ করার ক্ষেত্রেও শাসন বিভাগ আইনসভার উপর নির্ভরশীল নহে। ক্যাবিনেট প্রথার সহিত এই জাতীয় সরকারের এইখানেই পার্থক্য।[১] জাতীয় সরকারে শাসনবিভাগের যিনি প্রধান, তিনি একাধারে নামসর্বস্ব প্রধান এবং প্রকৃত প্রধান। আইনসভার দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করান যায় না। সি. এফ্. ষ্ট্রং-এর ভাষায় তিনি হইতেছেন "an elected real executive unmovable by the action of the legislature"।

রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন, এবং আইনসভার নিকট দায়ীও নহেন

তিনি একাধারে নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে একটি ক্যাবিনেট থাকিতে পারে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে); কিন্তু সাধারণতঃ সেই ক্যাবিনেটের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন কিংবা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ দায়ী থাকেন রাষ্ট্রপতির নিকট; রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের নিকট। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত একটি নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের নিকট এবং নির্বাচিত হন জনগণের একটি নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক

১। "What has been called 'Presidential Government, as contradistinguished from Cabinet or Parliamentary government. is that system in which the executive (including both the head of the state and his ministers) is constitutionally independent of the legislature in respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policy."—Garner. Political Science and Government P. 111

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে যতটা সম্ভব সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করার চেষ্টা করা হয়। তবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সম্পূর্ণভাবে কোন দেশেই সম্ভব হয় নাই। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে অনেক ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর, বিশেষতঃ সিনেটের উপর, নির্ভর করিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রষ্টাপতি যে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন তাঁহাদের নিয়োগ অনুমোদন করে সিনেট। অবশ্য সিনেট ভদ্রতা করিয়া ("Senatorial courtesy") রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিয়োগে বাধা দেয় না। কিন্তু যদি সিনেট এই ব্যাপারে কখনও রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করে, তবে রাষ্ট্রপতি অসহায় বোধ করেন। অর্থসংক্রান্ত বিল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে—কংগ্রেসের উভয় কক্ষের উপর এবং আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি, এবং যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে সিনেটের উপর রাষ্ট্রপতিকে নির্ভর করিতে হয়।[১] তবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে বিচারবিভাগের যতটা সম্ভব স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়, এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে আমরা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের' (checks and balance) নীতি দেখিতে পাই।

যতটা সম্ভব ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করার চেষ্টা করা হয়

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হইতে পারে যে রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেই দল হয়ত আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইসেনহাওয়ার যখন প্রজাতন্ত্রী দলের (Republican Party) পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন্ তখন সিনেটে গণতন্ত্রীদলের (Democratic Party) সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তবুও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের পক্ষে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে যে সহযোগিতা থাকে না তাহা নহে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণ (Merits of the Presidential System of Government): রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব। দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা কঠিন হইয়া পড়ে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভবপর।

সরকারের স্থায়িত্ব

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের

১। এইজন্যই লাস্কি বলেন "United by the Senate, the American President is a sailor on an uncharted ocean."

শাসনবিভাগের দক্ষতা, আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সংঘাত কম থাকে

মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কেন না, এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের উভয় বিভাগের ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর সীমারেখা করিয়া দেওয়া হয়। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে বলিয়া এই ধরণের সরকারে শাসনবিভাগের দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বিশেষ উপযোগী। কারণ জরুরী অবস্থায় দ্রুততার সহিত সরকারকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং সেই সময়ে সরকারের সমুদয় নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য যদি প্রকৃত ক্ষমতাশালী একজন রাষ্ট্রপতি থাকেন, তবে দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা উপযুক্ত

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের ভিতরে অনেকগুলি রাজনৈতিকদল থাকিলে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। কারণ, সেই অবস্থায় পার্লামেণ্টে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশের শাসন কাজের ভার গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটি (Demerits of the Persidential System of Government): প্রথমত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের একটি বিশেষ ত্রুটি হইতেছে এই যে এই জাতীয় সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা খুব বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, যদি মার্কিন কংগ্রেস, বিশেষতঃ সিনেট, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা না করে তবে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে অসুবিধায় পড়িতে হয়।

শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সংঘাত

ইহাতে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকে

দ্বিতীয়তঃ, যদি কখনও আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি একনায়কের ন্যায় নিজের খুশীমত শাসনকাজ চালাইয়া যান, তবে দেশে কুশাসনের আশংকা থাকে, স্বৈরাচারিতারও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনতন্ত্র লংঘন না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে নিজের কাজের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। ইহাতে স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা খুবই

কঠিন। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টকে নেতৃত্ব প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইন-বিভাগ যেভাবে আইন প্রণয়ন করে, তাহা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সর্বদা গ্রহণযোগ্য না-ও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আইন-সভার উপর অর্পিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজের ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইনপ্রণয়নে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসৃত না-ও হইতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে শাসনবিভাগের সব ক্ষমতা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে। এই প্রকার সরকারের একজন নামেমাত্র প্রধান (Titular Head) থাকেন। ইংলণ্ডের রানী বর্তমানে এইরূপ একটি সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান (Executive Head)। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে শাসন-বিভাগের প্রধান একজন রাষ্ট্রপতি হইতে পাবেন; যেমন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতিই শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। আইনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে শাসনবিভাগের যিনি নামেমাত্র প্রধান তিনিই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, তাঁহার পক্ষে মন্ত্রিসভাই সমুদয় কাজ করে। আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গঠন করেন রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজের দলের সহকর্মীদের মধ্য হইতে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মত পোষণ করে এই রকম অন্য কোন দলের সদস্যদের মধ্য হইতে নিজের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা ইহার সমুদয় কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে এবং আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারকে এইজন্য দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সসভা মন্ত্রিসভার সৃষ্টি করে; কিন্তু মন্ত্রিসভাও কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই প্রকার সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of powers) করা হয় না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পশ্চাতে এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় ইদানীংকালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাহা হইতেছে সরকারের এককেন্দ্রিকতার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে বংশানুক্রমে কেহই রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকেন না। এই ধরণের সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এইপ্রকার শাসনব্যবস্থার লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনবিভাগ (executive) আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল অথবা ইহার কর্তৃত্বাধীন নহে। আমেরিকায় আমরা এই ধরণের শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনবিভাগের কাজ চালান।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সভ্যগণ আইনসভার (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস) সদস্য নহেন এবং ইহার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন। মন্ত্রিসভা নিজের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। যদিও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবুও শাসনবিভাগ ও আইনসভা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন, সরকারের শাসনবিভাগ যে বাজেট অনুযায়ী টাকা খরচ করে সেই বাজেট অনুমোদন করিবার ক্ষমতা হইতেছে আইনসভার। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারগুলির অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রীয়। এইগুলিতে লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান যদি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী মারাত্মক অপরাধ করেন এবং শাসনতন্ত্র অমান্য করেন, তবে একটি বিচারব্যবস্থার সাহায্যে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতির পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন। রাষ্ট্রের জনগণই তাঁহাকে নির্বাচিত করেন এবং তিনি প্রকৃতই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

Exercise

1. Point out the characteristic features of the Parliamentary form of Government and discuss the different ways by which the Legislature exercises its control over the executive under this form of Government.

(C. U. B. A. Part I, 1966, 1968)

[মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট গুলি দেখাও এবং এই ধরনের সরকারের আইনসভা কি কি পদ্ধতিতে শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।]

(২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the characteristics of Cabinet Government and the essential conditions for its success. (B A C U. 1962)

[মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি আলোচনা কর।] (২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা ; ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা)

3. Distinguish between the Presidential form of Government and Cabinet Government. What are the essential requisites of the latter ?

(B. U, 1962)

[রাষ্ট্রপতি-চালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। শেষোক্ত সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিস কি কি ?] (সংক্ষিপ্তসার দেখ। ২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা, ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা)

4, Compare the Parliamentary form of Government and the Presidential form of Government.

[মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে তুলনা কর।]

(২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা ; ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্তসার দেখ।)

5. Explain the meaning of Parliamentary democracy. What are the conditions of its success ? (C. U. B. A. 1970)

[সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দাও। কি কি অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে ?] (২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা ; ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা)

6. Distinguish between Parliamentary and Presidential Governments. What are the elements of strength and weakness of Parliamentary Government ? (C, U. B. A. 1972)

[সংসদশাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সংসদশাসিত সরকারের গুণাগুণগুলি কি কি ?]

(সংক্ষিপ্তসার দেখ। ২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা ; ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ২৮২-২৮৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

(Constitution of the State)

[শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা—শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় এবং অনমনীয়—লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা এবং অসুবিধা—সুশাসনতন্ত্রের উপাদান।]

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of a Constitution) : প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একজন শাসনকর্তা থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। অস্টিনের মতে শাসনতন্ত্র "সর্বোচ্চ সরকারের কাঠামো স্থির করে" ("that which fixes the structure of the supreme government.")। সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হইবে অথবা নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক থাকিবে,—সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য ডাইসির মতে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতরে সার্বভৌম শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।[1] সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি। সরকারের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসন এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যাদি সবই কতিপয় লিখিত অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিতর সার্বভৌম-শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে

শাসনতন্ত্রকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী কোন দেশের শাসনতন্ত্র বলিতে সেই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সব নিয়মকানুন বুঝায়; এই নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রথাগত বিধান এবং আদালত গ্রাহ্য আইন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই লিপিবদ্ধ আইন যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিরূপিত হয়। টকুভিলের (Tocqueville) ভাষায়

শাসনতন্ত্রের দুইটি অর্থ

১। "A constitution is a product of all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign powers in the state"

—Dicey

"In England the constitution···does not exist." ইংলণ্ডে রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার জন্য কোন লিপিবদ্ধ বিধান নাই। কিন্তু বর্তমানে এই যুক্তি গৃহীত হয় না।

সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতন্ত্রের মর্যাদা বেশী

সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা অনেক বেশী। সাধারণ আইন যখন খুশী তখনই পরিবর্তন করা যায়: কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে হইলে শাসনতন্ত্র নির্দেশিত পথে আবার অগ্রসর হইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions): শাসনতন্ত্রকে প্রধানত: লিখিত (written) এবং অলিখিত (unwritten) এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান একটি অথবা কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনতন্ত্রের যখন যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডে আমরা অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথবা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিতভাবে থাকিতে পারে।[১] ইংলণ্ডের ১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (Bill of Rights) ইত্যাদি লিখিতভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভার ন্যায় কাজ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত নহে

১। ব্যাখ্যার মাধ্যমেও লিখিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সম্ভবপর। লর্ড ব্রাইস এই প্রসঙ্গে বলেন, 'Written Constitutions are developed by interpretations fringed with decisions and enlarged by customs as that after a time the letter of the text does not convey the full effect.

শাসনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমরা মূলগত পার্থক্য বা বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য বলিতে পারি না। আবার, লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভারচিত আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে। যদিও আমেরিকায় তাহা সম্ভবপর, ভারতে তাহা সম্ভবপর নয়। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে যদি নাগরিকদের মধ্যে কেহ এই মর্মে অভিযোগ করে যে সংশ্লিষ্ট আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং যদি তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত নয়

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। অনেকে মনে করেন লিখিত শাসনতন্ত্র জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বেশী উপযোগী। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বিবেচিত হইলে এই যুক্তির কোন সারবত্তা থাকে না। শাসনতন্ত্রে, লিখিত এবং অলিখিত উভয় প্রকার বিধানই থাকা দরকার; তাহা না হইলে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। জাতীয় জীবন-ধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্রকে রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাংখার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রকে আবার নমনীয় (Flexible) এবং অনমনীয় (Rigid) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা খুব সহজসাধ্য নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয়। যেভাবে সাধারণ আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধন এবং পরিবর্তন করা যায়। এইজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, এবং ইহার সংশোধন করিতে হইলে দুইটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার দুই পক্ষের মোট সদস্যদের $\frac{2}{3}$ অংশকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চৌত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারে প্রথম ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের

নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র

(অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজ্যের) আইন পরিষদের এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের (অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজ্যের) বিশেষ সম্মিলন। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলণ্ডে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথবা অনমনীয়: শাসনতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্য একটি উপায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে এই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২২টি নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহা কিছুটা সম্ভব হইয়াছে প্রথাগত বিধানের (conventions) দরুণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা। যখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার নিজেদের ক্রিয়াকলাপের শাসনতান্ত্রিক বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়, তখনই সুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। তখন সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বহুক্ষেত্রে তথাকথিত সংশোধন ছাড়াই পরিবর্তিত হইয়াছে।[১] অপরদিকে, বৃটেন উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহা সহজ পদ্ধতি হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী বিলটি অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্পসময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অথবা রাজ্য-আইন সভাগুলির

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কতটা অনমনীয়

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র নমনীয়

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বলা হয়, "...The American constitution is a living organism. It is a Darwinian and not a Newtonian affair."

সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষাও নমনীয়। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনের কার্য্যক্ষেত্র ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কার্যতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের কোন ধারা বাতিল করিতে পারে না; অথচ সংশোধনের মাধ্যমে কোন ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করে নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে। (১) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন ও শাসন বিভাগীয় সম্পর্ক, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, পার্লামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে কোন সংশোধনী বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের বিধান সভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। এইভাবে বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া চাই, তবেই শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (২) শাসনতন্ত্রের অন্যান্য সংশোধন করিতে হইলে ঐ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইতে হইবে। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (৩) কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন, নূতন রাজ্যের সৃষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, কোন রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন অথবা বিলোপ, প্রভৃতি বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট (by simple majority) দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায়। সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারসহ যে কোন ধারার সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে আসিয়াছে। ইহাতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (Permanence)। এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্র সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাসনতন্ত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অনমনীয় শাসনতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে যে ক্ষমতার বণ্টন হয় তাহা যাহাতে ঘনঘন পরিবর্তিত না হয় সেজন্য শাসনতন্ত্র অনমনীয় তাহা ছাড়া, বহু যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেখা যায়। সেইগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়া দরকার। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল এবং যে জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

শাসনতন্ত্রকে অতিরিক্ত অনমনীয় করার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বিশেষ উপযোগী

শাসনতন্ত্রকে অতিরিক্ত অনমনীয় করার চেষ্টা

কিন্তু, একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রিসভার সৃষ্টি করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেইজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাঠামোর দিক হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নহে। তবে সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রচলিত প্রথার প্রভাবে নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা স্পষ্ট থাকে না

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা এবং অসুবিধা (Relative Merits and Demerits of Written and Unwritten Constitutions) : শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পবির্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের (constitutional crisis) আশংকা থাকে।

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ ও দোষ

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতীয় প্রগতির পথ সুগম হয়। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রের একটি দোষ আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্রকে খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহারা সর্বদা স্থায়িত্ব (stability) নাও থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথবা জনমতের দাবীতে যখন খুশী তখনই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন। তাহাতে শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়া যায় এবং শাসনতন্ত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। অলিখিত শাসনতন্ত্রগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই সুস্পষ্ট হয় না। তাহাতে বিধি-নিষেধের অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার (unitary system of government) অলিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক চালিত হইতে পারে,—যেমন ব্রিটেন ইহা হইয়াছে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

অলিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ

সুশাসনতন্ত্রের উপাদান (Elements of a good constitution) : সুশাসনতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান হইতেছে এই যে ইহা নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট

হইতে হইবে। শাসনতন্ত্রের কতিপয় বিধান খুব ব্যাপক হওয়া দরকার যাহাতে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি না হয়। আবার, কতিপয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধান খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। কিন্তু, সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেল শাসনতন্ত্রের আয়তন অযথা বড় হওয়া উচিত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম শাসনতন্ত্র। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যত সাফল্যজনকভাবে অনুসৃত হইতেছে, পৃথিবীর খুব কম শাসনতন্ত্রই এত সাফল্যজনকভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এইজন্য হোয়েরে (Wheare) বলেন, "One essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible." শাসনতন্ত্রকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা উচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যাহাতে ইহার মধ্যে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।[১]

শাসনতন্ত্রটি সুস্পষ্ট হইতে হইবে

শাসনতন্ত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়

সুশাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহার সংশোধন পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট থাকে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাতে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে

শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে। সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হইবে অথবা নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক থাকিবে, তাহা শাসনতন্ত্র স্থির করে। শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত হইতে পারে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত ; কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত। আবার শাসনতন্ত্র কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কঠোর। লিখিত এবং অলিখিত, নমনীয় এবং অনমনীয়, সবরকম শাসনতন্ত্রেরই দোষ ও গুণ আছে। তবে কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত অথচ খুব কঠোর বা খুব নমনীয় নহে। অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ হইতেছে এই যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রে সর্বদা স্থায়িত্ব থাকে না। লিখিত শাসন-

---

১। "...its nature...requires that only its great outlines should be marked, its important objects designated, and the minor ingredients which compose those objects be deduced from the nature of the objects themselves." Marshall (Mc Cullock V. Maryland)

তন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

Exercise

1. Define a constitution, Classify the different constitutions.

[শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান কর। বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ কর।]

(২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠা)

2 "The distinction between states with written and those with unwritten constitutions is an illusory basis of division."—Discuss the statement.

['লিখিত শাসনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্র এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য অলীক বিভাজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।] (২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা)

3, "Distinction between a written constitution and an unwritten constitution is not well-marked."—Discuss.

[লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সুচিহ্নিত নয়।—আলোচনা কর।]

(২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা)

4. An American writer has said that the constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify this viewpoint ?

[একজন আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর নমনীয়। তুমি এই দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থতা কিভাবে প্রমাণ করিবে ?]

(২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the relative merits and demerits of written and unwritten constitutions.

[লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।]

(২৯৭ পৃষ্ঠা)

6. Are the constitutions of (a) U. S. A., (b) England and (c) India, rigid or flexible ? Give reasons for your answer.

[(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (খ) ইংলণ্ড এবং (গ) ভারতের শাসনতন্ত্র কি কঠোর অথবা নমনীয় ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।] (২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the conditions of a good constitution.

[ভাল শাসনতন্ত্রের শর্তগুলি আলোচনা কর।] (২৯৭-২৯৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি
(Theory of Separation of Powers)

[ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি—ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ—সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির সমালোচনা।]

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers): সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (Public Assembly), ম্যাজিস্ট্রেট্স্ (Magistrates) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এরিস্টটলের কর্ম-বিভাগ নীতি

চতুর্দশ শতাব্দীতে মার্সিগ্লিও (Marsiglio of Padua), সরকারের আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যাঁ বোডিঁ (Jean Bodin) রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্যস্ত করিবার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন বিভাগের কাজের স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়।

জ্যাঁ বোডেঁর অভিমত

জেম্স্ হ্যারিংটন (James Harrington) আইন প্রণয়ন এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের সুপারিশ করেন। জন্ লক্ (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেস্কু (Montesquieu)। ব্রিটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মণ্টেস্কু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে—আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

হ্যারিংটন এবং লকের অভিমত

মণ্টেস্কুর অভিমত

বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য তিনি সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মণ্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালের ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the Laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বার্থেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা উচিত।

ব্ল্যাকষ্টোনের আলোচনা

ম্যাডিসনও (Madison) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।[১]

ম্যাডিসনের উক্তি

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ যথেচ্ছভাবে শাসনকাজ চালাইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নহে।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধানের পক্ষে যুক্তি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ—বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনপরিচালন বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিধান জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সে ক্ষেত্রে অর্জিত ও রক্ষিত হয়।[২]

১। "The accumulation of all powers...in the same hands...may justly be pronounced as the very definition of tyranny."—Madison

২। "In a democratic State, concentration of authority in the organ most directly representing the people may secure greater liberty than divided powers granted to independent and irresponsible organs".—Gettell

ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সকলেই আইনসভার সদস্য এবং আইন প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ড সভা বৃটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। ইহাকেই ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলণ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংলণ্ডের যিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কখনই কার্যকর হয় নাই।

ব্রিটেনে এই নীতি কার্যকরী নয়

আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব (secretaries) নিযুক্ত করেন। এই সচিবমণ্ডলীকে মন্ত্রিসভা বলা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং সচিবমণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই। প্রথমত, সরকারের শাসন বিভাগ যে টাকা খরচ করে, তাহা মঞ্জুর করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার। সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে

আমেরিকার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকর, সম্পূর্ণভাবে নয়

কড়জোর ১৪ দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্মতিপ্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্যই আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার সদস্যগণ শাসন-বিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়) অধিকার বিচারবিভাগের আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি, যিনি শাসনবিভাগের দ্বিতীয় প্রধান, কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের (সিনেট) সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করিতে পারেন

ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণও আইনসভার সদস্য; সুতরাং আইনপ্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসন বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেলা শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অর্পিত হইয়াছে। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড হইতে কাহাকেও রেহাই দেওয়া প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন

ভারতের শাসনতন্ত্রে এই নীতি কার্যকর নয়

ভারতের জেলাশাসক যুগপৎ শাসনবিভাগীয় এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করেন

ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতি (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে।

দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান ইংলণ্ড, আমেরিকা অথবা ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই।

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির সমালোচনা (Criticisms of the theory of Separation of Powers): সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে এবং সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে সবকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে।[১] আমরা এই উভয় যুক্তিরই সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া অর্জিত অথবা রক্ষিত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমেই চাই একটি সচেতন জনমত।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির পক্ষে যুক্তি

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানে নাগরিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না

তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সুসমঞ্জস নীতি অনুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধান কর, হয় নাই, কিন্তু বরাবরই ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা, ছাড়া, ব্রিটেনে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারতেও

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা

১। "In the actual conduct of public affairs, a certain degree of separation of powers moves towards efficient governments."

স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্য নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ছাড়াও নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় থাকে না

সুতরাং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতটা স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অর্জিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে সরকারের যে বিভাগ, সেই বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার এবং ইহা কার্যকরী করিবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়।[১] যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপর পক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে

ইহা সর্বদা কাম্য নহে

প্রতিরোধ করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সর্বদা কাম্য নহে।[২] এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিই খুবই নমনীয় (flexible) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও অনেক কম।

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, বাস্তবে ইহা কার্যকর করার মধ্যে অনেক অসুবিধাও আছে। সরকারের

১। "The government of each state is a unit, engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated, is essential."—Gettell

২। আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে জেমস্ ম্যাডিসন (James Madison) বলিয়াছিলেন, "The powers properly belonging to one department ought not to be directly and completely administered by either of the other departments and no department ought to possess, directly or indirectly, an overruling influence over the others in the administration of their respective powers."

বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন।

ইহা কার্যকর করার অসুবিধা

অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ আছে, তিনটি নহে

অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ; যথা, নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসনপরিচালন বিভাগের প্রধানগণ অথবা মন্ত্রিসভা, সরকারের বাঁধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (administrative officials or bodies) এবং বিচার বিভাগ; এককভাবে এই পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্যক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইলেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডে এবং ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে,—ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইনসভাই হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দিতে হইবে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধাননীতির পরিবর্তে সরকারের ক্ষমতাগুলির পারস্পরিক "প্রতিরোধ ও ভারসাম্যের" (checks and balance) নীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেশের শাসনবিভাগ যে অর্থব্যয় করিবে তাহা অনুমোদন করার দায়িত্ব আইনসভার। যদি পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সরকারপক্ষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তবে মন্ত্রিসভার পক্ষে বাজেট অনুমোদিত করাইয়া লওয়া কঠিন হইতে পারে। কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমস্যাটি একটু অন্য ধরনের। রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে দিয়া হয়ত একটি ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাহেন; কিন্তু এমন হইতে পারে, রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, আইনসভায় সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই বলিয়া আইনসভা রাষ্ট্রপতির সুপারিশে কোন ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন না করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতীতে এইরূপ ঘটিয়াছে। ক্ষমতার প্রতিরোধ ও ভারসাম্যের নীতি আরও একটি

ক্ষেত্রে অনুভূত হয়; তাহা হইতেছে, শাসনবিভাগ যাহাতে নিজের খুশীমত কোন কিছু না করিতে পারে এবং শাসনতন্ত্রের বিধান যাহাতে কোন অবস্থায় লঙ্ঘিত না হয়, বিচার বিভাগ সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট "আইনের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" (Judicial Review of Legislation) করিবার ক্ষমতা ভোগ করে।

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতাব স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে বর্তমানে দুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা, শাসন বিভাগ অথবা বিচার বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা। মণ্টেস্কু (Montesquieu) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের অর্থ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পৃথকীকরণ নহে

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেস্কু (Montesquieu)। ম্যাডিসনও বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। ব্রিটেনে এই নীতি কার্যকর হয় নাই। আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকর হইয়াছে, সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধাননীতি কার্যকরী হয় নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে ইহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা ছাড়া, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান না হইলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকিবে না, তাহা নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান হয় নাই, অথচ ব্রিটেনের নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন। তবে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। শাসনপরিচালন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই নির্ভরশীল করিয়া রাখা উচিত নয়।

Exercise

1. Explain the theory of Separation of Powers. How far has this theory been translated into practice in Britain, India and the U.S.A.?

[ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি ব্যাখ্যা কর। এই নীতি ব্রিটেন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে ?] (৩০০-৩০৪ পৃষ্ঠা)

2. Explain carefully the statement that the system of "Separation of Powers" and "check and balance" prevent chaos of authority and unify governmental powers. Discuss the statement with reference to the political system of the U. S. A.

["ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান" নীতি এবং বিভিন্ন ক্ষমতার পারস্পরিক "প্রতিরোধ ও ভারসাম্য" বজায় রাখার ব্যবস্থা ক্ষমতার বিশৃংখলা প্রতিহত করে এবং সরকারের ক্ষমতার মধ্যে ঐক্য সাধন করে,—এই উক্তিটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া উক্তিটি আলোচনা কর।]

(৩০০-৩০১ পৃষ্ঠা ; ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠা ; ৩০৪-৩০৫ পৃষ্ঠা ; ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা)

3. "The strict Seperation of Powers is neither desirable nor feasible".—Discuss the statement. (C. U. B. A. Part I. 1966)

["ক্ষমতার কঠোর স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়",—উক্তিটি আলোচনা কর।]

(৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the value and limitations of the doctrine of separation of Powers.

[ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধাননীতির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

(৩০১ পৃষ্ঠা ; ৩০৪-৩০৭ পৃষ্ঠা)

5. "A rigid theory of separation of powers is neither possible nor desirable."—Discuss the statement with illustrations. (C. U. B. A, 1972).

["কঠোর ক্ষমতাবিভাজন নীতি সম্ভবও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়",—উদাহরণ সহকারে এই উক্তিটি আলোচনা কর।] (৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

আইন পরিষদ
(The Legislature)

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি সরকারের তিনটি বিভাগ আছে যথা, আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। আমরা এখন আইন প্রণয়ন বিভাগ লইয়া আলোচনা করিব। গণতান্ত্রিক সরকারে আইন বিভাগ বা ব্যবস্থা বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইন বিভাগ অপেক্ষা শাসন বিভাগ অধিক ক্ষমতাশালী; মুসোলিনী পার্লামেণ্টকে নিজের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিতেন।

আইন পরিষদের কাজ (Functions of the Legislature): সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। তবে সব গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভার সমান গুরুত্ব নাই। মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইনসভার যতটা গুরুত্ব রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে আইনসভার ততটা গুরুত্ব নাই। সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়:

(১) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ**—আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন পরিষদগুলির আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে দেশের শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আইন পরিষদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা

(২) **শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কাজ:**—আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও আড়াই বছর পর্যন্ত আইনসভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের যে কোন বিধান (মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান সহ) সংশোধন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, ইংলণ্ডের আইন পরিষদের পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা খুবই সহজ। ইংলণ্ড এবং সুইজার-

আইন পরিষদ অনেকক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে

ল্যাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবেও কাজ করিয়াছে। শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কাজের উপর কোন আইনসভার সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে। ইংলণ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট একটি সার্বভৌম আইনসভা।

(৩) **শাসন-কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন করার কাজ :** অনেক সময় আইন পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (electoral college) পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনপরিষদের উভয় কক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলির আইন পরিষদের নিম্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব মার্কিন কংগ্রেসের।

আইন পরিষদ নির্বাচনী সংস্থা হিসাবে শাসনকর্তৃপক্ষকে নির্বাচিত করিতে পারে

(৪) **আইন প্রণয়ন বিভাগ:কর্তৃক কমিশন নিযুক্ত করার কাজ :—** আইনপরিষদ জনস্বার্থ সম্পর্কিত সরকারের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে —শাসনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের রিপোর্ট এবং সুপারিশ লইয়া আলোচনা করিতে পারেন।

আইনপরিষদ বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে

(৫) **আইন সভার অর্থসংক্রান্ত কাজ :**—সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে আইন-পরিষদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-পরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা সিনেট—সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল 'আলোচনা, সমালোচনা, পরিবর্তন এবং অনুমোদন করিতে পারে। ভারতে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা রাজ্যসভা (Council of States) সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা অথবা সমালোচনা করিতে পারে; কিন্তু ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন করিতে পারে না।

সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত সকল বিল আইন পরিষদ অনুমোদন করে

(৬) **আইনসভার শাসনসংক্রান্ত কাজ :**—তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে আইন প্রণয়ন বিভাগের কোন শাসন সংক্রান্ত কাজ থাকে না। কিন্তু যেহেতু কোন দেশেই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হয় না, সেইজন্য আইনসভার কতিপয় শাসনসংক্রান্ত কাজ থাকে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে আইনসভা। মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইনপরিষদ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদের সদস্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন পরিষদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু, বর্তমানে অতি মাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হওয়ায় আইন পরিষদ যে পরিমাণে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, মন্ত্রিসভা আইন পরিষদকে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারেও আমরা কিছু পরিমাণে আইন বিভাগের শাসনসংক্রান্ত কাজ দেখিতে পাই। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যেসকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাঁহাদের নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে সিনেট। তাহা ছাড়া, সিনেটের সম্মতি ব্যতীত মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধিপত্র অথবা পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য দেশে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা নিম্নকক্ষ অনেক বেশী ক্ষমতাশালী।

মন্ত্রিসভা চালিত সরকার আইন পরিষদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে

আইন পরিষদের উচ্চকক্ষের ভূমিকা

(৭) **আইনসভার বিচারবিভাগীয় কাজ** :—আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পন্ন করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে লর্ডসভা বিচারবিভাগের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় অনেক আইন পরিষদই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের (যেমন ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি) শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত (impeached) করিতে পারে।

আইন পরিষদের বিচার বিভাগীয় কাজ

(৮) **রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন বিভাগের অবদান :** আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে (একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত) বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠনের চেষ্টা করে। আইন পরিষদে সরকার বিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে আইনসভার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে রাজনৈতিক দলগুলির কর্মশক্তি। আধুনিক মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইন সভায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলি। দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া সরকারের সমালোচনা করে। সরকারপক্ষীয় দলও দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া সরকারের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা (Unicameral vs. Bicameral Legislature) : অধিকাংশ রাষ্ট্রই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জার্মান সাম্রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ জাতীয় স্বার্থ এবং রাষ্ট্র সমবায় স্বার্থের (confederate interests) সমন্বয় ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল।

আইন পরিষদ এক-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে অথবা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। লেকি (Lecky) তাঁহার "Democracy and Liberty" বইয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উচ্চতর কক্ষ নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে। নিম্নকক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। নিম্নকক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিম্নকক্ষের সব ক্রিয়াকলাপের পরিমার্জনা করার জন্য উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।[১]

দ্বি-কক্ষ আইনসভার পক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত আইন প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদস্যগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। তাহাতে আইন-পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন গুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে ইহাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়।[২]

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভায় আইন প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন সম্ভবপর

১। "The necessity of a Second Chamber to exercise a controlling, modifying retarding influence, has acquired almost the position of an axiom."

২। "Between two Houses there is likely to be healthy rivalry, causing each to subject the measures of the other to careful scrutiny and resulting in more careful analysis of principles and needs than would be the case if the contest were between a majority and a minority in the single House only".—Gettell

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, তবে যে কোনও একটি কক্ষের সদস্যগণের পক্ষে সর্বদা জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা সম্ভবপর হয়।

দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্ব-ভৌমত্বের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়

তৃতীয়তঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে পক্ষে বলা হয় যে ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক। যদি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা যে কোন সময়েই স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবার আশংকা থাকে। অপরপক্ষে আইনপরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিতে পারে। ব্রাইস মনে করেন যে কোনও একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোনও পরিষদ থাকা উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।[1] এইজন্যই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি অনুধাবনযোগ্য। মিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা স্বীকার করেন না।[2] নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সেইভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে।

উচ্চ কক্ষ নিম্নকক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করে

ব্রাইস এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে। ডুগুইটের (Duguit) মতে শ্রেষ্ঠ আইন পরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে একটি কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জন-সমষ্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই সুবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য

১। "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly is to become hateful, tyrannical and corrupt, and needs to be checked by the existence of another House of equal authority"—Bryce

২। "I see little value on any check which a second chamber can apply to a democracy otherwise unchecked."—Mill

সিনেটে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে মন্ত্রিসভাকে নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকিতে হয় বলিয়া সেই সরকারের আইন-বিভাগে উচ্চকক্ষের বিশেষ মর্যাদা থাকে না। ইংলণ্ডের হাউস অফ লর্ডসের দিকে তাকালেই ইহা দেখা যায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যবিধানমণ্ডলীয় উচ্চকক্ষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদারনৈতিক মতবাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।[১]

উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষদ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়

হোয়েরে (Wheare) মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে যদি মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার গঠিত হয় এবং ব্রিটেন ও অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে সেইভাবেই যদি সরকার পরিচালিত হয়, তবে দ্বিতীয় কক্ষ কখনই অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সংরক্ষক হইতে পারে না।[২] কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তিচালিত সরকার গঠিত হইল যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হইয়াছে, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

হোয়েয়ারের অভিমত

পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদে যোগ্যতার ব্যক্তিগণআইনপরিষদের উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্ম-প্রতিভা, যোগ্যতা রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং শাসনব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইনপরিষদের প্রধান কাজ শুধু আইনপ্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকেও আইন পরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ্, ব্যবহারজীবী, প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

যোগ্যতর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উচ্চকক্ষের সদস্য হইয়া থাকেন

সর্বশেষে, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, ইহা শাসন বিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। যদি আইন

১। "The conservative attitude of one chamber may curb the radicalism of the more popular."—Gettell

২। এই প্রসঙ্গে হোয়েরে (Wheare) বলেন, "If Cabinet government is adopted in a federation, and if it is worked on the assumption accepted in Britain and Commonwealth countries upto now, a second chamber cannot be effective safeguard of States' rights."—K. C. Wheare—Legislatures.

পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু, যদি আইন পরিষদে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও পক্ষেই শাসন বিভাগের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর নহে। যদি, কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে শাসনবিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অনুকূল হয়।[১]

উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা সম্পন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন কোন লেখক এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের সমর্থক ছিলেন আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (Benjamin Franklin) এবং ইংলণ্ডে বেন্থাম (Bentham) মনে করিতেন যে আইন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শুধু এমন একটি কক্ষ থাকা উচিত এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে ন্যস্ত করা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তব রূপ পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করিবার নীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-পরিষদ গঠন করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত অনেক নতুন রাষ্ট্রের যেমন আধুনিক গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কস্টা'রিকা (Costa Rica), হণ্ডুরাশ (Honduras), স্যালভ্যাডর (Salvador) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদের মত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটি সামরিক নীতি মাত্র। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ জাতীয় কেন্দ্রিকতার (national centralization) গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।

এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার সমর্থন

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে অথবা এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি (Arguments against Second Chamber or in favour of a Single Chamber) : এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-পরিষদের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, যদি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়, শাসনবিভাগের দায়িত্ব কোথায় থাকিবে তাহা ঠিক

১। "Where two Houses of nearly equal strength are found, the executive cannot be made responsible to both ; hence in checking each other, the two branches of the lagislative organ permit to executive a greater degree of freedom of action and responsibility."—Gettell

ভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীরও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। অনেকে মনে করেন যে আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে দায়িত্ব এবং কর্তব্যেরও বিভাজন হয়, ফলে দায়িত্ব ও কর্তব্য নষ্ট হইয়া যায়। কেননা, তখন পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে।[১]

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার দায়িত্ব নষ্ট হয়

দ্বিতীয়তঃ, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের জন্য মাত্র একটি আইনপরিষদই যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অনুভূত হয় না। অবশ্য মার্কিন সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbe Seieves) বলিয়াছিলেন যে উচ্চ পরিষদ যদি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাহুল্য মাত্র; আর যদি ইহা নিম্ন পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক।[২] সুতরাং, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের কোন প্রয়োজন নাই। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাই ভাল।

উচ্চতর কক্ষ অতিরিক্ত এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাই যথেষ্ট

তৃতীয়তঃ, আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে; কিন্তু, মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

উচ্চ কক্ষে সদস্য মনোনয়ন গণতান্ত্রিক নয়

চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিম্নপরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার সময় যে সব ব্যবস্থাই দ্রুত অবলম্বিত হয়, তাহা নহে। আইনসভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে যে কোনও আইন প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেরই খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেইগুলির উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয়। তাহা ছাড়া, নিম্নপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন যে উচ্চ পরিষদ বেশী সংশোধন অথবা আংশিক বাতিল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষেত্রে নহে) করিতে পারে তাহা নহে। সেইজন্য অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদই যথেষ্ট। আধুনিক আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষে যথাসম্ভব বিতর্ক এবং

আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নপরিষদ থাকাই যথেষ্ট

১। "There is probably more truth in the contention that bicameralism divides responsibility and hence duties may even destroy it."—Dimock and Dimock ; American Government in Action.

২। "Of what use will a second chamber be ? If it agrees with the Representative House, it will be superfluous, if it disagrees, mischievous.".
—Abbe Seieyes

বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। সুতরাং উচ্চ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম।

ইহা ব্যয়বহুল

পঞ্চমতঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে চিন্তা করিলে আইন পরিষদের একটি কক্ষ থাকা উচিত।

ইহা শ্রেণী-স্বার্থের সংরক্ষক হইতে পারে

ষষ্ঠতঃ, উচ্চ পরিষদ যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা নহে। আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে শাসনতন্ত্র এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। উচ্চতর কক্ষ অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ইংলণ্ডের লর্ডসভায়, শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। তেমন সংখ্যালঘু সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন হয় না।

আইন প্রণয়নে বিলম্ব

সর্বশেষে, আইন পরিষদে উচ্চ কক্ষের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লর্ডসভা এবং অন্যান্য দেশের আইন পরিষদের উচ্চ কক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনও দেশেই নিম্নকক্ষের দ্রুত এবং অবিবেচনা-প্রসূত আইনের প্রতিবিধান করিতে পারে না, এবং ইহার অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই গোলযোগের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক কক্ষেরই প্রকৃত দায়িত্ব কমাইয়া দেয়।[১]

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়

আজকাল বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদে আমরা উচ্চকক্ষ দেখিতে পাই। ইহার নিশ্চয়ই উপকারিতা আছে। কারণ, আঞ্চলিক সরকারগুলির সমমর্যাদা রাখিবার জন্য এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব পায় সেইজন্য ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অঙ্গরাজ্যগুলির সম-প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার উচ্চ কক্ষেও ক্যান্টনগুলির সমান প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টি রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতকে দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু, সেইজন্য ইহা একেবারে অপরিহার্য নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যদি পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা থাকে

১। "Experience has shown that second chambers seldom provide an effective check on hasty and ill-considered legislation, but that they frequently result in deadlocks, in logrolling practices between the two Houses, and in lack of real responsibility on the part of either House.

—Gettell.

(যেমন ভারতবর্ষে হইয়াছে), তবে আইনসভার উচ্চতর কক্ষের সাহায্যে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে।

সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইন পরিষদ (Sovereign and Non-sovereign Law-making Bodies): আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন আইন পরিষদের যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে, ইহার ভিত্তিতে আইন-পরিষদগুলিকে সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

সার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি আইনপরিষদ যাহার আইন প্রণয়ন করিবার আদিম ক্ষমতা আছে এবং যাহা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে পায় নাই।

সার্বভৌম আইন পরিষদের বৈশিষ্ট

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোনও আইন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না যাহা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সার্বভৌম আইন পরিষদের নাই

তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা ইহা সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারে না। সর্বশেষে কেহই সার্বভৌম আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সার্বভৌম আইন পরিষদের ক্ষমতা অসীম। বৃটেনের রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) একটি সার্বভৌম আইন পরিষদ। বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অন্য কোনও উচ্চতর আইন-পরিষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। তাহা ছাড়া, উক্ত পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কেও কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না।

অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ। ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ, শাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে কাজ করিতে হয়।

অ-সার্বভৌম আইন পরিষদের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ, ইহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের সহিত শাসনতন্ত্রের কোনও বিধানের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সুপ্রীম কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোনও বিলের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন।

সর্বশেষে, শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদগুলি যে আইন প্রণয়ন করে, সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নাই।

ভারতের পার্লামেণ্টও সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম আইনসভা নয়। ভারতের পার্লামেণ্ট কোন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে তাহা শাসনতন্ত্রে

উল্লেখিত আছে, এবং এই সকল ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা পরীক্ষা করিয়া দেখার অধিকার ও ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আছে। তবে শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত কোন বিষয় লইয়া যদি ভারতের পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে, সেখানে ইহার সার্বভৌমত্ব আছে ; কারণ তখন সেই আইনের বৈধতা সুপ্রীম কোর্ট চ্যালেঞ্জ করিতে পারে না। সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের যেকোন বিধানের (মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান সমেত) সংশোধন করিতে পারে। ইহাতে ভারতের পার্লামেণ্ট অনেকটা সার্বভৌম আইনসভায় পরিণত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

আইন পরিষদের কাজ—আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আইন পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিতে পারে। চতুর্থতঃ, আইন পরিষদ সরকারের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, সরকারের আয় ব্যয় সম্পর্কিত বিল আইন সভা এবং বিশেষক্ষেত্রে আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষ (যে সকল রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ আছে) অনুমোদন করিয়া থাকে। ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রিসভা চালিত সরকারের আইন পরিষদ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সপ্তমতঃ, আইনসভা কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন মার্কিন সিনেট) কিছু পরিমাণে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাও ভোগ করে। সর্বশেষে, আইনসভা কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, ইংলণ্ডে হাউস্ অফ্ লর্ডস্) বিচার-বিভাগীয় কাজও করিয়া থাকে ; এবং দেশের শাসনকর্তা যদি শাসনতন্ত্র লংঘন করেন, তবে তাহাকে অপসারণ (impeached) করিতে পারে।

এক কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা—দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে যে ইহাতে (১) উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে ; (২) নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত অনুমোদিত আইনগুলি উচ্চকক্ষ খুটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং দরকার হইলে সংশোধন করিতে পারে ; (৩) আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে নিম্ন কক্ষে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয় এবং উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া যায় এবং (৪) উচ্চ কক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা, কর্মপ্রতিভা এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে এবং এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি হইতেছে এই যে (১) ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয় এবং নির্বাচক-মণ্ডলীরও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। (২) লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের মতে আইন প্রণয়নের জন্য একটি কক্ষই যথেষ্ট, উচ্চকক্ষ থাকিলে উহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে, কিন্তু মনোনয়ন ব্যবস্থা কখনই গণতান্ত্রিক নয়। (৩) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ব্যয় বহুল। (৪) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যে সর্বদায় আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা নহে।

Exercise

1. What are the functions of a modern legislature ? (C. U. B. A. 1970)
[আধুনিক আইন পরিষদ বিভিন্ন কাজ কি কি ?] (৩০৯-৩১১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position and utility of second chamber in a modern state.
[আধুনিক রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষের মর্যাদা এবং উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।]
(৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the case for and against a single-chamber legislature.
[এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা কর।]
(৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা)

4. "If a second chamber dissents from the first, it is mischiveous, if it agrees with it, it is superfluous."—Examine this statement.
["দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের সহিত একমত না হয় তবে ইহা বিপজ্জনক ; যদি একমত হয় তবে ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত ;—উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা)

5 How will you distinguish a non-sovereign law-making body from a sovereign law-making body ? Give reasons for your answer.
[সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হইতে অসার্বভৌম আইন-প্রণয়ণ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখিবার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।]
(৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the problem of bicameralism in connection with the constitution of the legislative organ of modern governments. (C. U. B. A. 1967)
[আধুনিক সরকারের আইন-প্রণয়ন বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখিবার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।] (৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা)

7. What is Bicameralism ? Point out its merits and defects.
(C. U. B. A. 1969)
[আইন-পরিষদ গঠনে "দ্বি-পরিষদ প্রথা" বলিতে কি বুঝ ? এই প্রথার গুণাগুণের বর্ণনা দাও।] (৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায়

শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ
(The Executive and the Judiciary)

ব্যাপকভাবে চিন্তা করিলে আইনপ্রণয়ন এবং বিচার করার কাজ ছাড়া সরকারের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে যে ইচ্ছা প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত হয়, তাহা কার্যকর করিবার কর্তৃপক্ষ শাসনবিভাগ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিতে আমরা বুঝি (১) শাসনবিভাগের প্রধান (Executive Head)—তিনি রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন (২) শাসনপরিষদ (Executive council), (৩) মন্ত্রিমণ্ডলী (Ministry) এবং (৪) সরকারী কর্মচারীবৃন্দ (Civil servants)।

শাসনবিভাগের কাজ (Functions of the Executive): শাসনবিভাগের পাঁচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,—(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (administrative power) অনুযায়ী কাজ, (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (military power) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আই প্রণয়ন ক্ষমতা (legislative power) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (judicial power) অনুযায়ী কাজ। এই পাচটি কাজকে আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি ; যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শাসনবিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ।

শাসনবিভাগীয় কাজ (Administrative Functions): শাসন

সরকার গঠন করা

বিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক সরকারে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক (diplomatic relations) বজায় রাখিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কী

কূটনৈতিক কাজ

সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসন-বিভাগের। শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করেন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে। শাসনবিভাগের কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকরী করা এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। দেশের শান্তি ও শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এই রকম উপাদান দূর করিয়া রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্যকর করিবার জন্য শাসনবিভাগ চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য শাসনবিভাগ পুলিশবাহিনী পরিচালনা করে, আইনভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

আভ্যন্তরীণ শাসন কাজ

অনেক রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় (যেমন ভারতবর্ষে) শাসন কর্তৃপক্ষ আইন-বিভাগের কাজ বন্ধ রাখিয়া নিজের হাতে সমুদয় শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতে কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থায় সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা

সামরিক ক্ষমতা (Military Power)—শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শাসনবিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণতঃ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া হইয়া থাকেন। সেনাবিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদচ্যুত করার ক্ষমতা তাঁহার থাকে। পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া সেইগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা সন্ধি চুক্তি করার জন্য শাসনবিভাগকে আইন পরিষদের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার জন্য শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার বিষয়ক ক্ষমতা থাকে।

শাসন-বিভাগের কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা

যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত কাজ

বিচার বিভাগীয় কাজ (Judicial Functions): অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচাপতিগণকে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিই নহে, রাজ্য হাইকোর্টের বিচারকগণকেও নিযুক্ত করিতে পারেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বিচার বিভাগীয় কাজ

ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীও এই ক্ষমতা ভোগ করেন। অবশ্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। ভারতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে জেলার ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে কিছু পরিমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (Legislative Functions): যদিও রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। পরে ইহাকে আইনপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিতে শাসনকর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে সেগুলি প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায়। ভারতে রাষ্ট্রপতিই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কাজের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে আইনপরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকরী করা হইতে সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে। বিশেষতঃ মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে এই প্রণয়নের কাজে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মন্ত্রিগণই অধিকাংশক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করেন এবং সরকারপক্ষীয় দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাহা অনুমোদিত করাইয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ছাড়াও অতিরিক্ত ক্ষমতা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বিভিন্ন উপ-আইন (by-laws) প্রণয়ন করিতে পারে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ

আর্থিক ক্রিয়াকলাপ (Financial Functions): সরকারের শাসনবিভাগের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে কর সংগ্রহ করা এবং বাজেট অনুযায়ী সরকারের পক্ষে অর্থব্যয় করা। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়, তাহাতে শাসনবিভাগ নিজের দায়িত্বে দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করে। সরকারের যে বিভাগের মাধ্যমে অর্থসংক্রান্ত কাজগুলি সম্পন্ন হয়, সেই বিভাগকে অর্থ দপ্তর বা রাজস্ব দপ্তর (Finance Department) বলে। যে কোন সরকারকেই আর্থিক বছর আরম্ভ হইবার পূর্বে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের

কর সংগ্রহ করা এবং সরকারী ব্যয় করা

একটি সম্ভাব্য হিসাব বা বাজেট (Estimated Budget) প্রস্তুত করিতে হয়। গণতান্ত্রিক সরকারে আইনসভা অথবা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী এই বাজেট অনুমোদন করিলে শাসনবিভাগ বাজেট অনুযায়ী কর ধার্য করিতে পারে এবং অর্থব্যয় করিতে পারে। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ রাজ্যগুলির অর্থ-ব্যবস্থাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে (এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য)।

একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive): যখন শাসনবিভাগের শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, তখন ইহাকে একক শাসন-কর্তৃপক্ষ বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন ব্যক্তি। তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী অথবা সচিবমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি শাসন কাজ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে একক শাসনকর্তৃপক্ষ থাকায় যে কোন সময় দেশে স্বৈরাচারের সূচনা হইতে পারে।

সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive): যখন শাসন পরিষদ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। এই প্রকার শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)। সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত। এই সাত জনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন হইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডিয়ামও সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই যে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকায় সকলের একমত হইয়া শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমতা ও দায়িত্বে ভাগাভাগি হইলেই শাসন-কর্তৃপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং দেশের শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায়ই অসুবিধাজনক হইবে।

সমষ্টিগত শাসন-কর্তৃপক্ষের গুণ ও ত্রুটি

সরকারী কর্মচারীদের কাজ (**Functions of the Public Servants**): সরকারী কর্মচারীদের মুখ্য কাজ হইতেছে দৈনন্দিন শাসনকাজ

পরিচালনা করা। এই ব্যাপারে মন্ত্রিদের দায়িত্ব আছে, কিন্তু প্রকৃত করণীয় যাহা কিছু আছে, তাহা সরকারী কর্মচারীদেরই সম্পন্ন করিতে হয়। শাসন পরিচালনায় সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রথম পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীগণই করিয়া থাকেন; পরে ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শাসনতন্ত্র, দেশের প্রচলিত আইন এবং সরকার পক্ষের সাধারণ নীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী কর্মচারীগণ দৈনন্দিন শাসন কাজ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সরকারী কর্মচারীগণ দৈনন্দিন শাসনকাজ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে দেশের শাসনকাজের নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবে মন্ত্রিদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটি মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর অপর মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা একটি সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে দেশের শাসনব্যবস্থার নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীগণই গ্রহণ করেন।

দৈনন্দিন শাসনকাজ পরিচালনা করা

শাসনকাজে নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা

শাসনকাজে বিশেষীকরণ (specialisation) করিবার দায়িত্বও সরকারী কর্মচারীদের এবং তাঁহারা এই দায়িত্ব নির্বাহ করিয়া থাকেন নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে। দেশের শাসনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত জটিল আকার ধারণ করিতেছে। এই জটিলতার মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে বিভাগীয় দপ্তরগুলির কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। তাহা সম্ভব হয় সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে।

শাসনকাজের বিশেষীকরণ করা

সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুবিধা (Benefits derived by Public Servants): সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের কাজের জন্য ভাল মাহিনা পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে সরকার হইতে তাঁহারা পেন্সন ও অন্যান্য ভাতা পাইয়া থাকেন। অতি গুরুতর দোষ না করিলে এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে কোন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা যায় না।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজ যতই বাড়িতেছে, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। এইভাবে তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাইতেছে।

বিচার বিভাগের কাজ (Functions of the Judiciary): কোন দেশের শাসন বিভাগের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে ইহার বিচার বিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি

ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবে বিচার বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। আমেরিকার শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নয়; কিন্তু বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করা যায়।

বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে

যদিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্যে, পারস্পরিক কলহ, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মূলরাষ্ট্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মূল-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃত পক্ষে বিচারবিভাগীয় কাজ বলা যায় না; যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবগ নিয়োগ করা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানে ট্রাষ্টি অথবা প্রাপক (Receiver) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্‌জাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করিতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" (declaratory Judgment) বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতার (original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। তাহা ছাড়া, বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ ও শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

মামলা মোকদ্দমার সমাধান করা

অন্যান্য কাজ

আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু, ব্রিটেনের বিচার বিভাগ এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। ব্রিটেনের লর্ড সভা আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়।

আইনের বৈধতা ঘোষণা করা

অনেক ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড মকুব করার মত বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারেন।

শাসন বিভাগের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক

বিচারপতিদের যোগ্যতা (Qualifications of the Judges): বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কতিপয় যোগ্যতা থাকা চাই।

আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য

প্রথমত বিচারপতিগণের আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা উচিত যাহাতে তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হইতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধারণার বশবর্তী তাঁহারা না হন।

রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষতা

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাষ্যকারহিসাবে বিচারপতিগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের সর্বদাই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয়।

দলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary): বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় বিচার করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্যাদা বজায় রাখা। এইজন্য বিচারবিভাগকে সর্বদাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হয়। যদি বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের মর্যাদা রক্ষা

দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই স্বৈরাচারের প্রশ্রয় না দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচারবিভাগকে ইহার কাজ করিতে হয়। বিচারবিভাগ হইতেছে শাসনতন্ত্রে সংরক্ষক। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। বিচারবিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্য ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে। যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার কতটা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখিতে পারিয়াছে এবং শাসনতন্ত্রে বর্ণিত জনগণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছে তাহার মূল্যায়ন করিবার অন্যতম উপায় হইল সেই দেশে বিচারবিভাগ কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তাহার মূল্যায়ন করা। কারণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

শাসন সংরক্ষণ

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির যদি কোনও সময়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিচার-বিভাগকে পক্ষপাতদুষ্ট হইলে চলিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারের বিরোধ মিটাইয়া ফেলা

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার উপায়: বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় নিম্নলিখিত উপায়ের সাহায্যে। প্রথমত, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যে বিচারকগণ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন, তবে শাসনবিভাগ অথবা আইন-পরিষদ ইহাদের কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অথবা কর্মোন্নতির কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে বিচারপতি নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সবাপেক্ষা খারাপ। কারণ, ইহাতে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবার আশংকা থাকে। যদি বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি যথাসম্ভব বিভিন্ন শর্ত হইতে মুক্ত রাখা হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন।

বিচারক নিয়োগ করার নীতি

বিচারকগণ নির্বাচিত হওয়া উচিত নহে

দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন অবস্থায়ই তাঁহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকদের কখনই অন্য কোনও কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। তবেই তাঁহারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন।

বিচারকদের অপসারণ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে

তৃতীয়তঃ, বিচারকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেশী দিতে হইবে যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং তাঁহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন।

বিচারকদের ভাতা বেশী হওয়া উচিত

চতুর্থতঃ, বিচারকগণ অবসর গ্রহণ করিলে অন্য চাকুরি পাইবেন এই জাতীয় প্রলোভন যাহাতে শাসনবিভাগ না দেখাইতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে বিচারকগণ নিজেদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অবসর গ্রহণের পর বিচারকদের চাকরি গ্রহণ করা উচিত নহে

এইজন্য বিচারকগণ যাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে অবসরকালীন পেন্সন পান সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সর্বশেষে, বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। আমেরিকা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না।

বিচারকদের শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বদা মুক্ত রাখিতে হইবে

সংক্ষিপ্তসার

শাসন-বিভাগের কাজ—সাধারণতঃ শাসনবিভাগের পাঁচ প্রকার কাজ করিতে পারে,— (১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Administrative powers) অনুযায়ী কাজ; (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (Military powers) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative powers) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial powers) অনুযায়ী কাজ।

শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কী সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসনবিভাগের। কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করেন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে এবং জনসাধারণকে সেইগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। এইজন্য শাসনবিভাগ পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করিয়া আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য প্রণোদিত করে।

শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণ সামরিক ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যদিও রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগকে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা শাসন কর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন, পরে ইহাকে আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই কাজ করিয়া থাকেন।

বিচার বিভাগের কাজ—কোন দেশের শাসন বিভাগের উৎকর্ষবহুল পরিমাণে ইহার বিচার বিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার

সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। এই কাজগুলি ছাড়াও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় কাজ বলা যায় না, যেমন কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি অথবা প্রাপক (Receiver) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনজাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করিতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" (Declaratory judgment") বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতায় (original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ ও শাসন কতৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের। সুষ্ঠু বিচার কাজের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকা উচিত।

Exercise

1. State the functions of the Executive of a Government.

[সরকারের শাসনবিভাগীয় কাজ বর্ণনা কর।] (৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠা)

2. What are the political, and administrative and legislative functions of the Executive ?

[শাসন বিভাগের রাজনৈতিক, শাসন সম্পর্কিত এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ কি কি ?] (৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠা)

3. Write notes on (a) Single Executive and (b) Plural Executive.

[টীকা লিখ, (ক) একক শাসন কর্তৃপক্ষ এবং (খ) সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ] (৩২৪-৩২৬ পৃষ্ঠা)

4. What do you understand by the term, "Independence of the Judiciary ?" Why is it necessary that the Judicicary should be independent ? What should be the functions and qualifications of the judiciary ?

[স্বাধীন বিচার বিভাগ বলিতে তুমি কি বুঝ ? বিচার বিভাগের স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন কেন ? বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং যোগ্যতা কি হওয়া উচিত ?] (৩২৭-৩২৮ ; ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the functions of the judiciary. What should be the qualifications of Judges ?

[বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর। বিচারকদের যোগ্যতা কি হওয়া উচিত ?] (৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the principles of organization of the judiciary in modern states. (C. U. B. A. Part I 1962)

[আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচার ভাগের সংগঠন সম্পর্কিত নীতি আলোচনা কর।] (৩২৬-৩২৭; ৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the importance and functions of the Judiciary in modern democratic states. (C. U. B. A. Part I 1962, 1964, 1967.)

[আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।] (৩২৬-৩২৯ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the functions of the Public Servants. What are the benefits derived by Public Servants ?

[সরকারী কর্মচারীদের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর। সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুবিধা কি কি ?] (৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠা)

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী
(Representation and Electorate)

[আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব—ভোটাধিকারের ভিত্তি—স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—একাধিক ভোটদান—প্রকাশ্য এবং গোপন ভোট—সীমাবদ্ধ ভোট—নির্বাচন কেন্দ্র—সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব—স্তূপীকৃতভাবে ভোটপদ্ধতি—দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ—প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা—পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা—ভোটদাতা ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক—নির্বাচকমণ্ডলীর কার্য—গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি, নির্দিশেষে গণভোট—গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ—প্রতিনিধিত্ব।]

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial Representation vs. Functional Representation): আধুনিক গণতন্ত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতেই আইনপরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকাই নির্বাচনের কেন্দ্র (constituency) হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সেই এলাকার ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকগণ ভোট দিয়া স্থানীয় প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন। ইহাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব (Territorial Representation) বলা হয়।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে ?

কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ সাধারণতঃ একপ্রকার। কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। কিন্তু তাঁহারা সমস্বার্থসম্পন্ন হওয়ায় নিজেদের একজন আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন। যাঁহারা এই ধরণের আঞ্চলিক নির্বাচন সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন লোকদের স্বার্থ প্রায় একপ্রকার হওয়ায় এলাকার ভিত্তিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করা

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি

উচিত এবং নিজেদের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আঞ্চলিক স্বার্থ জনমতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে।

কিন্তু, অধ্যাপক কোল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে বিভিন্ন মানুষ একই অঞ্চলের অধিবাসী হইলেই যে তাহাদের রাজনৈতিক মতামত একপ্রকার হইবে অথবা তাহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকার হইবে, এই প্রকার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

যদি একই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ একপ্রকার হইত, তবে আমরা দেশে শিল্প-বিরোধ, জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কেরানীদের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাইতাম না। জীবন-সংগ্রাম বর্তমান কালে এত কঠোর হইয়াছে যে মানুষের মধ্যে সমস্বার্থ কল্পনা করাও সহজ নয়। সেজন্য আধুনিক কালের আইন-পরিষদগুলিতে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের (functional representation) দাবি দেখিতে পাওয়া যায়। বৃত্তিগত

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি

প্রতিনিধিত্বে প্রত্যেক বৃত্তির জন্য পৃথক নির্বাচক কেন্দ্র থাকে। বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের রাজনৈতিক মতামতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব আইন পরিষদে হইবে। গণতান্ত্রিক আদর্শ যাহাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেজন্য বৃত্তিগত নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত। একই কাজে রত অথবা একই পেশা বা বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত লোকের স্বার্থ যতটা সমজাতীয় একই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকের স্বার্থ ততটা সমজাতীয় নয়। সেজন্য অনেকে মনে করেন, আইনসভার উচ্চকক্ষে বৃত্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত করা উচিত। নিম্নকক্ষে অবশ্য সর্বদাই জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন হওয়া উচিত। আমাদের দেশে রাজ্যবিধানমণ্ডলের উচ্চকক্ষে বৃত্তিগত নির্বাচন কেন্দ্র আছে, যেমন শিক্ষক কেন্দ্র (Teachers' constituency)। যদি আইন পরিষদে

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু বৃত্তিগত নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, এই নীতি জাতীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। কারণ ইহাতে সমাজের কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়।

ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of Suffrage): মধ্যযুগে যখন নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকগণকে ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং শ্রেণী-বৈষম্যের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করিবার দাবি গৃহীত হইতে থাকে। অনেকের মতে আবার শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত।

ভোটাধিকারের বিভিন্ন ভিত্তি—সম্পত্তি, করপ্রদান, শিক্ষা

কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান করিবার অধিকার লাভের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে না। যাঁহার সম্পত্তি আছে এবং যিনি কর প্রদান করেন, তাঁহার হয়ত প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা নাই অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা নাও থাকিতে পারে। যাঁহাদের মতে সম্পত্তির মালিকানা ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত, তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে কেহ যদি সম্পত্তির অধিকারী না হন, তবে রাষ্ট্রের উপর তাঁহার দরদ থাকিতে পারে না। সুতরাং সম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও যদি কেহ ভোটাধিকারী হন, তবে তাঁহাদের ভোট প্রদান সর্বদা রাষ্ট্রের অনুকূলে না-ও যাইতে পারে। যাঁহাদের সম্পত্তি নাই তাঁহারা কর প্রদান করেন না। যাঁহারা কর প্রদান করেন না তাঁহাদের অমিতব্যয়ী অথবা অপচয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং তাহাদের হাতে ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। আধুনিককালে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হয় না। সামন্ততান্ত্রিক (Feudal) যুগে সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। দেখা গিয়াছে, সম্পত্তির অধিকারী না হইলেও কাহারও রাষ্ট্রের প্রতি দরদের অভাব হয় না।

সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির অধিকারিগণ প্রত্যক্ষ কর প্রদান করিতেন; তখন পরোক্ষ করের প্রচলন ছিল না। বর্তমানকালে সব দেশেই পরোক্ষ কর প্রচলিত আছে এবং সম্পত্তির অধিকারী না হইয়াও যে-কোন নাগরিককেই পরোক্ষ কর প্রদান করিতে হয়। সুতরাং শুধু সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কর প্রদান করিতে হয় এবং কর প্রদান করিলেই ভোট দিবার অধিকার থাকা উচিত এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে দেশের অধিকাংশ লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। আবার যাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সরকারের দৃষ্টিতে যাঁহারা শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাঁহারা প্রকৃতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই মানুষকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভোটাধিকারের উপযুক্ত করে। তাহা ছাড়া, সম্পত্তি কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে

সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার বিপক্ষে যুক্তি

অভিজ্ঞতার যুক্তি

তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য করা উচিত নহে। সাম্যের যুক্তির পক্ষে বলা যায়, মানুষে মানুষে সাম্য না থাকিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। এমন অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী এবং যাঁহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে। তাঁহাদের নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করা উচিত। সেজন্য অনেকে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকা উচিত। ইহাকেই সার্বজনীন ভোটাধিকার-নীতি (Universal Suffrage) বলে। সার্বিক ভোটাধিকার নীতির সমর্থনে বলা হয়, "যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত" ("What touches all, should be decided by all.") সুতরাং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসন নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তিকে বা দলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা। কেননা, সেক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। সার্বিক ভোটাধিকার গণতন্ত্রকে সফল করে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোনও একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইন পরিষদে অবহেলিত হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে সাম্যের যুক্তি

ইহা গণতন্ত্রকে সফল করে

নীতির দিক হইতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার না হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক। ভোটাধিকার প্রদান না করিলে নাগরিকের চরিত্র গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের এই নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝায়

নৈতিক যুক্তি

সার্বজনীন ভোটাধিকারেও ব্যতিক্রম হয়

তাহা সর্বদা সুস্পষ্ট থাকে না। ভোটাধিকার প্রদান করার আগে এবিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা উচিত। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলণ্ড, ভারত এবং আমেরিকায় ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে অনেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে) অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে। সেক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সার্বিক ভোটাধিকারের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা বলেন, ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার নহে। যদি তাহাই হইত তবে সমাজবিরোধী অথবা উন্মাদ নাগরিকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত না। ভোটাধিকার হইতেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রদত্ত একটি অধিকার। যাহারা কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম শুধু তাহাদেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন

জনসাধারণের যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনে কতটা বিবেচনাশক্তি আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা এই অভিমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। অবশ্য জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে "সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত"। ("Universal education must precede universal enfranchisement"—Mill)। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, সার্বজনীন শিক্ষা না থাকিলেও সার্বজনীন ভোটাধিকারে উদ্দেশ্য মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। দেখা গিয়াছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক ক্ষেত্রেই বেশী হইতে পারে। সুতরাং ভোটাধিকার ভালভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যায় যে শিক্ষাই ভোটাধিকারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রেরই উচিত, নাগরিকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা। শুধু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে সমাজে ধনী কর্তৃক গরীবদের শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে। সুতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনই সার্থক হইতে পারে না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Woman suffrage): জন স্টুয়ার্ট মিল প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে কতিপয় যুক্তির অবতারণা করেন। বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল।

বিভিন্ন দেশে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডে ১৮৯৮ সালে ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। পরে ১৯২৮ সালে পূর্বতন নীতির সংশোধন করিয়া স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স পুরুষদের সমান করা হয়। ইটালী এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং জাপানে ১৯৪৭ সালে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতে ২১ বৎসর বয়স্ক সব নারীই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড খুব গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেইদেশে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয় নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই গণভোটের দ্বারা ভোটাধিকার গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সম্প্রতি স্বীকৃত হইয়াছে; এবং ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে সুইজারল্যাণ্ডের মহিলা নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বর্তমানে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

মিলের মতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। শুধু পুরুষেরাই এই অধিকার লাভ করে না, স্ত্রীলোকেরাও ভোট প্রদান

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার অস্বীকার করিলে অন্যায় হয়

করিবার অধিকারের জন্য দাবী করিতে পারেন। কেবলমাত্র স্ত্রীলোক হইবার অপরাধে এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্য স্ত্রীলোককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। শুধু শারীরিক কারণে যদি স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে দুর্বল পুরুষদেরও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত।

যাঁহারা স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না, তাঁহাদের মতে স্ত্রীজাতি ভোটদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যা এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইতে পারে এবং ইহাতে

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি

গার্হস্থ্য-জীবনের প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ ও সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই যুক্তি অনুযায়ী স্ত্রীজাতি যদি অত্যধিক পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া যায়, তবে সাংসারিক জীবনে তাঁহাদের অনেক কর্তব্যই অবহেলিত হইবে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য স্ত্রীজাতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয়; সুতরাং কোনক্রমেই তাঁহাদের ভোটাধিকার

প্রদান করা যায় না। আবার অনেকের মতে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান করিবার সামর্থ্যই যদি ভোটাধিকার লাভের শর্ত হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কখনই ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের যুক্তির বিরুদ্ধে এই কথাও বলা হয় যে অনেক স্ত্রীলোকই ভোটাধিকার চায় না, সুতরাং ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই যুক্তিটি বর্তমানে বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়।

কিন্তু মিলের মতে স্ত্রীলোক হওয়ার অপরাধে মানবসমাজের একটি বিরাট অংশকে সামাজিক জীবনের এই দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। মিল মনে করেন, স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার প্রদান করিলেই যে তাহাদের স্ত্রীসুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে। স্ত্রীলোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে ভোটাধিকার লাভ। স্ত্রীলোকেরা যদি ভোটাধিকার না-ও চায়, তবুও স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এই যুক্তির ভিত্তিতেই তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কারণ, দুর্বলেরই নিরাপত্তার বেশী প্রয়োজন। স্ত্রীলোকেরা ভোটাধিকার লাভ করিলে নিজেদের পরিবারে তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। স্ত্রীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং স্ত্রীলোকের মৌলিক অধিকার খর্ব করিবে। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম নয় বলিয়া তাঁহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত নয়, এই যুক্তি আমরা কখনই সমর্থন করিতে পারি না। স্ত্রীজাতি হয়ত যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেবিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। বর্তমানে যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, স্ত্রীলোকেরাও তখন ঘরের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরের আহ্বানে বিভিন্নকর্মে যোগদান করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন পেশায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে। এমনকি দৈহিক পটুতাও নারীজাতির মধ্যে দেখা যায়। অনেকদেশেই আমরা নারী রক্ষীবাহিনী এবং নারী পুলিশ দেখিতে পাই। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মিলের মতে স্ত্রীলোককে ভোটের অধিকার দিলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হইবে। পুরুষরা যতবেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে পারে, নারী-জাতির পক্ষে হয়ত ততটা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, নারীজাতির মানসিক সুকুমার বৃত্তিগুলিই তাহাদের সত্য ও সৌন্দর্যের উপাসক হইতে এবং

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে মিলের যুক্তি

অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারে শাসন-ব্যবস্থার মান উন্নত হইতে পারে

সর্বপ্রকার দুর্নীতি হইতে দূরে থাকিতে সাহায্য করে। অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের স্ত্রীলোকেরাও ভোটের অধিকারী হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

একাধিক ভোটদান (Plural or weighted Voting): যখন একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, অর্থাৎ, যখন কোন নাগরিক নিজের যোগ্যতার জন্য দুইটি বা ইহার বেশী ভোট প্রদান করিবার অধিকার লাভ করে তখন ইহাকে একাধিক ভোট প্রদান ব্যবস্থা বলে। আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অথবা স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের স্নাতককেন্দ্রে অথবা শিক্ষাকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে। একাধিক ভোটদানের আর একটি প্রকারভেদ আছে,—ইহাতে কোন কোন নাগরিকের ভোটদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব (weighted voting) আরোপ করা হয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত শিক্ষক এবং সম্পত্তির অধিকারীদের ভোটপ্রদান অশিক্ষিত এবং নির্ধনের ভোট প্রদান অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং সম্পত্তিশালী ও নির্ধনের মধ্যে তারতম্য করিবার জন্যই প্রথম শ্রেণীর লোকদের একাধিক ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা সমর্থনযোগ্য নহে।

একাধিক ভোটদানের পক্ষে যুক্তি

এই পদ্ধতির সমর্থনকারীদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এই যুক্তি যে সর্বদাই খাটে তাহা নহে। শিক্ষিত এবং অজ্ঞের মধ্যে তারতম্য যদিও বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায়, ভোট প্রদান ব্যবস্থায় সম্পত্তিশালী এবং নির্ধনের মধ্যে তারতম্য কোন অবস্থায়ই মানিয়া লওয়া যায় না। অবশ্য যাঁহারা এই তারতম্য সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে সম্পত্তিশালীদের স্বার্থ যাহাতে সম্পত্তিবিহীনদের সংখ্যাধিক্যের জোরে আইন পরিষদে অবহেলিত না হয় সেজন্যই তাহাদের একাধিক ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে এই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে এবং থাকা উচিত। সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য করিলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাহা ছাড়া, অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন কোন গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নাই যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং যোগ্যতার পরিমাপ করা যাইতে পারে।

একাধিক ভোটদানের বিপক্ষে যুক্তি

প্রকাশ্য এবং গোপন ভোট (Public and Secret Voting): ভোটদান প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। বর্তমানে গোপন ভোটদান ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। প্রকাশ্যে ভোটদান করিবার নীতির সমর্থনে বলা যায়, ভোটদাতাগণ যদি সকলের সামনেই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দান করেন, তবে ইহা তাঁহাদের সৎসাহসের পরিচায়ক হইবে। ভোট প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য এবং ইহা সর্বসমক্ষেই হওয়া উচিত। কিন্তু, এই ব্যবস্থা যে সর্বদাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকারক হয়, তাহা নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রার্থীগণ ভোটদাতাগণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যদি কোনও কেন্দ্রে একাধিক নির্বাচন-প্রার্থী থাকেন, তখন কোন ভোটদাতার পক্ষে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা, এজন্য তাহাকে এক পক্ষের নিন্দা এবং অপর পক্ষের স্তুতি কুড়াইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে ভোটদাতা ভয়ে অথবা কাহারও প্রতি বাধ্যবাধকতার ফলে নিজের বিবেকের নির্দেশে ভোট প্রদান করিতে পারেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করিয়া ভোট আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। দল-নিরপেক্ষ ভোটদাতার পক্ষে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা প্রকাশ্য অপেক্ষা গোপনে করাই সহজ। গোপনে ভোটদাতা যখনই ভোট প্রদান করিবেন তখন কোন রাজনৈতিক দলই জানিতে পারিবে না তিনি কাহাকে ভোট দিয়াছেন। সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মর্যাদাও উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় এবং ভোটদাতাও নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পারেন। যদি রাষ্ট্র কখনও ভোটদাতাকে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করিবার ফলস্বরূপ উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তবেই প্রকাশ্য ভোট প্রদান করিবার নীতি চালু করা সম্ভব। গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ভোটদাতাকেই তাঁহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত এবং ইহা গোপন ভোট প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভবপর হইতে পারে।

গোপন ভোটদানের ক্ষেত্রে কাহারও দ্বিমত নাই

প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করার অসুবিধা

নির্বাচনকেন্দ্র (Constituency): যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকার নাগরিকগণ আইন পরিষদে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তখন সেই এলাকাকে নির্বাচন কেন্দ্র (constituency) বলা হয়। নির্বাচন কেন্দ্র যখন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ইহাকে আঞ্চলিক নির্বাচন-কেন্দ্র (Territorial constituency) বলে। আবার যখন নির্বাচন কেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হয়, তখন ইহাকে বৃত্তিগত নির্বাচন কেন্দ্র বলে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বিধান পরিষদের Legislative

Council) জন্য স্নাতকদের একটি নির্বাচন কেন্দ্র আছে। স্থানগত নির্বাচন কেন্দ্র সাধারণত: নির্দিষ্ট এলাকার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। যখন প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে আইনপরিষদে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তখন ইহাকে একজন সদস্যসমন্বিত নির্বাচন কেন্দ্র (single-member constituency) বলে। যখন প্রতি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে আইন পরিষদে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তখন.ইহাকে বহুসদস্য-সমন্বিত নির্বাচন কেন্দ্র (multiple-member constituency) বলে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব (Representation of the Minorities) : গণতান্ত্রিক সরকারের আইন পরিষদে যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, সেই দলই সরকার গঠন করিয়া থাকে। যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের আইনসভায় কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে প্রতিপদেই তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত না হয়,

সংখ্যাল'ঘুর প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যুক্তি

সেজন্য জন স্টুয়ার্ট মিল সমগ্র জনসাধারণের সরকারকে শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকারে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠদের লইয়া সরকার গঠন করা এবং সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিবেন।[১] আইন যদি জনসাধারণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে তবে ইহা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করিলে চলিবে না,—সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছাকেও আইনের মধ্যে রূপ দিতে হইবে; তাহা না হইলে সেই আইন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা অবহেলিত হয় তবে দেশে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে চিন্তা করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করা উচিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র কখনই সার্থক হয় না। মিলের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব যাহাতে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার, আজ যে দল আইনসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ, ভবিষ্যতে হয়ত সেই রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু যাঁহারা আইন পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার

১। "It is an essential part of Democracy that minorities should be adequately represented."— Mill

করেন না, তাঁহাদের মতে ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। কেননা আইনসভায় প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ইহার সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে জাতীয় সমস্যাবলীর আলোচনা করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা আইনপরিষদের নির্বাচনে জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে যুক্তি

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমানুপাতিক নির্বাচন প্রথা চালু করিলে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন এবং নির্বাচনপদ্ধতি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হয়।

চতুর্থতঃ, প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চায়, তবে আইনপরিষদ কতিপয় বিরোধী দলের পারস্পরিক কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। প্রতিটি দলই তখন অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠনের চেষ্টা করিবে এবং মন্ত্রিসভার ভিত্তি অনেক দুর্বল হইয়া পড়িবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। সংখ্যালঘিষ্ঠদের যদি প্রতিনিধিত্বের কোনও সুযোগই দেওয়া না হয়, তবে গণতন্ত্র ইহার মূল আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রণালী আমরা দেখিতে পাই :—

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম দুই প্রকার। প্রথমটিকে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে (single transferable vote) নির্বাচন-পদ্ধতি বলা হয়। ইহা টমাস হেয়ারের নাম অনুযায়ী হেয়ারের পদ্ধতি (The Hare System) নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে তালিকা পদ্ধতি (List System) এই নিয়মটি খুবই জটিল। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অথবা সম্প্রদায়ের নির্বাচন-সংখ্যা এবং মোট প্রতিনিধি সংখ্যার মধ্যে অনুপাত বজায় রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্বাচন করা; যেমন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংখ্যা যদি মোট নির্বাচক মণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ হয়, তবে তাহারা আইনপরিষদের এক-তৃতীয়াংশ আসন পাইবে। এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত হইবার জন্য দুইটি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কোটা (Quota) নির্ধারণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী যত ভোটদান করা হয় সেই সংখ্যাকে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফলকে কোটা হিসাবে ধরা হয়।

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট প্রদান প্রথা, হেয়ারের পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটের সংখ্যাকে মোট আসন-সংখ্যার একটি বেশী সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল অনুযায়ী যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই

সংখ্যার সহিত পুনরায় ১ যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, কোন প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য সেই সংখ্যা আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'ড্রুপ' কোটা (The Droop quota) বলে। নিম্নলিখিতভাবে ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে—

$$\text{কোটা} = \frac{\text{মোট ভোট সংখ্যা}}{\text{মোট আসন সংখ্যা} + ১} + ১$$

প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পাশে ভোটদাতা ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা তাহার প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করেন। যে নির্বাচনপ্রার্থী প্রথম মনোনয়ন সর্বাপেক্ষা বেশী পান, তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার প্রথম মনোনয়নের ভোট 'কোটা' অপেক্ষা যতগুলি বেশী পান, সেগুলি যে যে প্রার্থীরা দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট আসনগুলি পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে এইভাবে গণনা চলিতে থাকে। এই নিয়মে ভোটদাতার প্রথম পছন্দ অথবা প্রথম মনোনয়ন কার্যকর না হইলেও একটি ভোটও অন্ততঃ কার্যকর হইবে। ১৮৫১ সালে টমাস্ হেয়ার (Thomas Hare) নামে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার "The Election of Representatives" বইয়ে এই নিয়মের প্রবর্তন করেন। সেইজন্য এই নিয়মটিকে হেয়ার পরিকল্পনা (Hare scheme) বলা হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল হেয়ার (Hare Scheme) সমর্থন করিয়া ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "...the very greatest improvement yet made in the theory and practice of government" এই নিয়মটি খুব জটিল্ বলিয়া সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে দেশে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই অজ্ঞ অথবা অল্পশিক্ষিত, সে দেশে এই প্রথা সফল হইবে না।

তালিকা প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন

সমানুপাতিক নির্বাচনের আর একটি প্রণালী আছে; ইহাকে **তালিকা-প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন** (Proportional representation by the List System) বলা হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি তালিকা (list or panel) গঠন করে। নির্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা মোট আসন-সংখ্যার সমান হওয়া চাই। নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকিবে ভোটদাতা ততগুলি ভোটপ্রদান করিতে পারিবে। এই নিয়মটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যখনই ভোটদাতা ভোট প্রদান করিবেন, তখন তাঁহাকে প্রার্থী হিসাবে ভোট প্রদান না করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত তালিকা অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক তালিকার উপর

যতগুলি ভোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত তালিকা হইতে নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। এক্ষেত্রে 'কোটা' নির্ধারিত হয় মোট ভোটসংখ্যা এবং মোট আসন-সংখ্যার ভাগফল দ্বারা।

এই নিয়মটিও যে খুব সরল তাহা নহে। তবে একক হস্তান্তরযোগ্য* ভোট প্রদান করিবার নিয়মের মত ইহা তত জটিল নয়। এই নিয়মটির একটি বিশেষ সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং প্রত্যেকটি দলই নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে আইন পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। হেয়ার পরিকল্পনার ন্যায় এই নিয়মটি ব্যয়সাধ্য নহে। তবে এই ব্যবস্থার একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচন-প্রার্থীর যোগ্যতা অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থ এবং প্রভাবই ভোটদাতার কাছে বড় হইয়া দাঁড়ায়।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাগুণ (**Merits and Demerits of Porportional Representation**)**:** সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণ হইতেছে এই যে প্রতিটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই ইহার শক্তি অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব পায়। আইনসভার দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব হয় এবং আইনের মধ্যেও সমাজের সকল শ্রেণীর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। এই ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার সাম্যের নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। হেয়ারের পদ্ধতিতে প্রত্যেক নির্বাচককে নিজের পছন্দ জ্ঞাপন করিতে হয় বলিয়া তিনি কাহাকে প্রথম পছন্দ (Preference) প্রদান করিবেন অথবা দ্বিতীয় পছন্দ প্রদান করিবেন সে বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়; ইহাতে নির্বাচকের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণ

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে না। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতি ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয় স্বার্থ অবহেলিত হয় এবং শ্রেণীগত অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের আগ্রহ বাড়িয়া যায়; ইহার ফলে সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, হেয়ারের পদ্ধতি খুবই জটিল। চতুর্থতঃ, তালিকাভুক্ত নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে অনেক অযোগ্য প্রার্থী থাকিতে পারে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ত্রুটি

সীমাবদ্ধ ভোট (**Limited voting**)**:** আইন পরিষদে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার একটি অন্য উপায় হইতেছে সীমাবদ্ধ ভোট প্রদান করিবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সীমাবদ্ধ

প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহাতে সংখ্যালঘুগণও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোনও কেন্দ্রে সাতটি আসন থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কোনও ভোটারকেই চারজনের বেশী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইবে না। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুগণ বড় জোর চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। অপর তিনজন প্রতিনিধি স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

পুঞ্জীকৃতভাবে ভোট প্রদান পদ্ধতি (**Cumulative Vote System**)—এই নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন আছে ভোট প্রদানকারী ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পায় এবং কোন প্রার্থীকে কয়টি ভোট দিবে তাহাও ভোটদাতার উপর নির্ভর করে। যদি কোনও কেন্দ্রে চারিটি আসন থাকে, তবে ভোটদাতা চারিটি আসনই কোন প্রার্থীকে দিতে পারে, অথবা তিনটি ভোট একজনকে দিতে পারে অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছানুসারে ভোটদাতা ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। সংখ্যালঘুগণ এই নিয়ম অনুযায়ী আইনপরিষদে তাহাদের প্রার্থী নির্বাচনের একটি বিশেষ সুযোগ পায়; যখন সমুদয় ভোট একজনকেই দেওয়া হয়, তখন ইহাকে plumping বলা হয়।

এই নিয়মের একটি প্রধান ত্রুটি হইল, ইহাতে অনেক ভোট নষ্ট হইয়া যায়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থী হয়ত তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক ভোট পাইতে পারেন, কিন্তু অন্য একজন অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় অথচ বেশী উপযুক্ত প্রার্থী হয়ত কম ভোট পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ (**Second Ballot System**): কোন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে পারেন, সেজন্য অনেক সময় দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ করা হয়। ধরা যাক, কোন নির্বাচনকেন্দ্রে বার হাজার ভোট দেওয়া হইয়াছে এবং তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন চার হাজার, একজন তিন হাজার এবং একজন পাঁচ হাজার ভোট পাইয়াছেন। অর্ধেকের বেশী কেহই পান নাই বলিয়া কাহারও পক্ষেই নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। তখন যে দুইজন যথাক্রমে চার হাজার ভোট এবং পাঁচ হাজার ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হইবে এবং এইভাবে একজনকে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে দেওয়া হইবে। এই পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে খুব খারাপ নয়। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেননা, এই ব্যবস্থায় প্রার্থী-নির্বাচনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং নির্বাচনের খরচও অনেক বাড়িয়া যায়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Direct Election) : নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি আছে, একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের প্রার্থী নির্বাচিত করেন। আমাদের দেশের রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির নিম্নকক্ষের জন্য পার্লামেন্টের লোকসভার জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহাতে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের প্রার্থী নির্বাচন করিবার সুযোগ পান, এবং তাঁহাদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ভোটদাতাদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বও অনেক বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন নির্বাচকগণের রাজনৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সহায়ক।

ইহাতে ভোটারদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় জনসাধারণই রাষ্ট্র-কর্ণধারগণকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করে বলিয়া নির্বাচনের ভাল-মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়া যায়। সুতরাং রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে এবং সুদৃঢ় জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

জনমত গঠনে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়। যাঁহারা শাসক, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের কাজের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ, নির্বাচনকালে ভোটদাতাগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেজন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত হয়।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতা

সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথায় দুর্নীতিমূলক প্রভাবের সম্ভাবনা বেশী থাকে না, কারণ নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে বিরাট নির্বাচকমণ্ডলীকে টাকা খরচ করিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকারে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভবপর নহে।

ইহাতে দুর্নীতির সম্ভাবনা কম

কিন্তু, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথার কয়েকটি ক্রটি আছে। যদি নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হন, তবে তাঁহারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন না। আধুনিক গণতন্ত্রে আমরা যে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা দেখিতে পাই, ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোটদাতাগণের সতর্কতা ও বুদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। অজ্ঞ জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না। চতুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই আবেগময়ী বক্তৃতার সাহায্যে জনচিত্ত জয় করিতে পারেন এবং জনগণও প্রতিনিধি-নির্বাচনে বিভিন্ন দিকের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও অবকাশ পায় না। আধুনিক

ইহার ক্রটি

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে নানা প্রকার অসাধু ও অশোভন আচরণ করিতে হয় বলিয়া ক্ষেত্র বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না। ইহাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না।

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Indirect Election): পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাথমিক ভোটদাতাগণ মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণকে নির্বাচন করে এবং মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ, প্রতিনিধি এবং নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইতেছে, ইহাতে সর্বাধিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর হয়। সকল প্রতিনিধিই নির্বাচনে সমান দক্ষ নহেন। পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিনিধিগণ মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন বলিয়া আসল প্রতিনিধি নির্বাচনে অল্প-সংখ্যক নির্বাচক থাকেন। এই নির্বাচকগণ সাধারণতঃ প্রাথমিক নির্বাচকগণ অপেক্ষা অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তাহা ছাড়া, চূড়ান্ত নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা অল্প থাকে বলিয়া নির্বাচনজনিত উত্তেজনা, দুর্নীতি এবং গোলযোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়

পরোক্ষ নির্বাচনের আরেকটি সুবিধা হইল এই যে ইহা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ন্যায় ব্যয় বহুল নহে। তাহা ছাড়া, পরোক্ষ নির্বাচনের দলীয় প্রচারকার্য তীব্ররূপ ধারণ করে না এবং ইহাতে দলপ্রথার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু পরিমাণে অনুপস্থিত থাকে।

ইহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং দলপ্রথার ত্রুটিগুলি দূর হয়।

পরোক্ষ নির্বাচনের অনুষ্ঠান সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কিছু দিন পরে হয়। ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের সময় ভাবাবেগের তীব্রতা কিছু কম হয় এবং প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্থির মস্তিষ্কে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন। ইহাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভবপর হয়।

পরোক্ষ নির্বাচনে সময়ের অবকাশ থাকে বলিয়া ইহাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভবপর হয়

কিন্তু, পরোক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথমত, ইহা গণতন্ত্রবিরোধী। নির্বাচক এবং প্রতিনিধির মধ্যে দূরত্ব যতই বেশী হইবে, নির্বাচকদের রাজনৈতিক চেতনা ততই কমিয়া যাইবে। চূড়ান্ত নির্বাচনে প্রাথমিক নির্বাচকদের কোনও ভূমিকা নাই বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক শিক্ষা-প্রসারের এবং রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া আধুনিককালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পরোক্ষ নির্বাচন- প্রথা সমর্থন করেন না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকদের যতটা রাজনৈতিক শিক্ষা থাকে, পরোক্ষ

ইহা গণতন্ত্র বিরোধী

নির্বাচনে ততটা থাকে না, এবং ইহাতে নির্বাচকদের উৎসাহও অনেক কমিয়া যায়।

ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার পরিপন্থী ইহাতে দল প্রথার ত্রুটি বরং বাড়িয়া যায়

দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ নির্বাচনে দল প্রথার ত্রুটি কমিয়া যায় বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনগণ যেখানে নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনকার্যে নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারেন না। দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই তাঁহাদের চলিতে হয়। এমন কি দলের নির্দেশে অবাঞ্ছিত প্রতিনিধিকেও নির্বাচন করিতে হয়। ইহাতে পরোক্ষ নির্বাচনে দল প্রথার ত্রুটি বাড়িয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন নিছক বহিরঙ্গ হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে চূড়ান্ত নির্বাচন হইবার পূর্বেই শুধু নির্বাচকদের নির্বাচন হইতেই জানা যায় রাষ্ট্রপতি কে হইবেন। কারণ, নির্বাচকগণ নির্বাচিত হইবার পূর্বেই দলীয় ভিত্তিতে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা যদি রাষ্ট্রপতির নির্বাচক হইতে পারেন, তবে তাঁহারা কাহাকে ভোট দিবেন। তবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথা অনুসরণ করা হয়। ভারতের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথায় নির্বাচিত হন। অবশ্য যখন নির্বাচকদের সংখ্যা অতিরিক্তভাবে বেশী, তখন পরোক্ষ নির্বাচন প্রথার একটি মূল্য আছে।

পরোক্ষ নির্বাচন বহিরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে।

চতুর্থতঃ, কিন্তু যদি মনে করা হয়, মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ প্রাথমিক নির্বাচকদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তবে ইহা ভুল মনে করা হয়। কারণ, যাহাদের প্রাথমিকভাগে মধ্যবর্তী নির্বাচকদের মনোনয়ন করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাদের চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্যতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। এইদিক হইতে বিচার করিলে পরোক্ষ নির্বাচন অযৌক্তিক।

ইহা অযৌক্তিক ও দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকে

সর্বশেষে, পরোক্ষ নির্বাচনে দুর্নীতির প্রসারের সম্ভাবনা থাকে।

ভোটদাতা অথবা নির্বাচকমণ্ডলী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Voter or the Electorate and the Representative): ভোটদাতার সহিত নির্বাচিত প্রতিনিধির কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটদাতার নির্দেশের বাহিরে কিছু করা উচিত নয়; কারণ তিনি ভোটদাতাদের প্রতিভূ।

আবার কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে যে সর্বদাই ভোটদাতার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হইবে, এরকম কোনও কথা নাই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাকে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির অধিকারী বলিয়াই নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকদের ভোট পান। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহার নিজের জ্ঞান এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে কাজে লাগানো উচিত। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইন-পরিষদের সদস্যগণকে সমগ্রজাতির প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কোনও অঞ্চলের বিশেষ নির্দেশ তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি শুধু নির্বাচকদের প্রতিভূ—এই মতবাদকে লিবার (Lieber) তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহা "অযুক্তিযুক্ত, অসমঞ্জস এবং অনিয়মতান্ত্রিক" (unwarranted, inconsistent and unconstitutional.")।

অনেকের মতে প্রতিনিধিদের সর্বদা ভোটদাতার নির্দেশে চলা উচিত

প্রতিনিধি কর্তৃক ভোটদাতার নির্দেশে চলার বিপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সর্বদাই ভোটদাতাদের নির্দেশে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তখনই প্রশ্ন উঠে, কিভাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা ৬০।৭০ হাজার নির্বাচকের মতামত গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

কিভাবে ভোটদাতা নির্দেশ প্রদান করিবেন

তৃতীয়তঃ, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাঁহার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ না দিলে অথবা তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে ভোটদাতাদের বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত না করিলে আইনপরিষদে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই আইন পরিষদের সদস্য থাকিতে চাহিবেন না। বার্ক (Burke) সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে ভোটদাতাদের এমন কোন দাবী উত্থাপন করা উচিত নয় যে প্রতিনিধিগণ সর্বদা তাঁহাদের কথা অনুযায়ী চলিবেন। পার্লামেন্টের প্রতিনিধিগণশুধু ভোটদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহাদের প্রতিভূ নহেন।[১] ইংলণ্ডে এই দাবি কখনই স্বীকৃত হয় না।

ইহাতে প্রতিনিধিদের যোগ্যতার যাচাই হয়না

চতুর্থতঃ, যদিও ইহা খুবই স্বাভাবিক যে ভোট দিবার সময় ভোটদাতাগণ নির্বাচনপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানিবার

১। "...a member of Parliament is a representative and not a delegate." ED, Burke

অধিকারী, তবুও নির্বাচন-প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনের সময়েই তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি খুঁটিনাটি বিবরণী ভোটদাতার সামনে তুলিয়া ধরা সব সময়েই সম্ভবপর নয়। কারণ, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ চিরপরিবর্তনশীল এবং সেজন্য মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সঠিক প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি ভাবে নির্বাচনপ্রার্থী আইনপরিষদের সদস্য হইয়া, কিভাবে দেশবাসীর সেবা করিতে চাহেন সেই সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ নীতি ভোটদাতাগণের কাছে বর্ণনা করা উচিত এবং যতদূর সম্ভবপর নিজের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়া সেই নীতিগুলি পালন করা উচিত। আইন-পরিষদে প্রবেশ করিবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি মনে করেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁহার কতিপয় নীতির পরিবর্তন অথবা সংশোধন করা উচিত, তবে তাহা করিবার স্বাধীনতা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দেওয়া উচিত। একথা মনে রাখিতে হইবে নির্বাচক অপেক্ষা নির্বাচিত প্রতিনিধির রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী। তাহা ছাড়া, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে ভোটদাতার নির্দেশ গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

ইহা সর্বদা সম্ভবপর নহে

তবে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বদাই ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী না করিয়া তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলেরই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকা উচিত। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ নির্বাচকমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট না করিতে পারে, তবে ইহা খুবই স্বাভাবিক যে নির্বাচনকালে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-দল ভোটদাতাগণের সহানুভূতি হারাইবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কয়েক বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচনপ্রার্থী লোকদের রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে নিজের রায় প্রদান করিতে পারে। কিন্তু, এক্ষেত্রে অধ্যাপক লাস্কির (Prof. Laski) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির কখনই নিজের দলের ভৃত্য হইয়া থাকা উচিত নহে। তাহাকে নির্বাচিত করা হয় যাহাতে তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভবপর তাহা তিনি উৎকৃষ্টভাবে করিতে পারেন। তিনি যদি সর্বদাই স্থানীয় রাজনৈতিক জোটের নির্দেশে পরিচালিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন, তবে তাঁহার নৈতিক মেরুদণ্ড অথবা ব্যক্তিত্ব কোনটিই থাকিবে না।[১]

প্রতিনিধিকে নিজের দলের নিকট দায়ী থাকা উচিত

১। "A member is not the servant of a party in the majority in his constituency. He is elected to do the best he can in the light of his

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার ভোটদাতাগণের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, সেজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটদাতাদের ভৃত্য নহেন। যদি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তবে তিনি ভোটদাতাগণের নির্দেশ না লইয়াই বিভিন্ন কাজ করিতে পারেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর কার্য (Functions of the Electorate) : গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বৈরতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয় দর্শক হওয়া ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা নাই, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ শাসককে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। নির্বাচকগণের প্রধান কাজ হইল ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়ত, যাহাতে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারে, সেদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর লক্ষ্য রাখা উচিত।

তৃতীয়ত, নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে শাসনকর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় জনমত থাকা চাই। প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের (instructed representation) প্রবর্তন করা। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিনিধি ভোটদাতাগণের প্রতিভূ এবং তাহাদের নির্দেশ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিনিধিদের আইনপরিষদে নিজেদের মতামত প্রকাশের এবং কাজকর্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। অধ্যাপক লাস্কি নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে প্রতিনিধিদের সর্বদাই ভোটদাতাগণের প্রতিভূ হইয়া তাহাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা সম্ভবপর নহে। কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলতঃ সমগ্র দেশের প্রতিনিধি,—কোন স্থানীয় অঞ্চল অথবা রাজনৈতিক দলবিশেষের নহে।

প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Electors over their Representatives) : নির্বাচকগণ যদি দৃঢ় জনমত গঠন করিতে পারে, তবে তাহারা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ জনমতের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কখনই জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, সেইজন্য নির্বাচকদের উচিত হইতেছে এমনভাবে দৃঢ় জনমত গঠন করা যেন নির্বাচিত প্রতিনিধি কোন অবস্থায়ই জনমতের বিরুদ্ধে অথবা নির্বাচকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ

কিভাবে নির্বাচকগণ প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন

intelligence and his conscience. Where he is merely a delegate instructed by a local caucus, he would cease to have either morals or personality." —Laski.

না করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ঘন ঘন নির্বাচন (frequent election), পদচ্যুতি (Recall), গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), —এইগুলির সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু পদচ্যুতি, গণভোট এবং গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা সব গণতান্ত্রিক দেশে নাই। সুইজারল্যাণ্ডে আমরা এই ধরণের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই। সুইজারল্যাণ্ডে যদি জাতীয় পরিষদের (National Assembly) সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন অথবা সংস্কার না করেন, তবে জনসাধারণ গণ-উদ্যোগের (initiative) মাধ্যমে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়।

নির্বাচকগণ যদি প্রকৃতই প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তবে নির্বাচকদের পূর্বে প্রতিনিধিগণ নির্বাচকদের নিকট যে প্রতিশ্রুতিগুলি (Pledges) প্রদান করেন সেইগুলি ঠিক ভাবে গঠিত হইতেছে কি না তাহা তাঁহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া যাইবার পর পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রতিনিধিকে পদচ্যুত বা ফিরাইয়া আনিবার (Recall) ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবশ্য বড় বড় দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নহে।

সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ এইগুলিই নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে সুদৃঢ় জনমত গঠন করে। সুতরাং নির্বাচকদের কাজ হইল জনমত গঠনের এই উপায়গুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা এবং এইগুলির মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং গণতন্ত্রে নির্বাচকগণ কখনই নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে না। এইজন্য নির্বাচকদের উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। নির্বাচক ঠিক থাকিলে প্রতিনিধির পক্ষে নির্বাচকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার সাহস হয় না।

প্রতিনিধি নিবাচনের সময়ে নির্বাচকদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করার অধিকার থাকা উচিত। তাহা হইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এমন কিছু সাহস করিবেন না যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনের সময় নির্বাচকদের বিরাগভাজন হইতে হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে নির্বাচকগণ তাঁহাদের পুনরায় নির্বাচিত নাও করিতে পারেন।

গণভোট (Referendum)—"গণভোট" পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভা যদি কোনও আইন প্রণয়ন করে, তবে ইহা জনগণের অনুমোদনের জন্য ভোটদাতাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা এই আইন অনুমোদন করে, তবেই ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণভোট অনেক সময়ে আবশ্যিক (compulsory) হয়; আবার কোন কোন সময় ইহা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক (optional)। আবশ্যিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, এমনকি

সাংবিধানিক আইনগুলিও জনগণের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। ঐচ্ছিক গণভোটে নির্বাচকদের অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ অংশ কোনও একটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্য দাবী জানাইলে, ইহা নির্বাচকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলিতে সমুদয় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। আমেরিকার কতিপয় অঙ্গরাজ্যে সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তনের সহিত জড়িত আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে দেশবিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের সীমান্তে অঞ্চল বিশেষের ভারত অথবা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণভোটের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

পদচ্যুতি (Recall) —কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদাতাগণের নির্দেশ অমান্য করিয়া রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যান, তখন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার আগেই "পদচ্যুতির" সাহায্যে তাহাযে অপসারণ করা চলে।

গণ-উদ্যোগ (**Initiative**)—গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটদাতাগণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনও আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়া সেই খসড়া আইনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দিবার জন্য আইন পরিষদের নিকট দাবী জানাইতে পারে। সুইস্ ক্যান্টনগুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র এবং আমেরিকার অঙ্গরাজ্যগুলিতে শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বিল গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আইনপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে।

নির্বিশেষ গণভোট (**Plebiscite**)—গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির জন্য আজকাল অনেক রাষ্ট্রে নির্বিশেষ গণভোট পদ্ধতির (Plebiscite) প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে শুধু তথাকথিত ভোটদাতাগণই নহে, জনসাধারণের সকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ (Referendum vs. Bicameral Legislature): যাঁহারা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন-পরিষদের সমর্থক, তাঁহাদের মতে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রণীত সমুদয় আইন যাহাতে জনগণের বিশেষ একটি অংশের স্বার্থবিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে। গণভোটের মাধ্যমেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে গণভোটের মাধ্যমে যদি তাহা জনস্বার্থ সম্মত কিনা যাচাই করিয়া লওয়া

গণভোট কখনও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে কিনা

হয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রকৃতপক্ষে নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে না। সেদিক হইতে বিচার করিলে গণভোট ব্যবস্থা চালু করিলে নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধে ইহা যে উচ্চকক্ষ হইতে অধিকতর কার্যকর হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বড় বড় রাষ্ট্রে যে সকল আইন প্রণীত হয়, সেগুলির মধ্যে অনেক আইন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত এবং সেক্ষেত্রে সমগ্রদেশ জুড়িয়া গণভোটের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের সময় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে এবং তাহা সম্ভবপর হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদাতা-গণকে নিজেদের মতের অনুকূলে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাতে গণভোটের প্রকৃত উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। তাহা ছাড়া, গণভোটের সাহায্যে যদি আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহা মাত্র কয়েকটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে হইতে পারে,—সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রেই গণভোটের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। কিন্তু, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যদি আইন পরিষদে উচ্চকক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই এবং বিশেষতঃ সকল প্রকার আইন প্রণীত হইবার সময় নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধকারী হিসাবে থাকিতে পারে।

বড় বড় দেশে গণভোট সম্ভবপর নয়

বড় বড় রাষ্ট্রে গণভোট সম্ভব নহে

ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে গণভোটের সাহায্যে আইন পরিষদের নিম্ন-কক্ষগুলির ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে গণভোট ব্যবস্থা পরিচালনা করা অসুবিধাজনক হয় বলিয়া আইন পরিষদের উচ্চকক্ষের সাহায্যেই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, ছোট ছোট রাষ্ট্রেও সব সময়েই গণভোটের অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য আইন পরিষদে উচ্চকক্ষের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। বরাবরের জন্য গণভোট অপেক্ষা আইন পরিষদের উচ্চকক্ষই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তবে সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের গঠন সংশোধিত হওয়া উচিত এবং ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যখন উচ্চকক্ষ কিছুতেই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিহত করিতে

ছোট ছোট দেশগুলিতে গণভোট হইতেছে একটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

পারে না, তখন গণভোটের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিম্নকক্ষের স্বৈরাচার প্রতিহত করার পক্ষে ইহা আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর হয়। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকটের সমাধানকল্পে যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইহা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, তাহাতে জনমত সুদৃঢ় ভাবে গঠিত হইতে পারে। জনমত যদি সুদৃঢ়ভাবে সুসংগঠিত থাকে, তবে তাহাই আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে।

Exercise

1. Explain briefly the claims of (a) functional and (b) territorial representation in the modern state. Which of them do you recommend and why ?

[আধুনিক রাষ্ট্র (ক) বৃত্তিমূলক এবং (খ) আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের দাবীগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। এইগুলির মধ্যে কোনটি তুমি সমর্থন কর এবং কেন ?] (৩৩১-৩৩২ পৃষ্ঠা)

2. Examine the different views regarding the basis of suffrage. Do you spport universal suffrage ? Give reasons for your answer.

[ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষা কর। তুমি কি সার্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। (৩৩২-৩৩৫ পৃষ্ঠা)

3. State the case for and against woman suffrage.

[স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি বর্ণনা কর। (৩৩৬-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

4. Write notes on ;—

(a) Plural or weighted voting, (b) Public and secret voting (c) Limited voting and (d) Constituency

[টীকা লিখ :—(ক) একাধিক অথবা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ভোট, (খ) প্রকাশ্য এবং গোপন ভোট ; (গ) সীমাবদ্ধ ভোট এবং (ঘ) নির্বাচন কেন্দ্র।] (৩৩৮-৪০ পৃষ্ঠা, ৩৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

5. Describe the different methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature.

[আইনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য যে সকল পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে সেগুলি বর্ণনা কর।] (৩৪১-৩৪৩ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the merits and demerits of direct and indirect elections respectively.

[প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।] (৩৪৫-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

7. What, according to you, should be the proper relation between the representative and his constituency ? State your reasons fully.

(C. U. B. A. 1970)

[নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহার নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি হওয়া উচিত ? তোমার যুক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা কর।] (৩৪৭-৩৫০ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the functions of the electorate.

[নির্বাচকমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।] (৩৫০ পৃষ্ঠা)

9. Write notes on: (a) Referendum, (b) Recall, (c) Initiative and (d) Plebiscite.

[টীকা লিখ: (ক) গণভোট, (খ) পদচ্যুতি, (গ) গণ-উদ্যোগ, এবং (ঘ) বিশেষ গণভোট।] (৩৫১-৩৫২ পৃষ্ঠা)

10. Which is the better check on a populary elected legislative body in a modern stare, a Referendum or a Second Chamber? Give reasons for your answer.

[আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভার উপর কোনটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে—গণভোট অথবা আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (৩৫২-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

11. What are the different methods by which the electorate can exercise control over the representatives in modern democracies?

(C. U, B. A. Part I, 1968)

[আধুনিক গণতন্ত্রে কি কি বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন?] (৩৫০-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the different mothods of minority representation in the legislature. (C. U. B. A. Part, I 1966, 1971)

[আইনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা কর।] (৩৪১-৩৪৩ পৃষ্ঠা)

13. Discuss the arguments for and against minority reqresentntion.

[সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আলোচনা কর।] (৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠা)

14. Discuss the need for and the methods of minority representation in modern democracies. (C. U. B. A. 1968)

[আধুনিক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।] (৩৪০-৩৪৩ পৃষ্ঠা)

ঊনবিংশ অধ্যায়

জনমত
(Public Opinion)

[জনমতের স্বরূপ—জনমতের কার্যকারিতার উপায়—জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব।]

'জনমত' কথাটির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোমান যুগে "Consensus Populi" কথাটি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যবহার করা হইত। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশো সর্বপ্রথম জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হয়। জনমতের এই অবিরত ক্রিয়াকলাপই হইতেছে গণতন্ত্রের গতিশীলতার ইঙ্গিত। ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, "This incessant activity of popular opinion is the dynamic of democracy".[১]

জনমতের স্বরূপ (Nature of Public Opinion) : অনেক সময় বলা হয় জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণেরও নহে, এবং ইহা একটি প্রকৃত মতও নহে। (..."It is neither *public* nor *opinion*") সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মাত্রেই জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবে এমন কোন কথা নাই। লোয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য কোন অভিমত সমাজের সকলেরই ঐক্যমত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও জনমতের জন্য যথেষ্ট নয়, কিংবা সকলের ঐক্যমতও যথেষ্ট নয় (..."a majority is not enough and unonimity is not required)"

জনমত বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না

সংখ্যা অপেক্ষা বিশ্বাসের দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের কোন প্রকাশ কখনই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাপ করে না।[২] ইহার অর্থ এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কখনই জনমত বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে দৃঢ় আস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহা জনমত বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে যদি দৃঢ় আস্থার অভাব দেখা যায় তবে ইহা জনমত বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং জনমত গঠনের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহা

জনমত গঠনে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

১। Mac Iver—The Ramparts we guard (Sp. Ed. 1963) P. 28.

২। "Public opinion is not strictly the numerical majority, and no form of its expression measures the mere majority, for individual views are always to some extent weighed as well as counted."—Lowell.

হইতেছে ইহার বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হওয়া এবং নিবিড়ভাবে গৃহীত হওয়া।[১]

আবার অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের নেতৃবৃন্দ কতিপয় অভিমত পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাধারণও হয়ত সেই সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকে না। সেইদিক হইতে চিন্তা করিলে এই মত প্রকৃতপক্ষে জনমত নহে। যাহাকে আমরা মতামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কতিপয় বিশ্বাস অথবা ধারণা মাত্র। জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন নেতা গঠন করেন, তারপর ইহা দেশের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। যদি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতের সারমর্ম বুঝিয়া ইহা গ্রহণ করে এবং ইহা কার্যকর করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই আমরা ইহাকে জনমত বলিতে পারি। লিপম্যানের (Lippman) ভাষায় "The symbolism of public opinion usually bears the mark of balancing of interests."[২] জনমতের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে জননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার উপর। সরকারের জন্য কার্যকর জনমত বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন একটি সুদৃঢ় মত যাহা সুসংগঠিত এবং যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। কতজন লোক এই মত গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই মতের গভীরতা কত বেশী তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

জনমতের স্বরূপ

ফাইনারের (Finer) মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লইয়া জনমত গঠিত।[৪]—(১) ঘটনা বা তথ্যাদি (perception of the facts), (২) তথ্যাদির মূল্যায়ন এবং ইহার ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা গঠন (logical inferences from the facts) এবং (৩) সেই ধারণার নৈতিক ব্যাখ্যা (moral interpretation of those inferences)। বিভিন্ন তথ্যের সম্যকভাবে বিচার বিশ্লেষণ এবং জনসাধারণ কর্তৃক ইহার নৈতিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার উপর জনমত বহুলাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য দরকার একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা।

ফাইনারের মতে তিনটি বিষয় লইয়া জনমত গঠিত

১। "Public opinion is a composite of numbers and intensity." —Munro and Ozanne.

২। Lippman—Public Opinion.

৩। "The intensity of an opinion is often of more importance than the number of persons who compose it."—Gettell.

৪। "Public opinion is compounded of perception of the facts, logical inferences from them and moral interpretation of them." —Finer

জনমতের কার্যকারিতার উপায় (Conditions of effectiveness of Public Opinion) : জনমতের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সুসংহত জনমত

প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। জনমতের সচেতনতা নির্ভর করে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের উপর জনসাধারণের নিজের মধ্যে সর্বদা ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে, এবং বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মতৈক্য বজায় রাখিতে হইবে; তবেই জনমত সুষ্ঠুভাবে নিজেকে কার্যকর করিতে পারে। জনসাধারণের চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ। এই সতর্কতা বিশেষ রূপ পায় কার্যকর জনমতের মধ্যে। জনমতের সাফল্য নির্ভব কবে জনসাধারণেব রাজনৈতিক চেতনার উপর। সরকারে ক্ষমতাসীন দল অথবা ব্যক্তি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে সেদিকে জনসাধারণকেই সতর্ক থাকিতে হইবে।

বিভিন্ন স্বার্থের সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধাণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। শ্রেণীগত, ধর্মগত এবং জাতিগত বিরোধ অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। জনমতকে কার্যকর এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ধর্মগত, শ্রেণীগত, জাতিগত অথবা অন্যান্য সর্বপ্রকার বিরোধ ভুলিয়া সকলকেই সহনশীল হইতে হইবে। যখন জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে, তখনই জনমত বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়।

সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মতৈক্য

তৃতীয়তঃ, সরকার কী ধরণের হওয়া উচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মতৈক্য থাকা উচিত। সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যদি জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য না থাকে, তবে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ইহা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়। সেক্ষেত্রে জনমতের কার্যকারিতা কমিয়া যায়।

সংখ্যালঘিষ্ঠের মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পাবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে জনমত কখনই গঠিত হইতে পারে না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজের মতামত প্রকাশে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সেই মতের যাহারা বিরোধী, তাহাদেরও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবেই জনমত কার্যকর হয়।

পঞ্চমতঃ, অধিকাংশের যাহা ইচ্ছা তাহা যতদিন জনমত তীব্র থাকে ততদিন সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও মানিয়া লওয়া উচিত। আবার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠগণ কর্তৃক অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে সংখ্যলঘিষ্ঠের মতামতও জনমতেরই একটি অংশ।

ষষ্ঠতঃ, জনমত কার্যকরী করার একটি বিশেষ শর্ত হইতেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা। সংবাদপত্রও যদি সরকারের কিংবা কোন দল বিশেষের কুক্ষিগত হয়, তবে ইহা বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনমতকে ভ্রান্তপথে চালিত করিতে পারে। অপর পক্ষে সংবাদপত্র যত নির্ভুল এবং পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রকাশ করিবে, জনমতও তত সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা থাকে। সেজন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে জনমতও স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সুস্থ এবং সবল জনমত গঠনের আরেকটি শর্ত হইতেছে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং জনসাধারণের চিন্তাধারা যাহাতে স্বচ্ছ হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা, জনসাধারণ সুশিক্ষিত না থাকে, তবে স্বৈরাচারী নেতার পক্ষে অথবা স্বার্থান্বেষী নেতা কিংবা রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। যাহাতে কোন সরকার জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত না করিতে পারে সেজন্য জনমত সর্বদা শিক্ষিত থাকা চাই এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত কার্যকর জনমতে শিক্ষার ভূমিকা প্রতিভাত হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা

শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়া চাই

সপ্তমতঃ, সমাজে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে, অর্থাৎ, যদি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সমান সুযোগ না পায়, তবে জনসাধারণ বিভিন্ন সুবিধায় কোন না কোন দলীয় স্বার্থের সহিত নিজেদের জড়িত করে এবং ইহাতে সুস্থ জনমত গঠিত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্য

সর্বশেষে, সুস্থ ও সুসংগঠিত জনমত গঠনের আরও একটি শর্ত হইল বিভিন্ন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য হওয়া। জনমত যাহাতে কোন কায়েমী স্বার্থের ফাঁদে না পড়ে সেইদিকে জনগণকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। সদাসচেতনতা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের সাধারণ স্বার্থগুলির ক্ষেত্রে মতৈক্য সুস্থ ও সবল জনমত গঠনের অন্যতম শর্ত।

জনগণের মধ্যে ঐক্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় ধনতন্ত্রের আদর্শে; অনুরূপভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে। সমাজতন্ত্রে সরকার সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ

করেন বলিয়া জনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উপরোক্ত সংস্থাগুলি ধনীশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং জনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। জনমত স্বাধীন ভাবে গঠিত হইবার প্রধান শর্ত হইতেছে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস (Agencies for the creation and expression of Public Opinion): ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ স্যার রবার্ট পীলের মতে জনমত হইতেছে "ভ্রান্তি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, গোঁড়ামি ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির একটি বিরাট সমন্বয়।"[১]

জনমত প্রকাশ এবং গঠনের প্রধান উৎসগুলি হইতেছে (১) মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র, (২) বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, (৩) রাজনৈতিক দল, (৪) সভাসমিতি, (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং (৬ আইনসভা।

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং ইহাকে প্রভাবান্বিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সংবাদপত্রগুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ সরবরাহ এবং সরকারী কাজের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুব বেশী। সংবাদপত্রগুলি যদি বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকে, তবে জনমত ভ্রান্তপথে চালিতে হয়। কিন্তু যদি সংবাদপত্রগুলি অবিকৃতভাবে নিষ্ঠার সহিত সত্য এবং নির্ভুল সংবাদ প্রকাশ করে তবে সুস্থ ও সরল জনমত গঠিত হইবার পথ সুগম হয় এবং ইহাতে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবাদপত্রগুলি যথাক্রমে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রচার করে। সুস্থ এবং শক্তিশালী জনমত গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংবাদপত্রের গুরুত্ব

সংবাদপত্রের পর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রগুলির যেমন নির্ভুল সংবাদ পরিবেশন করা উচিত, বেতারে এবং টেলিভিশনে সেই-প্রকার নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার-বক্তৃতার মারফৎ জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব

বেতার ও চলচ্চিত্র

১। "...the great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper propaganda." Quoted in Lippman's Public Opinion.

বিস্তার করেন। বর্তমান সমাজে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব খুবই বেশী এবং ইহা গভীরভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রের দুইটি দিক, একটি শিল্পগত এবং অপরটি ব্যবসায়গত। শিল্পের দিক হইতে চিন্তা করিলে মানবিক আবেদন সম্পন্ন চলচ্চিত্র মানুষের শিল্প মানকে উন্নত করে। ব্যবসায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলেও চলচ্চিত্র মানুষের সমাজজীবনের আশা-আকাংখা, দুঃখ এবং উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ইহা জনমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রের আর একটি দিক আছে, তাহা হইতেছে ইহার শিক্ষার দিক। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র জনমতকে সুশিক্ষিত করে। সরকারের দিক হইতে যে তথ্যমূলক দলিল-চিত্রগুলি তৈয়ার হয় তাহাও জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক দল

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়া নিজেদের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় জনমতের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিই নানাভাবে জনমত গঠন করিয়া থাকে।

সভাসমিতি

অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত খুবই প্রভাবিত হয়। মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার অন্যতম মাধ্যম হইতেছে সভাসমিতি। সেইজন্য সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখনই কোন দেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে তখনই বিপ্লবী নেতাগণ সভাসমিতির মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির সবদিক বুঝিতে পারে না। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সভাসমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সহিত পরিচালিত হইবার এবং তাহাদের সহিত ভাব-বিনিময় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া অথবা শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক

সমস্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝাইয়া জনমতকে গঠিত এবং শিক্ষিত করেন। আগামী দিনের নাগরিকদের তৈয়ার করিবার দায়িত্ব হইতেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শুধু সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতিক শিক্ষা অথবা কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই প্রদান করে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিতও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিচিত হয়, এবং ইহা জনমত গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রজীবনেই নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেওয়া হয় গণতন্ত্রের শিক্ষা; জনমতও সেইভাবে প্রভাবিত হয়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব (Role of Public Opinion in a Modern Democratic Society) গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর। আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাঁহারা আইনপরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের সদস্যগণও মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। জনমত যদি সর্বদা সচেতন না থাকে, তবে আইন পরিষদের সদস্যগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকে। সেইক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পক্ষে স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য জনমত সর্বদাই সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়, তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সচেতন জনমতের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে যেমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং সুদৃঢ় জনমত। কিন্তু, জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাস্কির মতে সদা-সচেতনতাই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য ("Eternal vigilance is the price of liberty".)। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের অধিকার বা স্বাধীনতা যাহাতে মোটেই ক্ষুন্ন না হয়, সেইদিকে জনগণের নিজেদেরই খেয়াল রাখা উচিত।

শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের কয়েকটি অন্যায়মূলক ক্রিয়া-কলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে না, তখনই তাহারা কোন অন্যায় কাজ করা হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইনপরিষদের সদস্যগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে পারেন। কোন একটা মত বা আদর্শকে আঁকড়াইয়া না ধরিয়া বর্তমানকালের আইনসভা জনমতের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া নিজেদের মতের পরিবর্তন করে।[১] শিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। জনমতকে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া শাসকশ্রেণী বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং জনস্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ তাঁহাদের করা উচিত নয়। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয়। এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেইভাবে বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত জনমতের উপর

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী জনমতকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতও যথেষ্ট সচেতন থাকে।

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উপর। রাষ্ট্রশক্তি যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে, সেইজন্য জনসাধারণকে যাহাতে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। জনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহা নির্ভর করে জনমতের কার্যকারিতার উপর। জনমত হইতেছে গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ ; গণতন্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর, জনমতের

রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রয়োজনীয়তা

১। জনমতের দ্বারা বর্তমানকালের আইনসভা কতটা প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ধে বার্কার (Barker) বলেন, "Today we know that public opinion is always moving ; and we believe that it is moving onward, and we conceive the law along its course. We divide representative legislatures to mediate between public opinion and law and acting as the organs and exponents of the former, to modify the latter accordingly." (Barker—Greek Political Theory,—Plato and his Predecessors. P. 44).

মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাংখা বাস্তব রূপ পায়; ইহা মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। সুস্থ ও সুসংগঠিত জনমত স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। জনমতের চাপে সরকারকেও অনেক ক্ষেত্রে ইহার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের বাক-স্বাধীনতা থাকে বলিয়া জনমতের কার্যকারিতা অনেক বেশী হয়, এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুস্থ ও সবল জনমত সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

জনমতের শক্তি

সংক্ষিপ্তসার

জনমতের কার্যকারিতার উপায়—জনমতের কার্যকারিতার জন্য দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সরকার কী ধরণের হওয়া উচিত এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাকা উচিত। চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। সর্বশেষে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থও সংরক্ষিত থাকা উচিত।

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস—জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উৎস হইতেছে সংবাদপত্র। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুবই বেশী। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদপত্রের পর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার বক্তৃতার মারফৎ জনমত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র, প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। ষষ্ঠতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত গঠন করে। সর্বশেষে, আইনসভার সদস্যগণ আইনসভার অধিবেশনে যে সব মতামত প্রকাশ করেন, তাঁহাও জনমত গঠনে সাহায্য করে। আইনসভার সদস্যগণের বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতা ও মন্তব্য হইতে জনসাধারণ দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিভিন্ন দিক বুঝিতে পারে।

জনমত ও গণতন্ত্র—গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর; আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাঁহারা আইনপরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। জনমত যদি সর্বদা সচেতন না থাকে, তবে আইনপরিষদের সদস্যগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে না। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পক্ষে স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ করা এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য জনমত

সর্বদাই সুদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয় তাহা না হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইন পরিষদের সদস্যগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সরকারে বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে পারেন। শিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে পারে। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেই ভাবে বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

Exercise

1. Discuss the nature of Public Opinion. What are the agencies for the creation and expression of Public Opinion ? (৩৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা ; ৩৬০-৩৬২ পৃষ্ঠা)

[জনমতের স্বরূপ আলোচনা কর। জনমত গঠন এবং প্রকাশের বিভিন্ন উৎস কি কি ?]
(৩৫৫—৩৫৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the nature and importance of Public Opinion in a popular Government. (C. U. B. A. Part I, 1962)

[জনগণশাসিত সরকারে জনমতের স্বরূপ এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।]
(৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা ; ৩৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা ; ৩৬২-৩৬৪)

3. Explain the nature of Public Opinion and point out its importance in popular Government. (C.U.B.A, Part I, 1966, Revised Regulation)

[জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর এবং জনগণশাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব দেখাও।]
(৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা ; ৩৬২-৩৬৪ পৃষ্ঠা)

4. Explain the nature of Public Opinion. What is its importance in in popular Government ? (C. U. B. A. 1972)

[জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। জনগণশাসিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি ?]
(৩৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৪ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the conditions of the effectiveness of Public Opinion.

[জনমতের কার্যকারিতার শর্তগুলি আলোচনা কর।] (৩৫৮-৩৬০ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল
(Political Party)

[রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়?—গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ—দলীয় শাসনের সুবিধা ও অসুবিধা—দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা—দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা—বহু-দলীয় ব্যবস্থা।]

রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? (What is a Political Party ?) : রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় একদল জনসমষ্টি, যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবর্তী হইয়া যৌথভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়।[১] এই জনসমষ্টি একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে একত্রিত হয় এবং নিজেদের ভোটাধিকারের সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং নিজেদের কতিপয় সাধারণ নীতি কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। বার্কার বলেন যদিও একটি রাজনৈতিক দল বিশেষ মতবাদের দ্বারা পরিচালিত, তবুও ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করে।[২] রাজনৈতিক দল গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলি একান্ত আবশ্যক।

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে?

প্রথমতঃ, যাহারা দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের পার্থক্য থাকিলেও রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে সর্বদাই ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের (Feeling of nationalism) ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। আবার সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্যও রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারেন।

দল গঠনের উপাদান

তৃতীয়তঃ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা।

১। "A Party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours the *national* interest upon some particular principle in which they are all agreed."—Burk

২। "A Party is a *particular* body of opinions (otherwise it would not be a Party) which is nonetheless concerned with the *general national* interest, and which forms, and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width."—Barker.

চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে। রাজনৈতিক দলের প্রতি বিভিন্ন সদস্যের আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। কিন্তু, প্রত্যেকেই যে সরকার গঠন করিয়া অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দলের কতিপয় সাধারণ মূলনীতিকে কার্যকর করিতে সচেষ্ট থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রে আমরা বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। রাজনৈতিক দলের এই বিভিন্নতার অন্যতম কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা মনে করেন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেই সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা উচিত, তাঁহারা হয়ত একটি সমাজতন্ত্রবাদী দল গঠন করিতে পারেন; আবার যাঁহারা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যাঁহারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে (Private Enterprise) বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা হয়ত একটি আলাদা রক্ষণশীল দলের কর্মসূচী আলাদা। ভারতের কমিউনিষ্টদল এবং স্বতন্ত্র দলের কর্মসূচী পরস্পরের বিপরীত।

অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রীদল অথবা “faction” বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties in a Democracy): রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকর করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা। দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্য দলের সদস্যগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। রাজনৈতিক দলের মূলনীতি নির্ধারণ এবং সেই নীতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণের সময় জাতীয় সমস্যাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য সঠিক উপায় নির্দেশ করিতে হয়।

দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা ও নীতি নির্ধারণ করা

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কার্যসূচীর সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রিসভা চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকারগঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয়

সরকার গঠন করা এবং প্রার্থী নির্বাচন করা

নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

যে সমস্ত দেশ এখনও স্বাধীনতা অর্জন করে নাই, সেই সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ হইতেছে স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা এবং স্বাধীনতা অর্জিত হইলে যাহাতে ইহা সরকার গঠন করিতে পারে ও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে পারে সেইজন্য চেষ্টা করা।

বিরোধী দলের ভূমিকা

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আইন পরিষদে বিরোধীদলের ভূমিকা একটি নিছক স্তোকবাক্য ("idle phrase") নয়। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইনসভায় যদি বিরোধী দল খুব শক্তিশালী হয় এবং সরকার পক্ষের শক্তির অনুপাতে বিরোধী দলের শক্তিও যদি খুব কম না হয়, তবে বিরোধী দল সরকার-পক্ষীয় দলের স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। আইন পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে।

দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কম থাকে

আইনসভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষ-প্রভাবিত করে। শুধু আইনসভায় নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই নহে, বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের দ্বারা, সভাসমিতি অনুষ্ঠান করিয়া, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা প্রচার করিয়া, প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকার পক্ষীয় অথবা সরকার বিরোধী, যে কোন দলের) ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, তবে বিভিন্ন দল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে।[১]

জনমতের উপর প্রভাব

১। ..."Political parties serve as the motive force in crystallizing public opinion, and the unifying agency that makes democracy workable over large areas."—Gettell.

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ্ (whip) নির্বাচিত করে। তাহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। এইগুলিকে "Coalition Government" বলা হয়। যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

সরকার স্থায়ী রাখার চেষ্টা

জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারে ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে।

অধিকাংশ দেশেই সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কমিউনিষ্ট দলই শুধু একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।) তবে কোনও রাজনৈতিক দল যদি সরকার গঠন করে, তখন সেই সরকারকে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান মানিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত (extra-legal) এলাকায় সীমাবদ্ধ। দলীয় সংগঠন কঠোর অথবা নমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত ধরণের এবং প্রত্যেকটি দলের সংগঠন খুব অনমনীয় (rigid)। কিন্তু ফ্রান্সে অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন খুব নমনীয় (flexible)।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে। রাজনৈতিক কর্মসূচী হইতে অর্থনৈতিক কার্যসূচী বর্তমান কালের রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু শ্রমিক দল (Labour Party) অত্যাবশ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী। অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক

রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে

দলের সৃষ্টি হয়; যেমন, ভারতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার সৃষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে হইয়াছিল।

গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "সদাসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য।" ("Eternal vigilance is the price of Liberty;")। জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারণ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নহে, গণতন্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে।

গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য দলব্যবস্থার গুরুত্ব

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে। কেননা, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে পাই, সেজন্য সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পূর্বে ফ্রান্সে এবং বর্তমানে ইটালীতে বহু-দল ব্যবস্থায় যে স্থায়ী সরকার গঠিত হয় না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার, এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের দ্বারা যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই রাজ্যগুলির বিধানসভার বহু সদস্য নিজ নিজ দল হইতে অন্য দলে যোগদান করায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলিতে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে দলের সংখ্যা বেশী হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

একনায়কতন্ত্রে শুধু একটিই দল থাকে।

দেশে যদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে, রাজনৈতিক দল সেখানে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি সুসমঞ্জস শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির ক্ষেত্র রচনা করে।

দলীয় শাসনের সুবিধা (Advantages of Party Government): রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয়

শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাসনের একটি প্রধান সুবিধা হইল, সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষতঃ আইনসভায় সরকারবিরোধী দলগুলি সরকারকে কখনই স্বৈরাচারী হইতে দেয় না। এই দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনা সহ্য করিয়া সরকারপক্ষ কখনও নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থ-বিরোধী কাজকর্ম করিতে চায় না।

সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না

দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ সূত্র স্থাপিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। যে সকল লোক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে একই অভিমত পোষণ করেন, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজনৈতিক দলের মারফৎ আইন-পরিষদে এবং আইন-পরিষদের বাহিরে সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইন পরিষদের মধ্যে যে যোগসূত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহা শুধু দলীয় শাসনেই সম্ভব।

সরকারের সহিত জনগণের সম্পর্ক সহজ হয়

দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, দলীর শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা তাহাদিগকে কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার

দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য, দলীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকিলে বিপ্লবের পথে না যাইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় সমাজ-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভবপর। শান্তিপূর্ণ-ভাবে সমাজের বহুমুখী পরিবর্তন করিতে হইলে দলব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে দলব্যবস্থার গুরুত্ব

দলীয় শাসনের অসুবিধা (Disadvantages of the Party System): গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল

ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য দলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার অনুশাসন পালন করিতে হয়। বীর পূজার (hero worship) চাপে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে সদস্যগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের নীতিকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় সদস্যগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। ইহাতে সদস্যগণের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হইয়া যায়। সদস্যগণ যদি দলীয় নেতার নির্দেশ অমান্য করেন, তবে তাঁহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ঝুঁকি থাকায় কোন সদস্যই অযথা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করিয়া দলীয় নির্দেশ অমান্য করিতে সাহসী হন না। সদস্যদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য জন-স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া ফেলে। গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ।

দলীয় মতভেদ বীরপূজা, এবং দলীয় স্বার্থ সরকারের সংহতি নষ্ট করে

ইহাতে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়

তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হউক, ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। দলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রিগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন। এমনকি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় না, —সেখানেও দলীয় স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখা যায়। দল রাখিবার জন্য অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত সদস্যগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়। দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকারবিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব

নৈতিক মানের অবনতি

দলীয় স্বার্থে উপযুক্ত ব্যক্তি উপেক্ষিত হইতে পারে।

থাকে এবং সেই রাজনৈতিক দলগুলির শক্তিও প্রায় একরূপ, সেগুলিতে সরকার কখনই স্থায়ীভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

কুচক্রী দল

দলীয় শাসনের আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি দলের সদস্যগণের মতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক দল যদি কুচক্রী দলে (faction) পরিণত হয়, তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না।

দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা,—দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করিবার ব্যবস্থা ঃ দলীয় শাসনব্যবস্থার উপরোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার ফলে অনেকে মনে করেন দলীয় শাসনের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। যদি দলীয় শাসনের অবসান হয় তবে সব মানুষের কাজে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় হইয়া দেখা দিবে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে একযোগে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য কোনও সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠান থাকিবে না। দলীয় শাসনের অবর্তমানে বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কোনও ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হইবার সুযোগ পাইবে না। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে, জনমত গঠনে, সরকারের কাজের নৈতিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টা বিনষ্ট হইবে। দলীয় শাসনের অবসান যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, শাসনতন্ত্রে এমন কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা যাহাতে দলীয় ব্যবস্থা উল্লিখিত দোষত্রুটি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

শাসনতান্ত্রিক বিধানের সাহায্যে দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা যায়

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা ইহার নেতা সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পারে। এজন্য যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন, তাঁহাকে সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ হইতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যতদিন তাঁহার পদে আসীন থাকেন, ততদিন তিনি রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাহা ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। সেজন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পদচ্যুতি (Recall), গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum) এবং নির্বিশেষ গণভোটের (Plebiscite) ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকা উচিত যে সরকারী চাকুরী, সাহায্য অথবা সম্মান বিতরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাকেই প্রধান মাপকাঠি ধরিতে হইবে, তাহার রাজনৈতিক মতামত অথবা দলীয় সদস্যপদ নহে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে অনেক দুর্নীতি দূর হইবে।

যোগ্যতাই উচ্চপদের মাপকাঠি হওয়া উচিত

তৃতীয়তঃ, কোনও রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিয়া যাহাতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রকে সর্বদাই অনমনীয় রাখিতে হইবে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার লিখিত রাখিতে হইবে।

অনমনীয় শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত

চতুর্থতঃ, দলীয় শাসনব্যবস্থার অপগুণে যাহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত না হয় অথবা শাসনতন্ত্র মর্যাদা না হারায়, সেদিকে উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য বিচারবিভাগকে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে।

বিচারবিভাগ স্বাধীন হওয়া উচিত

পঞ্চমতঃ, সরকারী কর্মচারীগণকে কখনই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য তাঁহারা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিতে পারিবেন। তাঁহারা যাহাতে দলনিরপেক্ষ হইয়া জাতীয় স্বার্থে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদের চাকুরী সম্পর্কীয় বিভিন্ন শর্ত এবং বেতন ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সুবিধা সর্বদা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

সরকারী কাজে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান থাকা উচিত নয়

ষষ্ঠতঃ, আইন পরিষদে যাহাতে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সদস্যগণও নির্বাচিত হইতে পারেন, সে রকম ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে করিয়া দেওয়া উচিত।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, নাগরিকদের উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক চেতনা না বাড়িলে দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনই ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। সেজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার করা। যতদিন জনমত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন না হইবে এবং শিক্ষিত না হইবে, ততদিন দলীয় শাসন কখনই সার্থক হইবে না।

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against the two-party system): পৃথিবীর দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে [ব্রিটেনে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকিলেও দুইটি দলই প্রধান] আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা

দেখিতে পাই। দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ পরিচালনা করে। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) অথবা সিনেটসভার (Senate) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহাদের মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হইতে হয় না।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। কিন্তু, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার গঠনকারী দল কখনই জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে প্রস্তুত থাকে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে নাগরিক তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে প্রয়োগ করিতে পারে।[১] সাধারণ নির্বাচকদের পক্ষেও দুইটি দলের কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা সম্ভবপর হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় উৎকর্ষের জন্য এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য।

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে পূর্বে যখন ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং উদারনৈতিক দল (Liberal Party) শুধু এই দুইটি রাজনৈতিক দল ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি

১। "The citizen will choose most freely, and his moral will can best be exercised, when he has a clear choice between two alternatives."

—*Barker*

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে যদি শুধু একটি সরকারপক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (coalition ministry) গঠন করিতে পারে। বিশেষতঃ দুইটি দল থাকিলে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যায়, বহুদল-সমন্বিত আইন পরিষদে সেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। দুই দল সমন্বিত আইন পরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃংখলা খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদস্যগণ অনেক সময়েই নিজেদের বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

সরকারের স্বৈরাচারিত ব্যাহত হয়

বহু-দল ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of a multiple party system): বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক মত পোষণ করিলে সেইগুলি আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বহুদল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রিসভাও বহুদল সমন্বিত শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সরকার পক্ষ অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে পারে। বহুদল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ করা খুব কঠিন নহে। দ্য গল (De Gaulle) রাষ্ট্রপতি হইবার পূর্বে ফ্রান্সে এবং সম্প্রতি ইটালীতে ইহা বহুবার হইয়াছে। জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যদি সরকার গঠিত হয় (যেমন, ইংলণ্ডে হয়), তবে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায়।

বহুদল ব্যবস্থার সুবিধা

বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। অতীতে ফ্রান্সে এবং সাম্পতিককালে ইটালীতে বহুদল ব্যবস্থার জন্য অনেকবার মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। বহুদল শাসন-ব্যবস্থায় যে স্থায়ী সরকার গঠিত হয় না. ইহার প্রমাণ আমাদের দেশেও সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের দ্বারা যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইয়াছিল।

ইহার ত্রুটি, সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না : ভারতের উদাহরণ

কিন্তু, বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভায় বহু সদস্য নিজ নিজ দল হইতে অন্য দলে যোগদান করায় যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলিতে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে দলের সংখ্যা বেশী হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, বহুদল-ব্যবস্থার পরিবর্তে দুই দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া কঠিন

বিশেষতঃ, যদি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বহুদল ব্যবস্থায় এই সুবিধা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, আইন পরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্যকর করিতে অযথা সময় অতিবাহিত হয় এবং ইহা সর্বদাই কোন না কোন দলের সদস্যদের অসন্তোষের কারণ ঘটায়। বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোটদাতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্য বহু দল ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে বিভ্রান্ত করে।

উপসংহার: আমরা বলিতে পারি দুই দলীয় শাসনব্যবস্থা বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সরকারের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক। কিন্তু দেখিতে হইবে দুই-দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী না হয়।

বহু-দলীয় ব্যবস্থা হইতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা নানাদিক হইতেই ভাল। বহু-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে ভাল হইতে পারে

সরকার গঠিত হয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা নির্বাচনের কাজকে সহজ করিয়া তুলে। কেননা দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে একটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করার কাজ নাগরিকের পক্ষে খুব সহজসাধ্য এবং সেক্ষেত্রে নাগরিক তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে সর্বাপেক্ষা ভালভাবে প্রয়োগ করিতে পারে।[১] তাহা ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষেও দুইটি দলের পারস্পরিক দোষ গুণ এবং কর্মসূচী লইয়া

১। "The citizen will choose most freely, and his moral will can best be exercised, when he has a clear choice between two alternatives."—Barker.

আলোচনা এবং বিতর্ক করা যতটা সহজ, বহু-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের কর্মসূচী লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা তত সহজ নয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নাগরিক শ্রেষ্ঠ যুক্তি প্রদান করিতে পারে এবং অপরের যুক্তিও অনুধাবন করিতে পারে।[১] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই একটি সুসংহত এবং দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা একান্ত অপরিহার্য। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সরকারের স্থিতিশীলতা দেখিতে পাই। তাহা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দরুণ সম্ভব হইয়াছে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিশেষভাবে কাম্য। দ্বি-দলীয়ব্যবস্থার সপক্ষে লাস্কি বলেন, "a political system is the more satisfactory, the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties."

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (One Party Rule and Democracy): কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হয় না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার এবং একমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই। কিন্তু, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা কমিউনিস্ট সরকারের কোন বিরোধী দল দেখিতে পাই না। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট দলই সেখানে নিজের খেয়ালখুশীমত সরকার পরিচালনা করে; জনগণের কোন ক্ষমতাই নাই দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার। ইহা গণতন্ত্রসম্মত নয়, প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থাও নয়।

একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র সার্থক হয় না

প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্য দলগুলি প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের সমালোচনা করে অথবা ইহার সহিত সহযোগিতা করে। কেননা, জাতীয় প্রগতি সাধন করাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেশ্য। বিরোধী দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে সরকারেরই উপকার হয়। কেননা, জনমতের মর্যাদা রাখিবার জন্য সরকার নিজের নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন করিতে পারে। বিরোধীদলগুলিও সর্বদাই বিকল্প সরকার গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। দলীয় শাসনব্যবস্থার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সোভিয়েত মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শুধু একটি রাজনৈতিক দলকেই স্বীকার করা হইয়াছে। হিটলারের আমলে

বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলে সরকার নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে

১। The citizen will argue best, and best understand the argument of others, when two main sides are engaged in debate." —Barker.

জার্মানীতে নাৎসীদল এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল দেখাইয়াছে একদলীয় ব্যবস্থায় কিভাবে জনমতের কণ্ঠ রোধ করা হয়, কিভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করিয়া স্বাধীনতার আলোক হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য একাধিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হয়; কিন্তু বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলে সরকারের স্বৈরাচার বন্ধ হয়। বিরোধীদল সরকারের নীতির সমালোচনা করিতে পারে এবং সরকারও জনমতকে একবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনও রেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদলীয় শাসনে দলীয় নেতার নেতৃত্ব সকলকে মানিয়া চলিতে হয় বলিয়া একদলীয় শাসনে একনায়কত্বের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে চীনে আমরা মাও-সে তুং-এর একনায়কত্ব দেখিতে পাই। চীনে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি মাত্র দলই দেশ শাসন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কমিউনিস্ট দল সর্বহারা শ্রমিকদের লইয়া গঠিত, এবং ইহার নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। কিন্তু মূল কথা হইতেছে, শ্রমিকদের মধ্যে হয়ত এমন কেহ থাকিতে পারেন যিনি কমিউনিস্ট দলের আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে নিজের মতামত এবং বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা বা প্রচার করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং একদলীয় ব্যবস্থায় বিচার বিবেচনা এবং বিবেকের স্বাধীনতা থাকে না। ইহা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা

একদলীয় ব্যবস্থায় বিবেকের স্বাধীনতা নাই।

সংক্ষিপ্তসার

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য—রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য কাজ করে, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকার গঠন করিতে ও নিজের নীতিগুলিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। তাহাদের সর্ব অবস্থায় দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এইজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা।

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রী দল বা "Faction" বলা।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ—রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করে। এইজন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় ইহা মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং দরকার হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ (Whip) নির্বাচিত করে। তাঁহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এইজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম।

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে; কেন না সেক্ষেত্রে সরকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে।

দলীয় শাসনের সুবিধা—দলীয় শাসনে সরকার খুব সহজে স্বৈরাচারী হইতে পারে না। বিরোধী দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হইলে দলীয় শাসনে সরকারগঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব শৃংখলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে এবং নাগরিকের দায়িত্ববোধ বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থতঃ, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা তাহাদিগকে কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

দলীয় শাসনের অসুবিধা—গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। (১) রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ, এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই যে-কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে-কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। (২) ইহাতে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। (৩) তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হউক ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে; ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। (৪) দলীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রিগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন। (৫) দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

দ্বি-দলীয় এবং বহু-দল ব্যবস্থার গুণাগুণ—দ্বি-দলীয় শাসন-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন সহজ হয়।

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনগণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদে যদি শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

বহু দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রিসভাও বহু দল সমন্বিত শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না।

কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, (১) অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। (২) বহুদল ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। কোন্ দলের নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, তাহা হইলে ভোটারদের প্রায়ই সমস্যায় পড়িতে হয়।

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র—একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের ভিতরে কাহারও পক্ষে সরকারের বিরোধিতা করা সম্ভবপর নয়।

Exercise

1. What is a Political Party? Describe the essential functions of Political Parties in a democracy.

[রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজগুলি বর্ণনা কর।] (৩৬৫-৩৭০ পৃষ্ঠা)

2. Define a Political Party. "Without the existence of the organised parties, the functioning of the Parliamentary Government would prove impossible." Discuss.

[রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদান কর। সুসংগঠিত দলের অস্তিত্ব ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব হইত,"—আলোচনা কর।] (৩৬৫-৩৭০ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the advantages and disadvantages of Party Government. Can you suggest any practical working alternative ?

[দলীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর। তুমি কি কোন বাস্তব কার্যকর বিকল্পব্যবস্থার সুপারিশ প্রদান করিতে পার ?] (৩৭০-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

4. What safeguards should be provided in the constitution to mitigate the evils of the party system ?

[দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে কি কি রক্ষাকবচ থাকা দরকার ?] (৩৭৩-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the use, abuse and the true role of the party system in Democracy.

[গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার ব্যবহার অপ ব্যবহার এবং প্রকৃত ভূমিকা আলোচনা কর।] (৩৬৭-৭৩ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the problem of the two-party system vs. multiple-party system in democracies. (C. U. B. A. 1969, 1972)

[গণতন্ত্রে দ্বি-দলপ্রথা বনাম বহু-দলপ্রথার সমস্যাটি আলোচনা কর।] (৩৭৪-৩৭৮ পৃষ্ঠা)

7. Is One-Party rule compatible with Democracy ? Give reasons for your answer.

[একদলীয় শাসনব্যবস্থা কি গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (৩৭৮-৩৭৯ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the nature and functions of political parties. Are political parties indispensable in democracies ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. A. Part I, 1967)

[রাজনৈতিক দলগুলির স্বরূপ এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি কি অপরিহার্য ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।] (৩৬৫-৩৭০ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ
(Ends and Functions of the State)

[রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা—সমাজতন্ত্রের আদর্শ—মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র—সমাজতন্ত্রের অন্যান্য রূপ—আধুনিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ।]

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Various theories about the ends of the State) : রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ দিয়াছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি লইয়া প্রাচীনকালে প্লেটো এবং এরিষ্টটল আলোচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে জার্মান ও ইংরাজ আদর্শবাদীগণ (Idealists), বেন্থাম, জেমস্ মিল প্রমুখ হিতবাদী দার্শনিকগণ (Utilitarian philosophers), স্যার হেনরী মেইন প্রমুখ বিবর্তনবাদীগণ, জনষ্টুয়ার্ট মিল[1], সিজউইক এবং স্পেন্সার প্রমুখ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ, এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদী বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, আবার কোনটি জনসাধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ যুক্তি আছে। প্লেটো এবং এরিষ্টটলের মতে সুন্দর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন সম্ভব করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। আদর্শবাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্থকতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত। জন লকের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে মানবজাতির কল্যাণ করা ("good of mankind")। তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের কমনওয়েলথের মধ্যে একত্রিত হইয়া সরকারের শাসন মানিয়া লইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করা।[2] অ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) মতে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে : প্রথমতঃ, সমাজকে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ অথবা আক্রমণ হইতে

লকের অভিমত

১। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার "Representative Government" বইয়ে হিতবাদী দর্শন ও বিবর্তনবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২। "...the great and chief end of men uniting into commonwealths and putting themselves under government is the preservation of their property."—Locke.

রক্ষা করা ; দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রত্যেককে অপরাপর সদস্যের অবিচার অথবা অত্যাচার হইতে রক্ষা করা অথবা ন্যায়ের প্রকৃত শাসন প্রতিষ্ঠা করা ; এবং তৃতীয়তঃ, এমন কতিপয় কাজ করা অথবা সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যেগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য নহে, সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজনীয়।

অ্যাডাম স্মিথের অভিমত

জার্মান লেখক হল্টজেনডর্ফ (Holtzendorff) রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব এবং অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, এবং নিজের অধীনস্থ জনসাধারণ অথবা বিভিন্ন সংস্থার উপর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রকে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হইবে অথবা এইরূপ স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে দিতে হইবে যাহা জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইতে পারে এবং যাহা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অথবা অপরাপর ব্যক্তিদের অকারণ হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত রাখে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের সভ্যতা এবং সামাজিক উন্নতি বৃদ্ধির চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র জনগণকে শিক্ষা ও সাহায্য প্রদানের মারফৎ এই চেষ্টা করিতে পারে।

জার্মান লেখক হল্টজেনডর্ফ

ব্লুণ্ট্‌শ্লির (Bluntschli) মতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জাতীয় শক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় জীবনকে রক্ষা করা এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। তিনি সাধারণ জনকল্যাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনকল্যাণের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইতে পারে সেই সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। কেননা, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অনেকের মতে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত।

ব্লুণ্ট্‌শ্লির অভিমত

বার্জেসের (Burgess) মতে রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্য আছে ; যথা—প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) এবং শেষ বা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য (Ultimate end)। রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, শৃংখলা ও ন্যায়পরতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকার ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা। মাধ্যমিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সম্পূর্ণ করা এবং জাতির প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রতিভার বিকাশের সহায়তা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলি গঠিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানবতা এবং বিশ্বসভ্যতার পূর্ণতা আনয়ন করা।

বার্জেসের অভিমত

উইলোবি (Willoughby) তাঁহার "The Nature of the State" বইয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের সেই শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট যাহার সাহায্যে ইহা জাতিসংঘে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা সৃষ্টি করা এবং যাহাতে এই স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় সেইজন্য সরকারের সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করা এবং যাহাতে জনসাধারণ এই স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাও রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য। তৃতীয়তং, জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধন করাও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

উইলোবির অভিমত

গার্ণারও (Garner) অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যে সুবিপুল জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের মধ্যে শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়পরতা বজায় রাখা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়াও, সমাজের সামগ্রিকভাবে যে সব জিনিসের প্রয়োজন অথবা যাহা কিছু চাহিদা তাহা সবই মিটাইবার চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। জাতীয় উন্নতি এবং দেশের সাধারণ মঙ্গল যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন সংস্থা সাধন করিতে পারে না, তাহা সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রধান এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানব সমাজের সভ্যতার মান উন্নত করা এবং এই ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সার্বজনীন ('universal in character') হইবার জন্য চেষ্টা করে।

গার্ণারের অভিমত

অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, যুক্তিসম্মতভাবে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল অপরের সঙ্গে বাস করা এবং সেইজন্য সরকারের প্রয়োজন। কেননা, সভ্য সমাজের ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এইগুলিকে কখনই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা যায় না। রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী মানুষের আচরণের ঐক্য সাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কাজ অর্থে মানুষের সর্ব প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রিত করা নহে। সামাজিক শৃংখলার মূল সূত্রটি রাষ্ট্র কার্যকর করিতে পারে। কিন্তু সামাজিক শৃংখলাই শুধু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নহে।[১] রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে,

অধ্যাপক লাস্কির অভিমত

১। "The state possesses power because it has duties. It exists to enable men, at least potentially, to realize the best that is in themselves. It is judged not by what it is in theory, but by what it does in practice."—Professor Laski. "Grammar of Politics."

কারণ ইহার কর্তব্য আছে। ইহা মানুষকে নিজের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহা বুঝিতে সমর্থ করে। তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রের কী পরিচয়, তাহা দিয়া রাষ্ট্রকে বিচার করা যায় না; বাস্তবে রাষ্ট্র কী করে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রকে বিচার করিতে হইবে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্বকালের এবং সর্বদেশের লোকের জন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সভ্যতার স্তর, রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং যুগ-সমস্যা, ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ধারণা অনেকটা একরকম হইলেও, ইহা অর্জন করিবার উপায় সম্বন্ধে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ একই অভিমত পোষণ করেন না। তবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কারণ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে কে প্রয়োগ করিবে সেই সম্বন্ধে মানুষ কখনই একমত হইতে পারে না। সেইজন্য গেটেল (Gettell) বলেন, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যত মতভেদ দেখা যায়, অন্য কোন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে এত মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই।[২]

সর্বকালের এবং সর্ব দেশের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এক নহে

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different views about the functions of the State):

গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন মনে করিতেন। এডমাণ্ড বার্ক (Edmund Burke) তাঁহার *"Reflections on the Revolution in France"* বইয়ে সমাজকে একটি "ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান" হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং এই ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। গ্রীক দার্শনিকগণও ঠিক অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রীসের শহর-রাষ্ট্র (City State) ছিল একাধারে একটি শহর ও রাষ্ট্র। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ

প্রাচীন যুগের ধারণা, —গ্রীক ধারণা

১। "...The state...does not set out to compass the whole range of human activity. It may set the keynote of the social order, but it is not identical with it."—Laski.

২। "No phase of political speculation today is more important or leads to such wide divergence of opinion as that concerned with the functions of the State."

প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র ছিল সমগ্র ব্যবসায়-বাণিজ্য, চারুকলা, সংগঠন এবং সমগ্র সার্থকতার একটি চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

প্রাচীন রোম

প্রাচীন রোমকদের রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা গ্রীকদের ধারণা অপেক্ষা একটু পৃথক ছিল। প্রাচীন রোমকগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত প্রথা এবং ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহে নাই; রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকুচিত করিয়া পারিবারিক স্বাধীনতার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

মধ্য যুগ

মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের সহিত অন্যান্য ধর্মের সংঘাতের ফলের রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আরও সংকুচিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র হইতেছে শুধু আইন এবং রাষ্ট্রনীতির জন্য একটি সমাজ-ব্যবস্থা শুধু ধর্ম ও উপাসনার জন্য নহে—("a community of law and Politics, no longer also of religions and worship")—এই ধারণাটি তখন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্ম

মধ্যযুগের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমরা জাতীয় সরকার দেখিতে পাই, অধিকাংশ দেশেই তখন জাতীয় রাজতন্ত্র (National Monarchies) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ছাড়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রভৃতির ফলে রাষ্ট্র নাগরিকদের অভিভাবকের (Paternal State) স্থান গ্রহণ করে। স্বভাবতই ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে এই জাতীয় ধারণার সৃষ্টি হয় এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। এই প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি যতদূর সম্ভব ক্ষুণ্ণ করা। ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats) এবং অবাধ বাণিজ্যের (free trade) সমর্থকগণ নিজেদের অর্থ নৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্রের কর্মপরিধির সংকোচনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তিশীল করিয়াছিলেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবীগণও যতদূর সম্ভব ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকা উচিত এই দাবীর ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সুরু করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপ্রতিহত গতিতে সমর্থিত হইতে থাকে। কিন্তু যখন অবাধ বাণিজ্যের কুফলগুলি অনুভূত হইতে লাগিল,

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান

তখনই লোকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে কারখানা আইন (Factory Acts), খনি সংক্রান্ত আইন (Mines Acts), এই জাতীয় আইন প্রণীত হইয়াছে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্প্রসারণ হইতে থাকে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর সুরু হয় সমষ্টিবাদের (collectivism) যুগ। সমষ্টিবাদের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেখানেই সংকুচিত হইয়াছে, সমষ্টিবাদ সেখানেই সম্প্রসারিত

হইয়াছে। একদিক হইতে চিন্তা করিলে ইহার একটি বিশ্বজনীনরূপ রহিয়াছে। এমন কি তত্ত্বগতভাবে সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে এবং ইহাতে সমষ্টিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমষ্টিবাদ

সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র দুইপ্রকার হইতে পারে ; পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র এবং আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র। পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কোন স্থান নাই। ইহা ব্যক্তি-জীবনের এবং সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রবর্তন করে। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে (Socialist State) পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র বলা যায়। অপরদিকে আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলি হইতেছে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare State) ; এই শ্রেণীর রাষ্ট্রে সমাজ-কল্যাণকর ব্যবস্থাদি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে সমাজের লোকদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন (the greatest good of the greatest number) করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে বাজারের বিভিন্ন শক্তিকে (market forces) সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় বাজারের শক্তিগুলির স্বাধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে বাজারের শক্তিগুলি তিনদিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যথা, (১) আয় উপার্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং অভাব দূর করা, (২) আয়ের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া এবং (৩) সব নাগরিকই যাহাতে সর্বোচ্চ মানের সমাজ কল্যাণকর সেবা পায় তাহা সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য আধুনিক সমাজ-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কিন্তু এইজন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি মনে করে না। বর্তমানে সমাজ-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্র, এই দুইটির মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগুলি যে নীতি অনুসরণ করে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্র-অর্থনীতির (Mixed Economy) রূপ পরিগ্রহ করে। এই ব্যবস্থায় একদিকে থাকে সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) এবং অপরদিকে থাকে বেসরকারী ক্ষেত্র (Private Sector) ; একদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অপরদিকে সরকারের দিক হইতে নিয়ন্ত্রণের অভাব। তবে সামগ্রিকভাবে বেসরকারী ক্ষেত্র সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান এড়াইতে পারে না।

পূর্ণ ও আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র কাহাকে বলে

সমাজকল্যাণ মতবাদ

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ Functions of the Social Welfare States): পূর্বেই বলা হইয়াছে, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করিতে হয়। (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলিতে রাষ্ট্রের ভিতরে নাগরিককে সর্ববিধ বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করা এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা বুঝায়। সম্পত্তির অধিকার নাগরিকদের প্রদান করা হইলেও ইহা কখনই অব্যাহত অধিকার নহে। সামাজিক স্বার্থে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের সম্পত্তি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজ

(২) সামাজিক স্বার্থে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের পরিবার গঠনেও হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আধুনিককালে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা নীতির সমর্থন, উত্তরাধিকার আইনের প্রবর্তন, বিবাহাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, পরিবার-ভাতার প্রবর্তন, প্রভৃতি সবই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পরিবার সংক্রান্ত কাজ।

পরিবার সংক্রান্ত কাজ

(৩) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সমাজ কল্যাণ-কর রাষ্ট্র সমাজের স্বার্থেই শ্রমিক, উৎপাদক, ক্রেতা, এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, এবং এই কাজগুলি একই সঙ্গে করিবার সময় শিল্প ও বিনিয়োগের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কৃষিক্ষেত্রে মহাজনদের অত্যাচার হইতে কৃষকদের রক্ষা করা, কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করা, এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে সর্বপ্রকার শোষণের উচ্ছেদ করা, প্রভৃতি হইতেছে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সুষম উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, এবং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক শক্তির সম-বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে কর-ব্যবস্থার (tax-system) সংস্কার করিতে হয়। তাহা ছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, সমষ্টিগত জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার সমাধান; মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ, নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য সর্বপ্রকার সুবিধার জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করা, প্রভৃতি হইতেছে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজ। এইজন্য প্রয়োজন, সর্বক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার। বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সব ছাড়িয়া দিলে এই কাজগুলি ঠিকভাবে সম্পাদিত হয় না।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজ

ভারত একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি (Directive Principles of State Policy) অনুযায়ী ভারত এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিতেছে যেখানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।

ভারতের দৃষ্টান্ত

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্প্রসারণের কারণ (**Reasons for increased State Activity**): রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইবার কতিপয় কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, শ্রেণী-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নীতি (Laissez Faire) পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

শিল্প বিপ্লব

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে আশ্রয়ী রাষ্ট্রগুলিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোট গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ধনতন্ত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রতিযোগিতা আবশ্যক। কিন্তু একচেটিয়া কারবার এবং শিল্পজোট (industrial combinations), যেমন, ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি, প্রতিযোগিতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। এই বাধা দূর করার জন্য রাষ্ট্রকে ইহার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করিতে হয়।

একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোটের সৃষ্টি

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-দল গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। শ্রমিক স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে যথার্থ স্থান দিবার জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ইহার ফলে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হয়।

ভোটাধিকারের প্রসার

চতুর্থতঃ, বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ অনেক দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সমাজ-জীবন ও নাগরিক-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধ

পঞ্চমতঃ, প্রথম, মহাযুদ্ধের পর, বিশেষত, রাশিয়ার বিপ্লবের পর, বিভিন্ন দেশে, সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত

অনগ্রসর দেশগুলির কাছে সমাজতন্ত্রবাদের একটি অকৃত্রিম আবেদন আছে। কারণ অনেকেই বিশ্বাস করেন, সমাজতন্ত্রে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান হয়। যতই বিভিন্ন দেশ সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হইতেছে, ততই রাষ্ট্রের কার্যাবলীও সম্প্রসারিত হইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (**Ideal of Individualism**) **:** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা আলাদাভাবে যাচাই করিয়া রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হয়। বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ দেখিতে পাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মনে করে যে প্রত্যেক নাগরিকের পূর্ণ বিকাশের জন্য কিছু করা উচিত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথমেই সমগ্র সমাজের স্বার্থ এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ বিশেষ বিবেচনার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি আবেদন।[১]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের স্বরূপ

প্রাচীনকালে এথেন্সে এবং মধ্যযুগে রেঁনেসার (Renaissance) আত্মোন্নয়নের বাণীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিহিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দেখতে পাই, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। শিল্প-বিপ্লবের পর অবাধ নীতি (Laissez-faire) বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হইত না। কারণ, এই নীতির সমর্থকদের মতে স্বাধীন ব্যবসায়ের (free trade) জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তখনকার দিনে যে এই মতবাদ অযৌক্তিক ছিল, তাহা নহে, এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারেই থাকিবে না এরকমও কেহ মনে করিতেন না। ইহা বিশ্বাস করা কখনই অযৌক্তিক নয় যে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ তখনই সিদ্ধ হইবে যখন সমাজের প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ণ সুযোগ পাইবে। কিন্তু অবাধ নীতির প্রতি অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি ঝোঁক থাকিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সরকারের লক্ষ্য থাকে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রতি। উন্নয়নের প্রতি নহে ; কিন্তু, রাষ্ট্রীয় অবহেলা অপেক্ষাও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অধিকতর বিপজ্জনক।[২] সরকার ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন

স্বাচ্ছন্দ্য নীতি

১। "Individualism implies that something must be done to give more opportunity for the full development of every citizen. It is an appeal in the first place, in the interests of the whole community, for special consideration for the exceptional,"—C. D. Burns, "Political Ideals."

২। "...Much more is made of the *limits* of govenment than of the *sphere* of government ; and all government is spoken of as restricting

ক্রিয়াকলাপ চলাইয়া গেলে জনসাধারণ যে উপকার পায়, সরকারের কার্য-ক্ষেত্র সীমিত হইলে তাহা অপেক্ষা বেশী উপকার পায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তাৎপর্য হার্বার্ট স্পেন্সারের অভিমত

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে সীমিত ক্ষেত্রের ভিতর সরকারী ক্রিয়াকলাপ শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, প্রয়োজনীয় বটে।[১] কিন্তু সরকারের ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণকারী হওয়া উচিত ("negatively regulative control)। সীমাবদ্ধ সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়াই স্পেন্সার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু,

জনষ্টুয়ার্ট মিলের অভিমত

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের তিনটি ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকা দরকার, যথা, (১) চিন্তা এবং বাক্ স্বাধীনতা, (২) পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার স্বাধীনতা (৩) সংঘ গঠন করার স্বাধীনতা।

যাঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা করেন, তাঁহাদের মতে জনসাধারণের নিজেদের কল্যাণ কিভাবে হইবে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কিন্তু, মিলের মতে যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তবে তাহার সমাজ এই ব্যাপারে কিছু বেশী জানার দাবী করিতে পারে না। জনসাধারণের উপর সমাজের অথবা রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য আছে, তাহা হইতেছে জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্র জোর করিয়া জনসাধারণের উপর কিছু চাপাইয়া দিবে না,—রাষ্ট্র শুধু শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ কিভাবে নিজেদের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা তাঁহারা নিজেরাই ভাল বিচার করিতে পারেন। বার্নসের মতে মিল কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে এমন একটি জনসমাজের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকে এবং প্রত্যেকেই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করে। মিলের মতে ক্ষমতার অংশ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন ইহা বিকেন্দ্রীত হয় এবং অংশীদার তখনই হওয়া যায় যখন ইহা কেন্দ্রীভূত হয়।[২] সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ করাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের লক্ষ্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনার উত্তরে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি

rather than as developing the governed, so that interference is made to seem a greater danger than carelessness."

১। Within its proper limit governmental action is not simply legitimate, but all-important"—Herbert Spencer.

২। "Power can cnly be shared, Mill thinks, by being decentralized and knowledge can only be shared by being centralized."—C. D. Burns, "Political Ideals"

সিজ্‌উইকের (Sidgwick) মতে সর্বনিম্ন সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, যথা,—(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা, (২) ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং (৩) চুক্তি পালন।

সিজ উইকের অভিমত

নৈরাজ্যবাদ (**Anarchism**): নৈরাজ্যবাদ কল্পনাসর্বস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Utopian Individualism)। রূপান্তর নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের উপকারিতা স্বীকার করেন না। নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিতে চাহেন এবং মনে করেন যে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া গেলেই সব সমস্যার সমাধান হইবে। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দুর্নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা নিষ্পেষণের একটি যন্ত্র মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করিলে সমুদয় দুর্নীতি ও নিষ্পেষণেরও উচ্ছেদ হইবে। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের পর রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করিবে কতিপয় সংঘ যেগুলিতে মানুষ স্বেচ্ছায় যোগদান করিতে পারিবে, আবার দরকার হইলে সেইগুলির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগও করা যাইবে। নৈরাজ্যবাদীগণ সাধারণতঃ দুই দলে বিভক্ত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে নৈরাজ্যবাদের উপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই প্রভাব আছে। একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে, অপরদিকে ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বিলোপ করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং সমুদয় শোষণ উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীগণের (Philosophical Anarchists) মতে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করা উচিত। বিপ্লবপন্থী নৈরাজ্যবাদীগণের (Revolutionary Anarchists) মতে ধ্বংসাত্মক কাজের সাহায্যে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করা উচিত।

নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি চাহেন: রাষ্ট্র মানুষের উপযোগী নয় বলিয়া নৈরাজ্যবাদ মনে করে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাম্য এবং গণতন্ত্রের আদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহান। তাহাদের মতে মানুষ নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে নিজের আশা আকাংখা অনুযায়ী কাজ করিলে মানুষ প্রকৃত সুখী হইবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে (ethical argument) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হইতে মুক্ত হইলে মানুষ সুখী হয়

যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ (dcotrine of evolution) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন রাষ্ট্রীয় সাহায্য না পাইলেও সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে এবং তাহাতে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।[১]

অর্থ নৈতিক যুক্তি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী উদ্যোগ নষ্ট হয়

তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বেসরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়। তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে সহযোগিতা অপেক্ষা পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবাধ-বাণিজ্যের (free trade) মধ্য দিয়া শিল্পজাতদ্রব্যের উৎপাদন এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অবাধ নীতির (Laissez-faire) সমর্থকগণ মনে করেন। জিনিসপত্রের দাম এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক যদি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের মতে মূল্যস্তর স্বাভাবিক থাকে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় জন-কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ সরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা ভাল

চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার উপর নিজেদের মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বলেন যে অতীতে অনেক দেশেই জনসাধারণের অবস্থা উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

জনসাধারণের কল্যাণ করিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ

সর্বশেষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে জনসাধারণের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক কাজের ভার অর্পণ করিলে ব্যয় বাহুল্যই হইবে, জনসাধারণের কোন প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

জনগণের যোগ্যতা যাচাই করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাও থাকিতে পারে

বর্তমানে যাঁহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না, এবং যে সমস্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক নীতি ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের ভয়ে ভীত, এবং গণতন্ত্রের সমর্থক যে সমস্ত চিন্তানায়ক মনে করেন যে গণতন্ত্র নিজের কর্মপরিধির

১। বার্কেরের ভাষায়, "Individualism is a protest against the modern tendency towards mediocrity and assimilation."—Quoted from "Political Ideals".

বাহিরে কাজ করিলে নিজের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিবে,—তাঁহার সকলেই পরোক্ষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থক হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা (Criticisms of Individualism): আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সামাজিক কারণ ও সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে।[১] বার্নসের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করা উচিত; কারণ, সমাজের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর এবং যাহা সমাজ হইতে দূর করা উচিত, তাহাকেই এই মতবাদ প্রশ্রয় দেয়। তাহার মধ্যে জন্ স্টুয়ার্ট মিল এবং সিজউইক (Sidgwick) সাধারণ মানুষের অহংভাব বুঝিতে পারেন নাই। কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর স্বার্থের অনুরূপ যে সকলেরই স্বার্থ হইবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। সমাজের কল্যাণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রত্যেকের মতামত নির্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। বার্নস্ বলেন, "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে নয় যে ইহা ভুল—ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে যে অর্ধ-সভ্য সমাজের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে।"[২] সিজউকের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি বিশেষ অপগুণ এবং বিপদের সৃষ্টি হয় তখনই যখন ব্যবসায় বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা শিল্পগুলিকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি করে। শিল্পগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করিলে সম্পদের অপচয় হইতে পারে। সমাজতন্ত্রীগণ যখন বলেন যে ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় সংঘগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে সৃষ্ট, তখন তাঁহাদের অভিমত একেবারে অযৌক্তিক নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সব কাজেরই সামাজিক কারণ ও ফলাফল উপেক্ষা করে

সমাজের প্রয়োজনের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে

শিল্পে প্রতিযোগিতার অপগুণ

কোন ব্যক্তিই নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল এবং স্বার্থ সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকে না। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভুলের বশে নিজের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্যই কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের যদি জনসাধারণের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণী শক্তি না থাকে, তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতায় পরিণত

ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

১। "As an ideal Individualsim involves the neglect of the social causes and social results of action."—C. D. Burns, "Political Ideals".

২। "This objection to Individualism implies not that it is wrong, but that it is inadequate as an idea for the present needs of a semi-civilized community."—C. D. Burns, "Political Ideals."

হয়। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয়। যাহাতে গণ-স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে সেইজন্য কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বিবর্তনবাদের সাহায্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ যেভাবে তাঁহাদের মতবাদ সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, তাহাও বর্তমানযুগে গ্রহণযোগ্য নয়। 'জীবন সংগ্রামে শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিই বাঁচিয়া থাকিবে (survival of the fittest) এই নীতি অনুমোদন করিলে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অযোগ্য তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলা প্রদর্শিত হয়। বরং যাঁহারা দুর্বল ও অক্ষম তাঁহাদের রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিগণও সমাজেরই অংশ এবং সমাজ কখনই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হইতেছে তাহাদের ভালমন্দ উভয়দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সমুদয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা।

যোগ্যতম ব্যক্তিদের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে সেই সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ নীরব। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে, অবাধ বাণিজ্য অথবা প্রতিযোগিতা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত অর্জিত হয়। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সুপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। ইহাদের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, যেখানেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলি বেসরকারী প্রয়াস অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উপকারিতা সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নীরব

রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাদের কাজে লাগান যায় না। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই কোন ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে। সার্বজনীন ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই জীবনে পূর্ণতা আসে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মানুষ সব সময়েই তাহার মানসিক বৃত্তিগুলিকে সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়া রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য অথবা সহযোগিতা পাইলেই মানুষ আদর্শ নাগরিক হইয়া নিজের এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই সমাজ-জীবনের সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রসারণ হইতেছে। ইহা হইতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসম্পূর্ণতা এবং অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

রাষ্ট্রের সহযোগিতায় মানুষ আদর্শ নাগরিক হইতে পারে

সমাজতন্ত্রের আদর্শ (Ideal of Socialism) : রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। অবশ্য জার্মান এবং ইংরাজ আদর্শবাদীগণও তাহাই মনে করিতেন। কিন্তু আদর্শবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে।

প্রাচীনকালে প্লেটো এবং এরিস্টটল শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যেই মানবজীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভবপর। জার্মানী এবং ইংলণ্ডের আদর্শবাদী দার্শনিকগণ (idealist philosophers) মনে করিতেন যে সমাজ-জীবনে কখনই সার্থকতা অর্জন করিতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের নীতি কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া, এবং স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বৈপ্লবিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে জার্মানী এবং ইংলণ্ডের আদর্শবাদী দার্শনিকগণ যৌথ দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপায়ে গঠিত হইয়াছে,—সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা আছে। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সভ্যপদই মানুষের প্রধান পরিচয়,—তাহার নিজের ইচ্ছা হইতেও রাষ্ট্রের ইচ্ছা বড়, এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছাকে না মানিয়া লইলে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। হেগেল রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই বড় স্থান দিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের আদর্শবাদের তত্ত্বে (idealist theory of the State) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা হয় এবং মানুষের অধিকার অপেক্ষা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাষ্ট্রের আদর্শবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইলেও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য আছে। সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করে যে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে,—সে সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজের উন্নতি হইলেই তাহার উন্নতি। সমাজতন্ত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়।

সমাজতন্ত্রে মানুষ সমাজের অভিন্ন অংশ

সমাজতন্ত্রের দুইটি মূল কথা হইতেছে, যে কোন কাজেরই সামাজিক ফলাফল (social result) আছে এবং যে কোনও পরিণতির সামাজিক কারণ (social causes) আছে। যেমন ধরা যাক, ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনের পিছনে কতিপয় সামাজিক কল্যাণ আছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকদের মতে বিভিন্ন কাজের উৎকৃষ্টতর সামাজিক ফল থাকা উচিত এবং সেইজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। আবার জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সামাজিক কারণগুলিরই

সমাজতন্ত্রে যে কোন কাজেরই সামাজিক কারণ এবং সামাজিক ফলাফল বিবেচিত হয়

অবদান বেশী। সুতরাং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে এবং নিয়ন্ত্রণে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে মানুষের আরও কল্যাণ সাধিত হয়।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যে সাম্যবাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুবই অবাস্তব ছিল। প্লেটোর মতে শাসকশ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সকলের সম্পত্তি এবং স্ত্রী এই দুইটিতে সকলেরই সমান অধিকার (community of property and community of wives),—এই যুক্তি বর্তমানকালে হাস্যকর এবং অবাস্তব। পরবর্তী যুগে টমাস মুর তাঁহার "ইউটোপিয়া" (Utopia) গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দেন। ইংলণ্ডে পরবর্তীকালে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) কল্পলোকের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

মার্ক্সের সমাজতন্ত্র (Marxian Socialism): সমাজতন্ত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)।[১] ১৮৪৮ সালে মার্ক্স (Marx) এবং এঙ্গেল্‌স্ (Engels) লিখিত The Communist Manifesto বইয়ে সমাজতন্ত্রে সম্পর্কে ধারনায় একটি নবযুগের সৃষ্টি হয়। এই বইয়ে তাঁহারা বলেন, "History of all hitherto existing society is the history of class struggle."[২] ১৮৬৭ সালে মার্ক্স তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত "Das Capital" গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম পরিণতি। মার্ক্সের সমাজতন্ত্র প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূল সূত্রের সাহায্যে তাঁহার সমাজতন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতেছে (১) উদ্বৃত্ত মূল্যের (Theory of Surplus Value) তত্ত্ব, (২) ইতিহাসের বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of History) এবং (৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ (Theory of class struggle)। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে 'শ্রম'। শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দুইটি সময় আছে; একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় (Socially necessary labour time) এবং অপরটি হইতেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (Surplus labour time)। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে মজুরী পায় না। যতটা মজুরী তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের মূল্য এবং যতটা মজুরী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের

১। "রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে মার্ক্স প্রদত্ত রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কিত তত্ত্বটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

২। Communist Manifesto (Lawrence and Wishart) P. 38.

মূল্য। মালিকশ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য অথবা শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় (accumulation of capital) হয়। কিন্তু, তখন ইহার দুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মালিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ (Reserve army of Labour) ততই কাজে নিযুক্ত হইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সে পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে। তখন ধনতন্ত্রের সংকট আগাইয়া আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিক শ্রেণীকে অপসারণ করিয়া সমাজতন্ত্রের অথবা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি

মার্ক্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (Materialistic interpretation of History) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম (class struggle)। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধারা তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই একটি প্রতিবিম্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বরাবরই একটি শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় (feudal lords) এবং কৃষকদের মধ্যে; শিল্প-বিপ্লবের পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। যাহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ আমরা দেখিতে পাই। মার্ক্সের মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনা নিহিত। মালিকশ্রেণী ক্রমাগত শোষণ চালাইয়া গেলে ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইবে এবং ইহার শেষ পরিণতিতে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে।

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা

মার্ক্সের মতবাদের একটি অকৃত্রিম আবেদন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্রটি একটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনে শ্রমই একমাত্র উপাদান নয়। বিভিন্ন শ্রমিকের উপযোগিতা অথবা উৎপাদনী-শক্তি বিভিন্ন ধরণের এবং সেইজন্য শ্রমিকের চাহিদার তীব্রতার উপরেও মজুরী নির্ভর করে। মার্ক্স এই বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করেন-নাই। তাহা ছাড়া, মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে সর্বদাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা নহে। শিল্প-বিপ্লবের পরেই অর্থনৈতিক

মার্ক্সের মতবাদের আবেদন

ব্যবস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং ভৌগোলিক পরিবেশও যে মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আবার, মার্ক্সের মতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ইহার ধ্বংসের সূচনা হয় এবং তখনই সমাজতন্ত্রের আরম্ভ হয়। কিন্তু, এই নীতি ভুল। অনেক দেশে এমনকি রাশিয়ায়ও ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মার্ক্স সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু, বর্তমানকালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, গণতন্ত্রও আধুনিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী নয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

মার্ক্সীয় মতবাদের সংশোধন (Modifications of Marxism): মার্ক্সীয় মতবাদ যে, সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, একথা তাঁহার উত্তরসূরীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। রাশিয়ার আমরা যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখিতে পাই তাহার জনক লেনিন মার্ক্সবাদের কিছুটা সংশোধন করিয়াছিলেন। লেনিনের পর ষ্টালিন, ষ্টালিনের পর ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃত্ব পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে এই মতবাদের ক্রমবিবর্তন ধরা পড়ে। অপরদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মাও-সে-তুং মার্ক্সবাদের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। লেনিন ট্রেড-ইউনিয়ন চেতনা এবং সমাজতন্ত্রী চেতনার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন। লেনিন বিশ্বাস করিতেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার সম্পর্কে চেতনা এমন একটি স্তরে আসিবে যাহার ফলে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইবে ; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, শুধু ধনতন্ত্রের পতন হইলেই সমাজতন্ত্রের আরম্ভ হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে জার-সম্রাটদের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত ছিল ; কিন্তু রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপ হইতেই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। লেনিন আরও মনে করিতেন যে, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের প্রেরণায় উজ্জীবিত করিবার জন্য বাহিরের শক্তিরও প্রয়োজন হইতে পারে।[১] লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই দলই সমাজতান্ত্রিক চেতনা সর্বহারা শ্রমিকদের মধ্যে চড়াইয়া দিতে পারে। লেনিনের মতে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দলগুলি উন্নত হইলে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবসায় উন্নত হইতে থাকে এবং তখন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত

১। "We said that there could not yet be social-democratic consciousness among workers (in the Russian strikes in the 1890's.) This consciousness could only be brought to them from without."—*Collected Works by Lenin edited by the Lenin Institute, vol IV. Book II* P. 114.

দলগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

মার্ক্স সর্বহারাদের একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার স্বরূপ বা সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলেন নাই। লেনিন সর্বহারাদের একনায়কত্বের স্বরূপ ও সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। লেনিনের ভাবধারা অনুযায়ী সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এককভাবে সর্বহারাদের সাম্যবাদী দলের মাধ্যমে এবং এজন্য রাষ্ট্রে শুধু এই একটি দল-ই থাকা উচিত। লেনিন সমাজে অর্থনৈতিক শক্তির সমান বণ্টন এবং ভোগসামগ্রীর সমানবণ্টনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিাছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রবিহীন সমাজ (Stateless Society) বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে এবং পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমেই আসিবে।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর রাশিয়ায় ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ট্রটস্কির (Trotsky) মতে অনগ্রসর সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি আক্রমণে উদ্যত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা পরিবৃত থাকে বলিয়া ধনতান্ত্রিক ও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সর্বহারাদের বিপ্লব ছড়াইয়া দিতে না পারিলে ঐ দেশগুলিতে বিপ্লব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব আরম্ভ হইলেই অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে বিপ্লব চালাইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, কারিগরী সাহায্য এবং সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব পাওয়া সম্ভব হয়; সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ট্রটস্কির যুক্তি

কিন্তু ষ্ট্যালিনের মতবাদ ছিল অন্যরকম, তিনি শুধু একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ("Socialism in a single country") বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে সমষ্টিগত আবাদের (collective farming) মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ষ্ট্যালিনের যুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা; একটি দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বর্ণিত সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক রূপ ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; ষ্ট্যালিন একটি মাত্র দলের (কমিউনিষ্ট দল) কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্যালিনের মতবাদ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ষ্ট্যালিনের প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ষ্ট্যালিনের মতবাদ সংশোধিত হয় ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর। ক্রুশ্চেভ এবং মিকোয়ান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের বিংশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতি করিয়াছেন। ক্রুশ্চেভের মতে ক্ষমতালিপ্সু ষ্ট্যালিন পার্টির একনায়কত্বের নামে

নিজের হাতে সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন।[১] সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের বিংশ কংগ্রেস এই অভিযোগ করা হয় যে ষ্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিরোধী কাজ করিয়াছিলেন।

ক্রুশ্চেভের আমল হইতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃত্ব পর্যন্ত ষ্ট্যালিন বিরোধী মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকে ইহাকে সংশোধনবাদ (revisionism) বলেন। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের বিংশ কংগ্রেসে স্বীকৃত হইয়াছে যে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য একাধিক পন্থা থাকিতে পারে। এমন কি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির পার্লামেণ্টগুলিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারক হইতে জনগণের বাহকে ("from an organ of bourgeois democracy into a genuine instrument of the people's will...") রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া ক্রুশ্চেভ ধারণা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় চিন্তাধারা মৌলিক মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হইতে যে পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান নেতৃত্ব সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী (Social imperialists) বলিয়া অভিহিত করেন।

ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভ

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নেতা মাও-সে-তুং (Mao-Tse-Tung) জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব অথবা নয়া গণতন্ত্রের (people's democratic dictatorship or New Democracy) সমর্থক। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ, ক্ষুদ্র পর্যায়ের বুর্জোয়া (petty bourgeoisie) এবং জাতীয় বুর্জোয়া (national bourgeoisie) লইয়াই জনসমষ্টি গঠিত। মাও-সে-তুং মনে করেন, জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর একনায়কত্ব এই দুইটি ব্যবস্থার সমন্বয়-ই হইল জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।[২]

মাও-সে-তুং

সমাজতন্ত্রের অন্যান্য রূপ (Other forms of Socialism): সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রে (collectivism) উৎপাদনের উৎপাদনগুলির জাতীয়করণ করা হয় যাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। অপরদিকে বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হয়। সমাজে

সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্র

১। "...the cult of the individual acquired such monstrous size chiefly because Stalin himself, using all conceivable methods, supported the glorification of his own person."—Kruschev.

২। "The combination of these two aspects, democracy for the people and dictatorship over the reactionaries, means the people's democratic dictatorship". Mao-Tse-Tung—On People's Democratic Dictatorship. P. 13.

যাহাতে অর্থনৈতিক শক্তি কোনও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্র তাহার ব্যবস্থা করে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রীগণ বিশ্বাস করেন। বর্তমানে ভারতে **গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র** (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার সহিত সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আরও এক ধরণের সমাজতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই; ইহার নাম **রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র** (State Socialism)। ইংলণ্ডে শ্রমিকদল কর্তৃক সরকার গঠিত হইবার পর আমরা কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতা, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিকদের জীবনবীমা, কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি প্রবর্তন করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে তাহার সহিত রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকে। জর্জ বার্ণার্ড্ শ প্রমুখ কতিপয় ইংরাজ দার্শনিক **ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্রে** (Fabian Socialism) বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদে জোরজবরদস্তি করিয়া কখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনমত যখন সুশিক্ষিত হইবে, তখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে। সুতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের মতে সাহিত্যের উন্নতির মারফৎ ক্রমে ক্রমে জনমতকে সুশিক্ষিত এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র

ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্র

যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) তিনটি মূলনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় এই মতবাদেও 'শ্রম'কে উৎপাদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উৎপাদানগুলির মালিকানা হইল শ্রমিকের, এবং তৃতীয়তঃ, মালিকানার অধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার থাকিবে। দরকার হইলে এইজন্য ধর্মঘট ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণ রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাসী নহেন। তাঁহাদের মতে শ্রমিক শ্রেণী প্রয়োজন হইলে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে। তাঁহারা সমগ্র সমাজব্যবস্থা শ্রমিক সংঘের অধীনে আনয়ন করিবার পক্ষপাতী। শ্রমিকসংঘগুলিই শ্রমিকদের পক্ষ হইতে উৎপাদনের সমুদয় উপাদানগুলির মালিকানার অধিকারী হইবে। আর এক ধরণের সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্রের ন্যায় বিভিন্ন শ্রমিক সমিতি-

যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র

গুলিরও ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতিগুলিই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হইবে ; এই সমিতিগুলি গঠিত হইবে শ্রমিকগণ কর্তৃক। ইহাকে **সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ** (Guild Socialism) বলে। এই মতবাদেও উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় ; কিন্তু, তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক নহে, সেইগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকদের সমিতিগুলি কর্তৃক। এই মতবাদের সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন করিয়া কিছু সমিতিগুলিকে অর্পণ করা উচিত। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন সমিতি গঠন করিয়া সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চেষ্টা করে। এইভাবে সমগ্র সমাজের সমুদয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হইয়া যায়।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্র

আধুনিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of modern Socialism) ঃ আধুনিক সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন উপদানের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সমস্ত ধন-সম্পদেব ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করিয়া সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণ সাধন করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সেইজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করা হয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সামাজিক মালিকানার অধীনে আনা হয়। তাহা ছাড়া, সমাজের বিভিন্ন শিল্প অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলিকেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। সমাজের প্রয়োজন কতটা সিদ্ধ হইবে তাহাই শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তিগত মুনাফার স্থলে সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সবল কর্তৃক দুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা হয়, তাহা দূর করাই সমাজতন্ত্রের কার্যসূচী। শুধু আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের প্রত্যেকটি লোকের কর্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত করিয়া দেশের সমুদয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করাও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর করা সমাজতন্ত্রের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজতন্ত্রে সব শিল্পকেই জাতীয়করণ করা হয় এবং সমাজের স্বার্থে ইহাকে ব্যবহার করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদ সমাজ হইতে সব শোষণ দূর করার চেষ্টা করে

আধুনিককালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা **সাম্যবাদ** (Communism) দেখিতে পাই। সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রীদের (State capitalism) ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে বিপ্লব হইতেছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার অপরিহার্য উপায়। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইতেছে প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী ("From each according to his ability, to each accor-

সাম্যবাদ

ding to his needs") অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া। তবে সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রের অচিরাৎ ধ্বংসের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে সাম্যবাদী ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইবে।

সাম্যবাদে একটিই মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে; তাহা হইতেছে সাম্যবাদী দল (Communist Party)। সাম্যবাদ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। সাম্যবাদ হইতেছে একটি আন্তর্জাতিক আদর্শ। সাম্যবাদী দেশগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বোঝাপড়ার মাধ্যমে চলে। আধুনিক কালে সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দুইটি শিবির দেখা যায়। একটি হইতেছে মাও-সে-তুং-এর ভাবাদর্শে পরিচালিত শিবির। সাম্যবাদী চীন হইতেছে এই শিবিরের নেতা। আরেকটি হইতেছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী শিবির। সাম্যবাদীগণ নিজেদের লেলিনের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে করেন। সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর করার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) এবং **যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের** (Syndicalism) মধ্যে কতকাংশে মিল আছে। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রে চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে শ্রমিক সংঘগুলি সমাজের সম্মতিক্রমে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। তখন শ্রমিকসংঘগুলি একত্রিত হইয়া একটি শ্রমিক সমবায় (confederation of labour) গঠন করিবে এবং ইহা রেলপথ, ডাকবিভাগ মুদ্রাসম্পর্কিত নীতি কার্যকর করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করিবে। ইহাই হইতেছে সংঘমূলক সমাজতন্ত্র। সংঘমূলক সমাজতন্ত্র এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চায়, কিন্তু যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ চায় রাষ্ট্রের অবসান।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Socialism) : সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার সুবিধাগুলি আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়া শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ন্যায়পরতার দিক হইতে আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের স্থান খুবই উঁচুতে।

সমাজতন্ত্রে ন্যায়পরতার আদর্শ অনুসৃত হয়

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা যে অবাধ বাণিজ্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই, তাহার অপচয়গুলি সমাজতন্ত্রে বন্ধ হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদকগণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রেরণায় কাজ করেন না। কারণ, সমাজতন্ত্রে সমুদয় মুনাফা সমাজের কোনও ব্যক্তি বিশেষের নহে। উৎপাদকগণের কাজের লক্ষ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি করা। সমাজতন্ত্রে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারজনিত খরচ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় এবং জনস্বার্থবিরোধী জিনিসপত্রের উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভবপর হয়। ইহাতে উৎপাদনীশক্তির যে অপচয় বন্ধ হয় তাহা উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রিত সহযোগিতামূলক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার সমুদয় ত্রুটি দূরীভূত হয়।

অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ প্রতিযোগিতার অপচয় বন্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্রীগণ দাবি করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসততা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত করে। সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে যতদিন ধনের বৈষম্য থাকিবে এবং সেইজন্য মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে, ততদিন লোকের ভোটাধিকারের মূল্য নাই। সম্পত্তির সাম্য রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সমাজতন্ত্র হইতেছে গণতন্ত্রের অর্থ নৈতিক পরিপূরক।[১]

সমাজতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা উন্নত করে

চতুর্থতঃ, জমি, খনি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিয়া সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলেরই হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাহাতে সব মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে সমান উপকার পায়। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদীগণের যুক্তি ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নতি হইলেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নয়নে ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যদি সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া লওয়া হয়। গণতন্ত্রে সকলকেই সমান অধিকার

১। "The fact that men have the right to vote is of the little value if wide differences in wealth give influence and power to a small class. Equality in property...is essential to equality in political rights ; hence, socialism is the economic complement of democracy."

দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। মানুষ যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী না হয়, তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।" এই নীতি সহযোগিতার নীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,"—সার্থক সমাজতন্ত্রে এই নীতিটি কার্যকর হইতে দেখা যায়। সর্বশেষে, সমাজতন্ত্রে পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত সংগঠিত হয়।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পরিপূরক

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Socialism) : সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল ইহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে এবং ব্যক্তিবিশেষের কর্মোদ্যোগ ও কর্মক্ষমতার প্রকৃত মর্যাদা দেয় না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত, রাষ্ট্রের হাতে সমুদয় ক্ষমতা তুলিয়া দিলে সমাজ জীবনে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইতে পারে।

ইহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অধিকতর আস্থা রাখে

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অবহেলা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই ক্ষুণ্ণ হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল যাঁহারা সরকার গঠন করিয়া রাষ্ট্রের পরিচালনা করেন, তাহারাই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের পক্ষে দুর্নীতি চালাইয়া যাইবার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করার সুযোগ দেখিতে পাই। ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতাও কমে, জনসাধারণও সরকারের সমালোচনা করিয়া বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা সমাজতন্ত্রের অন্যতম অপগুণ। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য সামরিক বিভাগকে খুব শক্তিশালী ও শৃংখলাপরায়ণ রাখে, তাহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা ত' ক্ষুণ্ণ হয়-ই, বরং তাহারা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারের অধীনে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সরকার ক্রমেই আমলাতান্ত্রিক এবং দায়িত্বহীন হইয়া পড়ে।

ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অবহেলা করে

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী কর্মোদ্যম ও শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের বেসরকারী প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারী শিল্পপতিগণ মুনাফার আশায় নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি করেন। ইহাতে তাহাদের নিজের কিছু পরিমাণে

মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়, দেশেরও শিল্পোন্নয়ন হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের কর্মোদ্যম নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দিতে না পারে, তবে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ প্রত্যেকের বৃত্তি নির্বাচনের (choice of occupation) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের হাতে।

সমাজতন্ত্রে বেসরকারী উদ্যোগ ব্যাহত

চতুর্থতঃ, উৎপাদনে উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। ধনতন্ত্রে উৎপাদকগণ যখন কোন জিনিস উৎপাদন করে, তখন মুনাফা লাভের আশায় তাহারা খুবই আন্তরিকভাবে কাজ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুনাফার অর্থ যায় রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে উৎপাদকগণও আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে না।

উৎপাদকগণ কাজে উৎসাহ পায় না

পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেই দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে। বরং একজন আমেরিকানের মাথাপিছু জাতীয় আয় একজন রাশিয়ানের মাথাপিছু জাতীয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী ; জীবনযাত্রার মানও রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক উন্নত। সুতরাং শ্রমিকরা কখন কতটা সুবিধা পাইবে তাহা মালিকদের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যে শিল্পপতিগণ সর্বদা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, এমন কোনও কথা নাই।

সমাজতন্ত্র ব্যতীত কোন দেশ যে উন্নত হইতে পারে আমেরিকা সেই দৃষ্টান্ত দিয়াছে

সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। তাহা ছাড়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ কর্মোদ্যোগ ও আত্মনির্ভরশীলতা হারাইয়া ফেলে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে।

ইহা বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে সমাজতন্ত্র (Socialism as complement to Democracy): গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নহে। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র উভয়ই হইতেছে এমন রাষ্ট্রাদর্শ

যেখানে মানুষ নিজের সত্তা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়, সমাজের কাজে অংশগ্রহণ করে এবং যেখানে মানুষে মানুষে কোন তারতম্য করা হয় না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি-ই নিজেকে গণতন্ত্রবিরোধী হিসাবে পরিচিত করিতে চাহেন না। আধুনিক প্রগতিশীল পৃথিবীতে অনেকেই মনে করেন যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ এই যুক্তি মানিতে চাহেন না। যাঁহারা সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে সংঘাতের কারণ দেখিতে পান, তাঁহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে এই দুইটি আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহাই বড় করিয়া দেখাইয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন যে গণতন্ত্রে যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ হয়, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দরুণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ (Private enterprise) অব্যাহত থাকে, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই সমুদয় অর্থনৈতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ। শিল্প জাতীয়করণ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দরুণ সমাজতন্ত্রে যথেচ্ছভাবে বেসরকারী বিনিময় এবং শ্রমিক শোষণ বন্ধ থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবেচনা করিয়া রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র হইতেছে পরস্পর বিরোধী,—পরস্পরের পরিপূরক নহে। কিন্তু এই যুক্তিটি ঠিক নহে।

রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণের মতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ আছে

আদর্শের দিক হইতে চিন্তা করিলে দেখা যায়, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক; একটি না থাকিলে অপরটি সম্পূর্ণ হয় না। গণতন্ত্রে সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হয়। গণতন্ত্র যে শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ তাহাই নহে, ইহা একটি নৈতিক ধারণা (ethical concept) এবং একটি সমাজব্যবস্থা। নীতির দিক হইতে গণতন্ত্র এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে যে যাহা-কিছু গণতন্ত্রবিরোধী, তাহাই সকলে বর্জন করিতে চাহেন। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে কোন পার্থক্য নাই। বার্নসের মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত সমাজ নয়—গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী—যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।[১]

প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পরের পরিপূরক

১। "...a society, not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."—C. D. Burns, Political Ideals.

গণতান্ত্রিক সমাজে সব নাগরিকেরই সমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে যদি জন্ম এবং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সমাজতন্ত্রেও আমরা অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সাদৃশ্য

সমাজতন্ত্রেও জনগণের স্বাধীনতা যাহাতে সর্বাধিক পরিমাণ থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়; জনসাধারণকে লইয়াই সমাজ গঠিত। সমাজতন্ত্রের আদর্শে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এমন কোন নীতি নির্ধারণ করিতে অথবা অনুসরণ করিতে চাহেন না, যাহাতে জনগণের কল্যাণ সাধন করিবার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না অথবা যাহাতে জনসাধারণের সম্মতি থাকে না। তবে গণতন্ত্রে যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকে, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে। সমাজতন্ত্র সমাজের প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধন করিতে চায়, যেমন গণতন্ত্রও চায় প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধন করিতে। সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক হইতে এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারা দাবী করেন যে সমাজতন্ত্র কখনই গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোয় জনগণের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকে, অবশ্য সেই মতামত অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক হইতে হইবে,—সমাজতন্ত্রবিরুদ্ধ হইলে চলিবে না। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যখন প্রচার করেন যে সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর করিতে হইবে, সমাজ হইতে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে, সমাজের প্রত্যেককেই অপরের কল্যাণের জন্য এবং নিজের স্বাধীনতার সহিত অপরের স্বাধীনতাও বজায় রাখিতে হইবে, তখন তাঁহারা সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন, আমরা ইহা বলিতে পারি না।

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য এবং তাহা দূর করার উপায়

তবে গণতন্ত্রের সহিত সমাজতন্ত্রের মূল পার্থক্য হইতেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রে যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়, সমাজতন্ত্রে সেখানে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে আয় ও ধনের বৈষম্য থাকে, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তির সম-বণ্টন করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু, গণতন্ত্রেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখা যায়। ভারতেই আমরা গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) দেখিতে পাই। সমাজতন্ত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান নিজের ইচ্ছানুযায়ী অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিতে অথবা প্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইতেছে সমুদয় অর্থনৈতিক

ক্ষমতার সুষ্ঠু বণ্টন করার এবং তাহা প্রয়োগ করার। কিন্তু সেইজন্য গণতন্ত্রে কোনও অবস্থায় নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না। আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে (welfare state) নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকেও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক নীতির সহিত সংমিশ্রণ করিয়া গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার (social security) সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে,—সামাজিক ন্যায়ের (social justice) স্বার্থে আয় এবং ধনের বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করে, এবং প্রত্যেক নাগরিকই যাহাতে এক সুস্থ ও সুখী জীবন যাপন করিতে পারে সেইজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করে। এই ব্যবস্থাগুলি প্রত্যেকটিই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সুতরাং আমরা বলিতে পারি সমাজতন্ত্র হইতেছে গণতন্ত্রের পরিপূরক,—একটি ছাড়া অপরটি সম্পূর্ণ হয় না। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যাহাতে নিরাপদ থাকে সেইজন্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কতিপয় সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিতে হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যেমন, ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশগুলি বহু সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিয়াছে ; এইজন্যই বলা হয়, "For its survival, democracy must be diluted with and not polluted by Socialism." সমাজতন্ত্রের প্রতি একটি সাধারণ প্রবণতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা জাহির করিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করে। গণতন্ত্রকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয় তবে সমাজতন্ত্রের ভাল জিনিসগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সংমিশ্রণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে। তাহা না হইলে গণতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিবে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে মানুষ নিজের সমুদয় অধিকার যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অপরপক্ষে কিছু পরিমাণে সমাজতন্ত্রের আদর্শ যদি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ না করে, তবে সমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হইয়া অন্য লোকদের শোষণ করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন রাষ্ট্রই ইহা মানিয়া লইতে পারে না।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিয়া থাকে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

মিশ্র অর্থনীতি

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এইজন্যই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের (Democratic Socialism) আদর্শ প্রচার করে ; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মিশ্র-অর্থনীতির (Mixed Economy) কাঠামো গ্রহণ করে, অর্থাৎ একদিকে অত্যাবশ্যক এবং গুরুভার শিল্পগুলিকে জাতীয়-

করণ করিয়া একটি সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) গঠন করে, অপরদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বজায় রাখিয়া একটি বেসরকারী ক্ষেত্রকে (Private Sector) মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে কাজ চালাইতে অনুমতি দেয়। অবশ্য বেসরকারী ক্ষেত্র যাহাতে সাধারণ মানুষের শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকে। দেখা যাইতেছে সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি অনুসৃত না হইলে গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর নহে। এই জন্যই বলা হয়, "Democracy is never complete without Socialism." অপরদিকে সমাজতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাও মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনে, সমাজতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ এবং সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা যায় এই প্রকার যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে জনসাধারণের মতামতকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান পৃথিবীতে সব সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজেদের গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসাবে পরিচিত করিতে খুবই আগ্রহী। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে ধরণের গণতন্ত্র দেখিতে পাই তাহাকে রক্ষণশীল গণতন্ত্র (Conservative Democracy) বলা যাইতে পারে। এই ধরণের গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পরিপূরক নহে। জাপান পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু আছে ; তবে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের পরিপূরক কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আদর্শের দিক দিয়া গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পরিপূরক হইলেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যে সকল সমাজতন্ত্রী দেশে এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায়, সেগুলিতে গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ন দেখা যায় না।

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পরকে ছাড়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি (Proper sphere of the State) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা করিয়া ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি এই মতবাদের কোনটির সাহায্যেই সম্পূর্ণভাবে বুঝানো যায় না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য নির্ভর করে ইহার ক্রিয়াকলাপের উপর।[১] রাষ্ট্র হইতেছে সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কল্যাণের জন্য, মানুষকে উপযুক্ত করিবার জন্য একটি সংস্থা এবং এই কাজ ইহা কতটা করিতে পারে তাহার উপরেই ইহার সার্থকতা নির্ভর করে। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকর করিতে সমর্থ। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্র কোনটিই সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি বুঝাইতে পারে না

১। "The importance and value of the state can be judged only by its results."

ক্রিয়াকলাপ সীমিত করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের কাজকর্মে কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে। সেইজন্য জরুরী অবস্থা ব্যতীত স্বাভাবিক সময়ে শাসনতন্ত্রের নির্দেশেই রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা সীমাহীনভাবে ভোগ করে না। শুধু যুদ্ধ এবং জরুরী অবস্থার সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের পরিধি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্রকে অবশ্যই সম্পাদন করিতে হয় এবং সেই কাজগুলির জন্য রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্র জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেয়। পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থা এবং ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধিরও পরিবর্তন হয়। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং লোকায়ত্ত সরকার উভয়ই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক সংস্কারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নূতন ধারণার সৃষ্টি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের দিকে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কতিপয় বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতায় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি হস্তক্ষেপ করে না; যেমন, ধর্ম, জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত স্বাধীন চিন্তাধারা। কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে) বেসরকারী সম্পত্তির উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না।

কতিপয় কাজ রাষ্ট্র নিজে সম্পাদন করে এবং কতিপয় কাজ রাষ্ট্র জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেয়

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের প্রতি একটি প্রবণতা দেখা যায়

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্মকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি ;—

(১) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন করা যে কোন রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলেই রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়, আবার (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন করা, রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। এইগুলি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক অথবা বিকল্প (optional) ক্রিয়াকলাপ। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলি তিনভাগে বিভক্ত। যথা,— ১) কতিপয় কাজ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সহিত জড়িত, (২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি জনসাধারণের আইনগত অধিকার এবং স্বাধীনতার সহিত জড়িত, এবং (৩) সর্বশেষে, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সাধারণ কল্যাণের সহিত জড়িত। এই ক্রিয়াকলাপগুলির প্রথম দুইটি রাষ্ট্রের আবশ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে এবং সর্বশেষটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যে কোন রাষ্ট্রেরই অবশ্য কর্তব্য। আবার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। মুদ্রা ব্যবস্থা চালু রাখা

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: অবশ্য সাধারণ ভাবে এই কাজগুলি তিন ভাগে বিভক্ত

এবং ডাক ও তার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু, শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে ঐচ্ছিক কর্তব্য। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ইহা নিজে নির্ধারণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে ইহা বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে। বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং ঐচ্ছিক কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখার গুরুত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বর্তমানে জনসাধারণের সামগ্রিকভাবে সব কিছু ভালমন্দের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এইজন্য যে জনসাধারণ স্বাধীনতা ভোগ করে না তাহা নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়; ইহাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব। আবার যখনই জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে; ইহাই সমাজতন্ত্রের প্রভাব। সেইজন্য শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা শুধু সমাজতন্ত্রবাদ; কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করিতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক এবং অসমাজ-তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হয়।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে একদিকে আছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, অপরদিকে আছে সমাজতন্ত্রের প্রভাব

সামাজিক ব্যবস্থা যত জটিল হইতে থাকে, সাধারণ কল্যাণ অর্জন করিতে হইলে ততই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামগ্রিক সমাজের স্বার্থের নিকট খাটো করিতে হয়। বিশেষতঃ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিবার যোগ্যতা মানুষের আছে, এই বিশ্বাস হইতে এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকায় নাগরিকগণ রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে।

সামাজিক ব্যবস্থা যত জটিল হয় তত ব্যক্তি-গত স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে হয়

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধির কোনও সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। এখন যাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ঐচ্ছিক কর্তব্য মনে হইবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হইলেই ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যিক কর্তব্য মনে হইতে পারে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ হইতেছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কতিপয় মৌলিক দুর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজন। শুধু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নহে, কোন কোন কাজে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন,—এই জিনিসটি প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই অনুভব করিতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধিকে সীমিত করা সম্ভবপর নহে।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধির কোন সীমারেখা নাই

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ (**Functions of the state**)—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় আবশ্যিক অথবা প্রাথমিক কাজ (Essential or primary functions) আছে। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। এইগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ (Optional or Non-essential functions) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেইগুলি প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়। যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় পররাষ্ট্রের সহিত কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের নাগরিকদের কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের কী সম্পর্ক হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। নাগরিকদের সহিত পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এইজন্য রাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং অনেক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একদিকে যেমন কারা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপর দিকে সেই প্রকার রাষ্ট্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। যে কোন ধরণের সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, রাষ্ট্রকে এই কাজগুলি সর্বদাই করিতে হয়।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ এবং ঐচ্ছিক কাজ

যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে সরকারের কাজ

সেনাবাহিনী নিয়োগ করা রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় কাজ

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহার সার্বভৌমত্ব। নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একটি সামরিক বিভাগ রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে একটি সুসংগঠিত সরকার। ইহা যাহাতে গঠিত হয় এবং ইহা যাহাতে ভালভাবে বিভিন্ন কাজ চালাইয়া যাইতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে, জনসাধারণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসার করা। তাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের সহিত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার কোনও বিরোধ নাই।

রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজ

রাষ্ট্রের বিকল্প অথবা ইচ্ছামূলক কাজগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অথবা নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত নয়। রাষ্ট্র এই কাজগুলি করে নাগরিকদের সাধারণ কল্যাণের জন্য। নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই উদ্যোগী হইতে পারে। শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে রাষ্ট্র কোনও কোনও প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি করিবার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। আবার, কতিপয় শিল্পের উন্নতির ভার বেসরকারী প্রয়াসের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা শ্রমিক কল্যাণ, পূর্তকাজ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়া নিজে বিভিন্ন কাজ করিতে পারে—সমাজে যাহারা বেকার, বৃদ্ধ ও পঙ্গু তাহাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বেকার-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা এবং অক্ষমতা-ভাতা ইত্যাদির প্রচলন করিতে পারে। সাধারণতঃ কল্যাণ-রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়। কল্যাণ-রাষ্ট্রে এই কাজগুলি বর্তমানে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এইজন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে সীমারেখা টানা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঐচ্ছিক কাজ

জনসাধারণের সুবিধার জন্য রেলপথ স্থাপন করা পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হইতেছে। এমন কি শিক্ষা বিস্তারেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমেই স্বীকৃতি হইতেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে,—এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে ততই বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে স্বীকৃত হয় রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য কতটা চেষ্টা করিতে পারে তাহার দ্বারা। জনগণের কল্যাণেই রাষ্ট্রের কল্যাণ—এই তত্ত্বটি যখনই স্বীকৃত হইবে তখনই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হইবে না।

কতিপয় কাজ হয়ত পূর্বে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ ছিল, বর্তমানে সেইগুলি প্রাথমিক কাজ

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ *laissez faire* নীতি বা স্বাধীন প্রচেষ্টার নীতির উপর ভিত্তিশীল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ, জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝে এবং সেইজন্য রাষ্ট্রীয় জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি—সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকে প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণ সন্দিহান। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত স্বায়পরতার ভিত্তিতে (Ethical argument) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে উচিত। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক দিক হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থায় বাণিজ্যের জন্য বে-সরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়। চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন, যে অতীত অনেক দেশেই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ বুঝিতে পারে সেজন্য তাহাদিগের যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা—এই মতবাদের যে কোন যুক্তি নাই তাহা নহে। তবে বর্তমানকালে এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা কোন দেশেই সম্ভবপর হয় নাই। প্রথমতঃ, অবাধ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন শিল্পকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারের পথ সুগম করে। দ্বিতীয়তঃ, একথা ঠিক নয় যে জনসাধারণ সর্বদাই নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরা বুঝিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোন দেশেই সুপরিকল্পিতভাবে অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না। সর্বশেষে, রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাদের কাজে লাগান যায় না।

সমাজতন্ত্রের আদর্শ—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সমাজতন্ত্রে সব সামাজিক কাজেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে। উৎপাদনের উপকরণগুলিও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে। সমাজতন্ত্রের আর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাকে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়া যায়, সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের স্থানে সামাজিক লাভ বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে সবল কর্তৃক দুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা হয় তাহা দূর করাই সমাজতন্ত্রের কার্যসূচী। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ হইতেছে প্রত্যেককে তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া, যাহাতে সমস্ত ধনসম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হয়।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার সুবিধাগুলি আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়া শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রে কোন সম্পদের অবাধ প্রতিযোগিতাজনিত অপচয় হয় না। তৃতীয়ত, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীগণ দাবী করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসততা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থায় নৈতিক মান অনেক উন্নত করে। চতুর্থত, জমি, খনি

প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিলে সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। পঞ্চমত, গণতন্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যদি সমাজতন্ত্রকে পরিপূরক ধরিয়া লওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা, রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে, এবং ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার কোন মূল্য দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বে-সরকারী শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়। সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উপাদানের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়; তাহা নহে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে। সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ–(**Functions of the State**)—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় আবশ্যিক অথবা প্রাথমিক কাজ (Essential or Primary function) আছে। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। এইগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ (Optional or Non-essential functions) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেইগুলি প্রথমত রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়। তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে এক দিকে যেমন কারা বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপর দিকে সেই প্রকার একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে হয়।

Exercise

1. Discuss the various views regarding the ends and purposes of the state.

[রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা কর।] (৩৮৩-৩৮৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the value and limitations of individualism as a social and political theory.

[সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বাদের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। (৩২১-৩২৭ পৃষ্ঠা ; ৩২৩-৩২৬ পৃষ্ঠা)

3. Examine the arguments in favour of Individualism as a theory of state function.

[রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি সমূহ পরীক্ষা কর।]

(৩২৩-৩২৬ পৃষ্ঠা)

4. Compare and contrast the various forms of Socialism as regards aims, methods and programmes of actions.

[উদ্দেশ্য পদ্ধতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তুলনা কর।]

(৪০২-৪০৫ পৃষ্ঠা)

5. Examine Marxian concept of Socialism and throw some light on subsequent modification.

[মার্কীয় সমাজতন্ত্রবাদ পরীক্ষা কর এবং ইহার পরবর্তী সংশোধনের উপর কিছু আলোকপাত কর।] (৩৯৮-৪০২ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the arguments for and against Socialism.

[সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা কর।] (৪০৫-৪০৮ পৃষ্ঠা)

7. "Socialism proposes to complete rather the oppose the liberal democratic creed."—Discuss the statement.. (C. U. B. A. Part I, 1962 , 1966, 1968.)

["সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতবাদকে সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাব করে, বিরোধিতা করিবার নহে" । আলোচনা কর। (৪০৮-৪১২ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the proper sphere of the State.

[রাষ্ট্রের প্রকৃত স্তর আলোচনা কর।] (৪১২-৪১৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the essential and the optional functions of the State.

[রাষ্ট্রের অপরিহার্য এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।] (৪১৬-৪১৬ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the Individualistic theory regarding the functions of government. (C. U. B. A. Part I, 1967)

[সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের তত্ত্বটি আলোচনা কর।

(৩৯১-৩৯৩ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the functions of the social-welfare States. Account for the increased state activity in recent times.

[সমাজ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর। বর্তমান সময়ে পরিবর্ধিত রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের কারণ বর্ণনা কর। (৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠা)

12. Explain the meaning of socialism and point out its merits and defects. (C. U. B. A.1972)

[সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ নির্ণয় কর।]

(৪০৪-৪০৫ পৃষ্ঠা ; ৪০৫-৪০৮ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জাতিপুঞ্জ হইতে রাষ্ট্রসংঘ

(From the League of Nations to the United Nations Organisation)

[ভূমিকা—জাতিপুঞ্জ—জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ, সভা, পরিষদ, কর্মদপ্তর, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, স্বাস্থ্য সংস্থা, অন্যান্য সহকারী সংস্থা—জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে মন্তব্য—রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তুতি—রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবনা—রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি—রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগ—সাধারণ সভা—নিরাপত্তা পরিষদ—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—অছি পরিষদ—আঞ্চলিক পরিষদ—আঞ্চলিক বিচারালয়—রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তর—রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন—সম্মিলিত নিরাপত্তা—রাষ্ট্রসংঘের মূল্যায়ন।]

ভূমিকা :—জাতীয়তাবাদের দোষগুণ আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ যেমন বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক স্থাপন

করিয়া সভ্যতার অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়, বিকৃত জাতীয়তাবাদ সেই প্রকার আন্তর্জাতিক শান্তি ক্ষুণ্ণ করে, সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে এবং সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির দিকে লইয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন লীগ অফ্ নেশন্‌স্ (League of Nations) বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হইল, তখন ভার্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী মোটামুটিভাবে জাতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে আমরা দেখিয়াছিলাম ইটালী এবং জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ, একদিকে ফ্যাসীবাদ এবং অপরদিকে নাৎসীবাদ যুদ্ধের উন্মাদনায় এবং একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার আগ্রহে বিশ্ব-শান্তির উপর প্রবল আঘাত হানিয়াছিল। উহার পরিণতি হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব-শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়াসে স্থাপিত হইল রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) ইহার কাজ কতটা সফল হইয়াছে, ইহার বিভিন্ন দপ্তর কিভাবে কাজ করে এবং রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের দেখা উচিত ইহা কতটা আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতা বজায় রাখিতে পারিতেছে। প্রথমে আমরা আলোচনা করিব জাতিসংঘ (League of nations) সম্বন্ধে।

জাতিপুঞ্জ (League of Nations) ঃ জাতিপুঞ্জের সনদ (Covenant of the League of Nations) গৃহীত হয় ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির মধ্যে। ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ণ অধিবেশনে জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হয় এবং ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারী ইহা সরকারীভাবে অনুমোদিত হয়। জাতিপুঞ্জ যখন গঠিত হয় তখন জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পূর্বতন শত্রুরাষ্ট্রগুলিকে প্রাথমিক ভাবে ইহার সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং শুধু চুক্তি-স্বাক্ষরকারী মিত্রগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলিকেই সদস্যপদ দেওয়া হয়। সদস্যপদ নির্ধারিত হইত জাতিপুঞ্জের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ দাঁড়ায় ৪০; ইহার পর সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং ১৯৩২ সালে জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা হয় ৫৫। ১৯৩৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য হইতে স্বীকৃত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। যে কোন রাষ্ট্র দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া জাতিসংঘ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিত; সদস্যপদ ত্যাগ করিলেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে কতিপয় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করিতে হইত। যদি জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য ইহার নিয়ম ভঙ্গ করিত তবে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি একমত হইলে সেই রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিত। আবার যদি কখনও জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধিত হইবার পর কোন রাষ্ট্র সেই সংশোধিত বিধান গ্রহণ না করিত তবে সেই রাষ্ট্রের সদস্যপদ রদ করা হইত।

জাতিপুঞ্জ কখনই একটি অতি-জাতীয় রাষ্ট্রে (Supernational State) পরিণত হয় নাই ; সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব সর্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকিত। জাতিপুঞ্জের নির্দেশ পালন করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিল না। জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনী ছিল না।

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ : জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রধান ছিল—(১) সভা (Assembly), পরিষদ (Council) এবং কর্মদপ্তর (Secretariat)।

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ

(১) **সভা** (Assembly)—জাতিপুঞ্জের সব সদস্য-রাষ্ট্রই সভা গঠন করিত এবং সভায় প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি থাকিতেন। কিন্তু প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট প্রদান করিবার অধিকার ছিল। এই সভা বিশ্বশান্তির সঙ্গে জড়িত সমুদয় বিষয় বিচার-বিবেচনা করিত। উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইত। এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে জাতিপুঞ্জের চুক্তি সংশোধন করিতে পারিত। কিন্তু এইজন্য পরিষদের (Council) সর্বসম্মত অনুমোদন দরকার হইত। বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিবেচনা করা ছাড়াও সভার আরও কতিপয় কাজ ছিল। সেইগুলি হইতেছে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে এই প্রকার বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সমূহ বিচার-বিবেচনা করা এবং সেইগুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

সভার বিভিন্ন কাজ

(২) **পরিষদ** (Council)—পরিষদ ছিল জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রথমে ঠিক হইয়াছিল যে নয়জন সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইবে স্থায়ী সদস্য এবং অপর চারজন সদস্য সভার বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্র হইতে নির্বাচন করা হইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য না হওয়ায় পরিষদের একটি স্থায়ী সদস্যপদ অনেকদিন শূন্য পড়িয়া থাকে। অবশেষে ১৯২৬ সালে জার্মানী জাতিসংঘের সদস্য নির্বাচিত হইলে এই আসনটি পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪ এবং ইহার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল স্থায়ী সদস্য এবং অপর ১১টি রাষ্ট্র ছিল অস্থায়ী সদস্য।

পরিষদের বিভিন্ন কাজ

পরিষদে প্রতিটি সদস্য-রষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। কয়েকটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই পরিষদকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইত। পরিষদের কাজ ছিল আন্তর্জাতিক কলহের নিষ্পত্তি করা, আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করা এবং নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা করা প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসার জন্য যদি কোন মধ্যস্থতা

অথবা সালিশী কার্যকর না হইত, তবে সেই বিষয়টি পুনরায় পরিষদের নিকট পেশ করিতে হইত। যদি বিবদমান রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি সমস্যার সমাধানের জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিত এবং যদি বিবদমান রাষ্ট্রগুলির যে কোন্ একটি রাষ্ট্র ইহা সমর্থন করিত তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে না এই প্রকার অঙ্গীকার জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি প্রদান করিত। কোন প্রকার আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা না হইলেও যাহাতে ন্যায় ও অধিকার বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব ছিল পরিষদের এবং দরকার হইলে জাতিসংঘের চুক্তিভঙ্গকারী কোন দেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিবার সুপারিশ পরিষদ প্রদান করিতে পারিত।

আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসায় পরিষদের ভূমিকা

(১) **কর্মদপ্তর** (Secretariat)—জাতিপুঞ্জের একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল এবং ইহা সেক্রেটারী জেনারেলের (Secretary General) তত্ত্বাবধানের অধীন ছিল। জাতিপুঞ্জের কর্মদপ্তরে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০। কর্মদপ্তরের মুখ্য কাজ ছিল জাতি সংঘের অধিবেশনের কর্মসূচী প্রণয়ন করা, জাতিপুঞ্জের দলিলপত্র সংরক্ষণ করা এবং ইহার কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা। সেক্রেটারী জেনারেলকে সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হইত।

জাতিপুঞ্জের কর্মদপ্তর

জাতিপুঞ্জের উপরোক্ত তিনটি বিভাগ ছাড়াও ইহার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল; ইহাদের মধ্যে একটি ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice), অপর একটি ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation), এবং এই দুইটি সংস্থা ছাড়া বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান (Auxiliary Organisation)।

জাতিপুঞ্জের সনদের বিধান অনুযায়ী জাতিসংঘকে একটি আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে পরিষদ একটি কমিশন নিয়োগ করে। আইন বিশারদদের লইয়া গঠিত এই কমিশন যে সুপারিশ প্রদান করেন, তাহার অল্প-বিস্তর সংশোধন হইবার পর ১৯৩০ সালে ১৫ জন বিচারক লইয়া স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। বিচারকদের কার্যকাল ছিল নয় বৎসর। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা করা, আন্তর্জাতিক দায়িত্বভঙ্গের বিচার এবং সেই দায়িত্ব ভঙ্গের দরুণ প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল এই আন্তর্জাতিক আদালতের কাজ।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত

জাতিপুঞ্জের সব সদস্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সদস্য ছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সর্বত্রই যাহাতে একই ধরণের শ্রম-আইন প্রস্তুত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা ছিল এই সংস্থার

কাজ। শ্রমিকদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদের কাজের শর্ত নিরূপণ করা ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করার পন্থা খুঁজিয়া বাহির করা ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। অবশ্য শ্রমিক-সংস্থা যে সকল প্রস্তাব প্রদান করিত সেইগুলি গ্রহণ করা বা না করা ছিল সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছাধীন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা

উপরোক্ত দুইটি সংস্থা ছাড়াও জাতিপুঞ্জের অনেকগুলি সহকারী সংস্থা (Auxiliary Organisations) ছিল ; সেইগুলি হইতেছে,—(১) অর্থ নৈতিক ও মূলধন বিষয়ক সমিতি (Economic and Financial Organisation): ইহার মুখ্য কাজ ছিল বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের, বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনৈতিক বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করা ; (২) যানবাহন ও চলাচল সংক্রান্ত সমিতি (Organisation for Communication and Transit)—আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেইদিকে ইহা লক্ষ্য রাখিতে ; (৩) স্বাস্থ্য সংস্থা (Health Organisation)—সদস্য-রাষ্ট্র সমূহের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে পর্যালোচনা করা, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দূর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রভৃতি ছিল এই সংস্থার কাজ।

বিভিন্ন সরকারী সংস্থা

এই সহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও জাতিসংঘের কতিপয় উপদেষ্টা কমিটি ছিল, যেমন, নিরস্ত্রীকরণ কমিটি (Disarmament Committee), ভারপ্রদান কমিটি (Mandates Committee), (এই কমিটি অনগ্রসর অ-স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলির শাসনভার কোন অগ্রসর রাষ্ট্রকে প্রদান করিত), সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য সম্পর্কিত কমিটি (Social and Humanitarian Activities Committee) এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা কমিটি (Committee on Intellectual Co-operation)। সাংস্কৃতিক সহযোগিতা কমিটি গঠিত হইল ১৫ জন বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শিল্পী এবং সাহিত্যিককে লইয়া।

উপদেষ্টা কমিটি

মন্তব্য—জাতিপুঞ্জের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে যে কথাটি প্রথম মনে হয় তাহা হইতেছে এই যে ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সুতরাং জাতিপুঞ্জ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল না ; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও বহু পরে জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করায় জাতিপুঞ্জের পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। জার্মানীর নাৎসীবাদ, ইটালীর ফ্যাসীবাদ, জাতিতে জাতিতে রেষারেষির প্রভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদ, পরিষদের নিজের

জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছিল ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই

কর্তব্যে ব্যর্থতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য তৎপরতার অভাব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপুঞ্জের কার্য-কলাপের ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতি জাতিপুঞ্জের বিরূপ মনোভাব, ভার্সাই চুক্তির ত্রুটি, জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সেনাবাহিনী না রাখা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আইনগত সার্বভৌমত্বের ত্রুটি বিচ্যুতিই জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণ। জাতিপুঞ্জের এই ব্যর্থতা শুধু যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নহে; এই ব্যর্থতা ইহাও প্রমাণিত করিয়াছিল যে আন্তরিকতার সহিত সব রাষ্ট্র যদি বিশ্ব-শান্তি বজায় রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত না হয় এবং সব রাষ্ট্রই যদি আন্তর্জাতিকতার পথ ছাড়িয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ বাছিয়া লয়, তবে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ কোনদিনই সুগম হইবে না; আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সদিচ্ছা এবং সৌভ্রাত্রও কোনদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।

রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তুতি

(On Way to Establishing the U.N.O.)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিরোধে জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের জাতির পর্যায়ে উন্নীত হইবার অধিকারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে চার প্রকার স্বাধীনতার কথাও ঘোষণা করেন। এই চারিটি স্বাধীনতা হইল (১) বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression), (২) ধর্মের স্বাধীনতা (Freedom of Religion), (৩) দারিদ্র্য হইতে মুক্তির স্বাধীনতা (Freedom from Poverty) এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তির স্বাধীনতা (Freedom from Fear)। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট আটলান্টিক চুক্তির (Atlantic Treaty) মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মিত্রপক্ষ কেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করেন। আটলান্টিক চুক্তির আটটি দফা (Eight Points) ছিল। সেইগুলি হইতেছে,—(১) আক্রমাত্মক ক্রিয়াকলাপে মিত্রপক্ষের লিপ্ত না হওয়া, (২) জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী কোন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তনশীল হওয়া, (৩) জাতীয় জনসমাজের আশা-আকাংখা অনুযায়ী সরকারের গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত হওয়া, (৪) ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি রাষ্ট্রের সহিত একজাতীয় বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা, (৫) মিত্রপক্ষের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি গড়িয়া তোলা, (৬) নাৎসী জার্মানীর পতনের পর শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আশা পোষণ করা এবং প্রতিটি জাতি

আটলান্টিক চুক্তির আট দফা প্রস্তাব

যাহাতে নিরাপদে টিকিয়া থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করা (৭) শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রতিটি জাতির মানুষ যাহাতে নিঃশংকচিত্তে সমুদ্র ও মহাসাগরে পাড়ি দিতে পারে সেই ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৮) বিশ্বের প্রতিটি জাতি যাহাতে শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিত্যাগ করে সেই পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

শত্রু শক্তিজোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্য ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী মিত্রপক্ষ রাষ্ট্রসংঘ গঠনের জন্য মিলিত হন। তখন এই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুপক্ষকে দ্রুত পরাজিত করিয়া বিশ্ব-শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মিলিত হইয়াছিলেন। মিত্রপক্ষের কোন সদস্যই পুনরায় জাতিপুঞ্জকে পুনরুজ্জীবিত করার সমর্থক ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাম্বারটন্‌ওকস্ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের (তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চীন) প্রতিনিধিগণের নিকট একটি নূতন আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ অবসান এবং শান্তিরক্ষার জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া একটি নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) গঠন করিবার কথা বলা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে একটি সেনাবাহিনী রাখিবার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। এই প্রস্তাব শান্তিকামী জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করে। নিরাপত্তা পরিষদে ভোট পদ্ধতি কিভাবে নির্ধারিত হইবে সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা শহরে রুজভেল্ট, চার্চিল এবং ষ্ট্যালিন এক বৈঠকে মিলিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউড্‌সে (Brettonwoods) রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত হয়। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সানফ্রান্সিসকো শহরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের প্রারম্ভিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে ৫১টি সদস্য-রাষ্ট্র একজোটে রাষ্ট্রসংঘের সনদের স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনা

(Preamble to the U. N. Charter)

রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনাটি নিম্নরূপ* :

"আমরা, সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—পর পর দুইটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষের জীবনে যে অকথ্য দুঃখ-কষ্ট

*"We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and, to reaffirm faith in fundamental

নামিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে যাহাতে রক্ষা করা যায় সেইজন্য সচেষ্ট হইব, এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মৌলিক মানবিক অধিকার মানুষের মর্যাদা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সমান অধিকার এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইব, এবং এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করিব যাহাতে ন্যায় এবং মর্যাদার সহিত মানবিক কল্যাণের জন্য যে-কোন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শিত হয়, এবং

বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন ধারণের মানের উন্নতি হয়, এবং

এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতে পারি সেই চেষ্টা করিব, এবং

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে সম্মিলিত হইব, এবং

বিশ্বমানবের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব,

এই সকল উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি,

human rights in the dignity and worth of the human person in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

And for these ends to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

To employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all people,

Have resolved to combine our efforts to accomplish these aims: Accordingly, our respective governments, through representatives assembled in the city of Sanfrancisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the known as the United Nations."

Preamble to the U. N. Charter—Signed at the U. N. Conference on International Organization, Sanfrancisco, California on June 26. 1945.

আমরা যাহারা আমাদের নিজ নিজ জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি এই সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে সম্মিলিত হইয়াছি, রাষ্ট্রসংঘের সনদে পূর্ণ আস্থা পোষণ করি এবং এই কারণেই "রাষ্ট্রসংঘ" নামে আমরা এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলাম।"

রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি (Principles and Purposes of the U N. O.): রাষ্ট্রসংঘ সনদের ১নং এবং ২নং ধারায় রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি সন্নিবেশিত আছে। রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, এবং এই উদ্দেশ্যে শান্তি বিঘ্নিত হইবার সমুদয় আশংকা দূর করিবার জন্য এবং প্রতিরোধ করিবার জন্য, আক্রমণাত্মক কাজ এবং শান্তিভঙ্গকারী ব্যবস্থাসমূহ প্রতিরোধ করিবার জন্য, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য কার্যকরী যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ;

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা

(২) সমান অধিকার এবং জাতিসমূহের আত্মনির্ধারণ নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্তিশীল হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা করা এবং বিশ্বশান্তিকে জোরদার করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ;

জাতি সমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা

(৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা, এবং

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ বিস্তৃত করা

(৪) এই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার সমন্বয় করিবার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করাই হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১নং ধারার যে উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি অর্জন করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিবে বলিয়া সনদে উল্লেখ করা হইয়াছে ;—(১) বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবে।

বিভিন্ন জাতির উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা

(২) রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের সমুদয় অধিকার এবং সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সমুদয় কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) সব সদস্য-রাষ্ট্রই নিজেদের আন্তর্জাতিক বিবাদ এমনভাবে শান্তিপূর্ণ

উপায়ে মীমাংসা করিবে যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিঘ্নিত না হয়।

(৪) সব সদস্য-রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা অথবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে আক্রমণ করা কিংবা আক্রমণের ভয় দেখানো হইতে অথবা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যের বিরোধী এই জাতীয় কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(৫) বর্তমান সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ যাহা কিছু কাজ করিবে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য সব রাষ্ট্রই প্রস্তত থাকিবে, এবং রাষ্ট্রসংঘ যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেই জাতিকে সাহায্য করা হইতে হইতে বিরত থাকিবে।

(৬) যে সমস্ত রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে, তাহারাও যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে সেইদিকে রাষ্ট্রসংঘ লক্ষ্য রাখিবে।

সনদে এমন কোন বিধান নাই যাহা অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। তবে যদি দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করিতেছে, তবে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের গঠন

(Composition of the United Nations Organisation)

রাষ্ট্রসংঘ একটি বিশ্বরাষ্ট্র কিংবা অতি-জাতীয় রাষ্ট্র (Super-national State) নয়। রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই সার্বভৌম। রাষ্ট্রসংঘ হইতেছে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলন কেন্দ্র। রাষ্ট্রসংঘের ছয়টি বিভাগ আছে ; সেই-গুলি হইতেছে, সাধারণ সভা (The General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council,) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council), অছি-পরিষদ (The Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

সাধারণ সভা (The General Assembly) : রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৯ নম্বর হইতে ২২ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলি সাধারণ গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সাধারণ সভার গঠন

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ সভা গঠিত হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের মোট

সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩২ ; বাংলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইলে সদস্য সংখ্যা হইবে ১৩৩। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের এক্তিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অথবা রাষ্ট্রসংঘের কোন বিভাগের ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত এই জাতীয় যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা সাধারণ সভায় চলিতে পারে (১০ নং ধারা)। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ পর্যালোচনা করিতেছে সেই সকল বিষয় ছাড়া যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসাকল্পে সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নিকট এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করিতে পারে (১০নং এবং ১২নং ধারা)। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার নীতিগুলি সাধারণ পরিষদ বিবেচনা করিতে পারে। এই জাতীয় বিবেচনার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ও থাকিতে পারে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারে (১১নং ধারা)। রাষ্ট্রসংঘের কোন সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত হইলে অথবা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার সহিত সম্পর্কিত যে কোন বিষয় লইয়া সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। সনদের ৩৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এইরূপ কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত কোন বিষয় সাধারণ সভার আলোচনার জন্য প্রেরণ করে তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সভার আলোচনা, রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২২ নম্বর ধারার দ্বারা সীমিত। অর্থাৎ, যদি নিরাপত্তা পরিষদ ইতিমধ্যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা অথবা অনুসন্ধান চালায়, তবে, সাধারণ সভা আর এইগুলি লইয়া আলোচনা করে না। কিন্তু যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হইয়া যাইবার আশংকা থাকে, তবে সেই বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। নিরাপত্তা পরিষদ যে বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতেছে সেইগুলি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি লইয়া সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান, আবার যে মুহূর্তে নিরাপত্তা পরিষদ সেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দেয়, সেক্রেটারী জেনারেলও তাহা তৎক্ষণাৎ সাধারণ সভাকে জানাইয়া দেন। যদি তখন সাধারণ সভার অধিবেশন বন্ধ থাকে, তবে সেক্রেটারী জেনারেল সেই মর্মে সব সদস্য-রাষ্ট্রের নিকট বিজ্ঞপ্তি পাঠান।

সাধারণ সভার ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতা

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২৩নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ সভা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমোন্নয়নের জন্য অনুশীলন চালাইতে পারে এবং সুপারিশ প্রদান করিতে পারে। তাহা ছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, জাতি-ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাপারেও অনুশীলন করিবার এবং সুপারিশ প্রদান করিবার অধিকার সাধারণ সভার আছে।

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১২নং ধারার দ্বারা সীমিত থাকিয়া সাধারণ সভা কোন অবস্থার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জাতিসমূহের সাধারণ কল্যাণের জন্য এবং জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করিতে পারে এই প্রকার সুপারিশ প্রদান করিতে পারে।

সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপোর্ট গ্রহণ করে; এই বিবরণীতে সারা বৎসর ধরিয়া নিরাপত্তা পরিষদ কি কি কাজ করিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকে। শুধু নিরাপত্তা পরিষদই নহে, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টও সাধারণ সভা গ্রহণ করে। অছি-পরিষদ যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ সভার মতামত জানিতে চাহে, তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। সাধারণ সভা সমগ্র রাষ্ট্রসংঘের বাজেট অনুমোদন করে এবং রাষ্ট্রসংঘের মোট ব্যয়ে কোন রাষ্ট্রের কত অংশ থাকিবে তাহা নির্ধারণ করে। কোন বিশেষীকৃত সংস্থার বাজেটও সাধারণ সভা বিবেচনা এবং অনুমোদন করে।

সাধারণ সভার ভোট প্রদান পদ্ধতি

সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ সভার উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হওয়া চাই। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন, অছি-পরিষদের সদস্য নির্বাচন, কোন সদস্য-রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা রদ করা, কোন সদস্য-রাষ্ট্রকে বিতাড়িত করা, অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির অধিকার সম্পর্কে অথবা ইহাদের কোন অঞ্চলগুলির বিষয় সমূহের বিচার বিবেচনা করা এবং বাজেট অনুমোদন করা। সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে (যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয় না,—সাধারণ ভাবে ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। যদি কোন সদস্য-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে দেয় টাকা বাকী পড়িয়া যায়, তবে সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সদস্য-রাষ্ট্রকে ভোট প্রদানের জন্য অনুমতি দিতে পারে।

সাধারণ সভার অধিবেশন প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হয়। তাহা ছাড়া, অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইলেও সাধারণ সভার অধিবেশন বসিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণ সভার অধিবেশনের পদ্ধতি সাধারণ সভা নিজেই স্থির করিয়া থাকে এবং প্রতি অধিবেশনের সভাপতি সাধারণ সভাই নির্বাচিত করে। নিজের কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য সাধারণ সভা দরকার হইলে কোন সহকারী সংস্থা গঠন করিতে পারে। অ-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির যে সমস্ত বিষয় সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য পেশ করেন, সাধারণ সভা সেইগুলি বিবেচনা করে।

নিরাপত্তা পরিষদ (**The Security Council**)**:** নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় এগারজন সদস্য লইয়া। এই সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য ; ইহারা হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন।[১] অবশিষ্ট ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কোন রাষ্ট্র অবসর গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবে না। প্রথম নির্বাচনের সময় তিনটি সদস্য-রাষ্ট্র এক বৎসরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন

রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোট আছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের সাতটি সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদনে গৃহীত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে সদস্য-রাষ্ট্রের সরকার নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রতি মাসে বর্ণানুক্রমে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের পদ্ধতি কি হইবে তাহা নিরাপত্তা পরিষদই স্থির করে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবই গৃহীত কিংবা অনুমোদিত হইতে পারে না যদি ইহাতে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির যে কোন একটি ভেটো (veto) প্রয়োগ করে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় না। যদি নিরাপত্তা পরিষদ এমন কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে যাহার সহিত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র জড়িত, তবে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার অধিবেশনে সেই সদস্য-রাষ্ট্রকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ

ভোট প্রদানের পদ্ধতি

১। পূর্বে জাতীয়তাবাদী চীন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৭১ সালে চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ এবং সেইসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে।

যখন কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করে, তখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের কাজ ক্ষমতা

নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কাজ হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং যুদ্ধের সমুদয় সম্ভাবনা দূর করা। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সনদের ৪৭নং ধারায় উল্লিখিত সামরিক কমিটির (Military Staff Committee) সাহায্যে নিরাপত্তা পরিষদ কার্যসূচী প্রস্তুত করে। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতির জন্য যাহাতে রাষ্ট্রেও জনসম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় না হয় এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা যাহাতে বজায় থাকে ও দৃঢ়তর হয় সেইজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে।

নিরাপত্তা পরিষদকে ইহার বাৎসরিক বিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে হয়। সাধারণ সভা কোন বিষয়ে কোন প্রকার সুপারিশ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট পাঠাইলে নিরাপত্তা পরিষদ ইহা বিচার বিবেচনা করিয়া দেখে।

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান

আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানে (Pacific Settlement of Disputes) নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলি প্রথমে আলাপ আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ, বিচার, বিচারবিভাগীয় মীমাংসা, আঞ্চলিক এজেন্সী অথবা আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবে। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব হইতেছে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে অনুরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা। আন্তর্জাতিক কলহের কারণ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের আছে, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অনুসন্ধান করিয়া দেখে, আন্তর্জাতিক কলহের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কতটা বিঘ্নিত হইতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এমন রাষ্ট্রও যে কোন আন্তর্জাতিক কলহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই জাতীয় কলহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিরাপত্তা পরিষদ দিতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কলহের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান জড়িত, তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট প্রেরিত হয়।

কোন জাতি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা

নষ্ট করিতেছে কিনা এবং কোন কাজ আক্রমণাত্মক হইতেছে কিনা তাহা নিরাপত্তা পরিষদ বিচার করিয়া থাকে। এই আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সনদের ৪০নং ধারা অনুযায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে শান্তি বজায় রাখিবার জন্য কতিপয় নীতি অবলম্বন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। যদি যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছে এই প্রকার রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধেও আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ না করে তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ সেই দেশগুলিতে যুদ্ধের নিবৃত্তির জন্য সেনাবাহিনী পাঠাইতে পারে, এবং এই কাজে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক কমিটির (Military Staff Committee) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সামরিক কমিটি গঠিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের প্রতিনিধিদের লইয়া। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদের পরামর্শে রাষ্ট্রসংঘ ভারত-পাক সীমান্তে তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিল। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কঙ্গোয় শান্তি-স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সেনাবাহিনী প্রেরণা করিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ারিং মিশন ইস্রায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাতের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বশান্তি রক্ষার পরিপন্থী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটোপ্রয়োগ করায় ২২ বৎসর যাবৎ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইতে পারে নাই। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হইবার পথেও চীন বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমাবর্ষণ নিরাপত্তা পরিষদে এখনও পর্যন্ত নিন্দিত হয় নাই এবং তাহারও পিছনে রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগ। রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সমতার নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, তাহা যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নাই বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকার দরুন। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভূমিকা চিন্তা করিলে মনে হয় যেন বিশ্বশান্তি রক্ষার সমুদয় দায়িত্ব একমাত্র তাহাদেরই ; ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির এই কর্তৃত্ব কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহা বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘের সনদে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে অথবা অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় যৌথভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যৌথ-প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান আছে। এইজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি গঠিত হইতে পারে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া চুক্তি সংগঠন (S. E. A. T. O.),

আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্টকারী এবং আক্রমণাত্মক কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের নীতি

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন (N. A. T. O.), ওয়ারস শান্তি চুক্তি (Warsaw Peace Pact), মধ্য এশিয়া চুক্তি সংগঠন (CENTO) প্রভৃতি চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিরোধী নহে। অবশ্য এই জাতীয় চুক্তি বিশ্ব-শান্তি রক্ষার কতটা সহায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা এই চুক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) : রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১৮ এবং এই সদস্য-রাষ্ট্রগুলি সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। প্রথম নির্বাচনের সময় ১৮টি নির্বাচিত সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে, ছয়টি নির্বাচিত সদস্য-রাষ্ট্র দুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিলে ইহাদের ক্ষেত্রে নূতন ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র নির্বাচিত হয়। ইহার পর হইতে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক. সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য এবং প্রধান কাজ। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে রাষ্ট্রসমূহের জীবনধারণের উচ্চমান বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ সুগম করা। তাহা ছাড়া. জাতি. ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যাহাতে মানবিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিকেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সচেষ্ট হইতে হয়। এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য ও কাজ

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির সহিত (যেমন, U. N. E. S. C. O., F. A. O., W. H. O., প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। এই সংস্থাগুলির কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করিবার অধিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আছে। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির মর্যাদা যাহাতে বজায় থাকে এবং সেইগুলি যাহাতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘের সনদে করা হইয়াছে; অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্যতম কাজ হইতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে অধিকারগুলি যাহাতে পূর্ণ মর্যাদায় বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা। তাহা ছাড়া, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশনগুলির (Regional Economic

Commissions) ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করাও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের কাজ। বিশ্বব্যাংক-এর (World Bank) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ কতটা সুগম করিতেছে তাহা দেখার দায়িত্বও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের।

অছি-পরিষদ (The Trusteeship Council) :—রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৭৫ হইতে ৯১ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলিতে অছি-পরিষদ সম্পর্কিত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাহারা অছি অঞ্চলের প্রশাসনব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় সেই সকল সদস্য-রাষ্ট্র, অছি-শাসক দেশ এবং মনোনীত সদস্য-রাষ্ট্রগুলি লইয়া অছি-পরিষদ গঠিত। অছি-শাসক দেশ নহে এইরূপ সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যার মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য যে কয়জন সদস্যকে মনোনীত করা প্রয়োজন, তাহাদের সাধারণ সভা মনোনীত করিয়া থাকে।

অছি-ব্যবস্থাধীন অঞ্চলগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা কি ভাবে চলিতেছে সেই সম্পর্কিত সমুদয় রিপোর্ট বিবেচনা করার দায়িত্ব হইতেছে অছি-পরিষদের তাহা ছাড়া, অছি-শাসিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত আবেদন পত্র বিবেচনা করাও অছি-পরিষদের কাজ। অছি-পরিষদ মাঝে মাঝে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে এবং অছি সম্পর্কিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত সেই ব্যবস্থাগুলি অছি-পরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত হয়।

ভোট প্রদান পদ্ধতি

অছি-পরিষদে সব সদস্যেরই একটি করিয়া ভোট থাকে এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যেই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অছি-পরিষদের অধিবেশনে কি নিয়ম অনুসৃত হইবে তাহা অছি-পরিষদ নিজেই স্থির করে। প্রয়োজনবোধে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির উন্নতির জন্য অছি-পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে।

অছি-শাসিত অঞ্চল

সর্বপ্রথম এগারটি অছি-শাসনাধীন অঞ্চল ছিল, এবং সেইগুলির মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল চারিটি, পূর্ব আফ্রিকায় ছিল তিনটি এবং চারিটি ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আটটি অছি অঞ্চল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকায় গোণ্ডাকাট ও ব্রিটিশ টগোল্যাণ্ড সংযুক্ত হইয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহা পূর্বে একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল। ১৯৬৩ সালেও নিউগিনি একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল; পরে ইহা স্বাধীন হয়। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দ্বারা শাসিত যে সকল দেশ এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই, রাষ্ট্রসংঘের সনদে সেই দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাহীন অঞ্চল রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (সনদের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর ধারা)।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice): রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিচার বিভাগ হইতেছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The International Court of Justice)। পূর্বে জাতি-সংঘের অধীনে যে বিচারালয় ছিল তাহাকে বলা হইত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (The Permanent Court of International Justice)। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি পূর্বেকার আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত কর্তৃক অনুসৃত নিয়ম-কানুনের উপর ভিত্তিশীল।

রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এই প্রকার কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে কিনা কিংবা কি কি শর্তে হইতে পারিবে তাহা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা স্থির করিয়া থাকে। রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোন সদস্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া না চলে তবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ বা রায় কিভাবে বাস্তব রূপ পাইতে পারে সেই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশ প্রদান করে কিংবা ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ

শুধু আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করাই নহে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করিতে পারে। যদি কখনও সাধারণ সভা কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আইনগত উপদেশ চাহে, তবে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সেই ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। মনে রাখিতে হইবে যেহেতু রাষ্ট্র সংঘের নব সদস্যই সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেইজন্য কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে যে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারায় এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়।

উপদেষ্টা হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিবেচনা করে। (১) আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা, (২) আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন, (৩) এমন কোন বিষয় যাহা আন্তর্জাতিক আনুগত্যের প্রশ্নে ক্ষতিকারক, (৪) আন্তর্জাতিক চুক্তিভঙ্গে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নয়জন বিচারক উপস্থিত থাকিলে কোরাম হয় এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হইলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট (casting vote প্রদান করিয়া থাকেন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভূমিকা আলোচনা করিলে যে জিনিসটি প্রথমেই মনে হয় তাহা হইতেছে বৃহৎ শক্তিগুলিকে এই বিচারালয়ের অধীনে আনা যায় কিনা। উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমা বর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া মনে করে এবং এইজন্য এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিজস্ব নির্দেশ দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর লইয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ভারত নিজের আভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করিলেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আদালতের কতটা ক্ষমতা আছে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এইজন্য স্যুম্যান (Schuman) বলিয়াছেন, "The great controversies are questions of power admitting of no settlement through the application of law. They can be resolved only by diplomatic bargaining and compromise or by war, and in other way whatever."

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মূল্যায়ন

কিন্তু, আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যারই মীমাংসা করে নাই, তাহা নহে। ইরাণ ও ব্রিটিশ-ইরাণ অয়েল কোম্পানীর বিরোধ, ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে সুয়েজখাল বিরোধ, কচ্ছ লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল।

রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরখানা ও সেক্রেটারী জেনারেল (Secretariat and the Secretary General): রাষ্ট্রসংঘের সনদে দপ্তরখানা একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ কার্যালয় নিউইয়র্ক সহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া জেনেভা, ব্যাংকক, হেগ্, মন্ট্রিল প্রভৃতি স্থানেও রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তরের কতিপয় বিভাগ আছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান বিভাগে প্রায় ১৮০০০ কর্মী কাজ করেন। শুধু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ১৬০০০ কর্মী কাজ করেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের মোট আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ খরচ করা হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে।

রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তরের প্রধান হইতেছেন প্রধান সম্পাদক (Secretary General)। তাঁহার পদমর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘ সনদের ৯৭ নং ধারায় প্রধান সম্পাদককে প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে এবং ৯৯ নং ও ১০০নং ধারায় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে প্রধান সম্পাদক রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার কাজে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের বাৎসরিক

আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইতে চাঁদা আদায় করা ও সেই অর্থের যাহাতে ঠিক ব্যবহার হয় তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রধান সম্পাদকের কাজ। প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন সাধারণ সভা কর্তৃক। প্রধান সম্পাদক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার কাজে রাষ্ট্রসংঘকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার কাজেও প্রধান সম্পাদকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক দাগ হ্যামারশীল্ড কঙ্গো সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাস এক রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের তদানীন্তন প্রধান সম্পাদক উ থান্ট (U. Thant) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং তাঁহারই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আগে পূর্বতন পূর্বপাকিস্তানে যখন পাকিস্তানী জঙ্গীশাসকগণ ব্যাপক গণহত্যা অত্যাচার ও জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল এবং যখন এক কোটি অত্যাচারিত লোক বাংলাদেশ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল তখন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এই ব্যাপক গণহত্যা, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক দর্শকের কাজ করিয়াছিল।

সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

বিশ্বশান্তি রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা (Role of the U. N. in maintaining world peace) : রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যগুলি খুবই মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের যে তৎপরতা, আন্তরিকতা এবং ভূমিকা উচিত ছিল তাহা নাই। আন্তর্জাতিক কলহ, ঠাণ্ডা লড়াই (cold war), বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেষারেষি প্রভৃতি দূর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। তবে অ-রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার পথ আরও সুগম করিতে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষভাবে সফল হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের নীতি হইতেছে সব সদস্যরাষ্ট্রের সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া। অথচ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্যপদ অলংকৃত করিয়া আছে এবং যে কোন প্রস্তাব নিজের পছন্দ অনুযায়ী না হইলে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ, প্রজাতন্ত্রী চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক

রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা

ভেটো প্রয়োগ করার ফলে ২২ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ লাভ করিতে পারে নাই। প্রজাতন্ত্রী চীনের ক্রিয়া-কলাপ হয়ত অনেকেই পছন্দ করেন না, আবার হয়ত কেহ কেহ পছন্দ করেন। কিন্তু এজন্য পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেশটিকে (যাহার লোকসংখ্যা সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী) ইহার সৃষ্টির পরেও ২২ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিলনা। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চীন ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশকে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম দেশ বলিয়া স্বীকার করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ারও কোন যুক্তি ছিলনা। আবার রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লইয়া চীনের বিরোধিতা কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কোনদিনই প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃহৎ পঞ্চশক্তির হাত হইতে ভেটো ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয়। উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা বর্ষণ লইয়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিতর্ক হইতেছে না, কেননা, সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করিবে। অথচ কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল হইতে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোন্ দেশ আক্রমণকারী এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ ভঙ্গকারী, সেই দেশের কি শাস্তি হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ আজ পর্যন্তও কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ, ইরাণ ও ব্রিটেনের মধ্যে তৈল লইয়া বিরোধ, সুয়েজখাল লইয়া মিশরের সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ, কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ আরব ও ইস্রাইলের মধ্যে সংঘাত, রোডেশিয়ায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব এবং কৃষ্ণকায় লোকদের সেই সরকারের উপর অমানুষিক অত্যাচার, প্রভৃতি কোন বিষয়ের সমাধানেই রাষ্ট্রসংঘ এমন কোন নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারে নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘের হাতে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া বিশ্বের সব রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসংঘের নিদারুণ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইয়াছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গণহত্যা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, নারীর উপর অত্যাচার চালাইয়াছিল এবং জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়া সর্বত্র নিজেদের বর্বরতার চিহ্ন রাখিয়াছিল, তখন রাষ্ট্রসংঘ মানব-অধিকারের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিরীহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে গণহত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করা দূরে থাকুক, একটি প্রতিবাদসূচক উক্তিও করে নাই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণ

পঞ্চশক্তির হাত হইতে ক্ষমতা তুলিয়া না লওয়া পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হইবে না

তান্ত্রিক দেশ এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশও তখন পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘ ইহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু এই জাতীয় কোন ঘটনা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোন বৃহৎ শক্তির দেশে হইত, তবে কি রাষ্ট্রসংঘ চুপ করিয়া থাকিত? এজন্যই বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতার উপর বিশ্বের সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের তৎপরতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নির্ভর করে বৃহৎ শক্তিগুলির তৎপরতা এবং নিষ্ক্রিয়তার উপর, এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর। এইজন্য অরগ্যানস্কি (Organski) তাঁহার "World Politics" বইয়ে বলিয়াছেন, "...It is the policies and interests of the great powers that explain the action or inaction of the United Nations." ভিয়েতনামে অসামরিক জনসাধারণের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণ এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মানবিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা—ইহার কোনটিই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিহত করিতে পারে নাই।

রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতার দিক আলোচনা করিলেও ইহার ভাল দিকটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; আণবিক শক্তির অনেক উন্নয়ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। তবুও আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কোন সম্ভাবনা আছে। অন্ততঃ রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব এইটুকু যে পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতটা সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার অভাব ছিল, তাহা রাষ্ট্রসংঘ অনেকাংশে দূর করিতে পারিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের (League of Nations) সদস্য ছিল না; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও বহু পরে জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক পরিমাণে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছে। পৃথিবী হইতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার যে নূতন স্বাধীন দেশগুলির জন্ম হইতেছে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি যে বর্তমানে নূতন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা রাষ্ট্রসংঘের ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছে। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ দিবসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "With all its defects, with all the failures that we can check up against it, it still represents man's best organized hope to substitute the conference table for the battlefield."

রাষ্ট্রসংঘের কাজের ভাল দিক

রাষ্ট্রসংঘের সাফল্য হইতেছে এই ক্ষেত্রে যে ইহা আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অন্ততঃ বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত হইয়া বসিবার এবং পারস্পরিক অভিযোগগুলি যাচাই করিবার সুযোগ দেয়। তাহাছাড়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সহকারী সংস্থা (The Auxiliary Organs of the U. N. O.) : রাষ্ট্র সংঘের ১৪টি সহকারী সংস্থার নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Association)**—এই সংস্থার কাজ হইতে বিশ্বশান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির সদ্ব্যবহার করা। ১৯৫৭ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(২) **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation)**—এই সংস্থা হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রাচীন সংস্থা। ইহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২৪ ; সম্প্রতি বাংলাদেশও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইবার পূর্বেই এই সংস্থার সদস্য হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে একই প্রকার শ্রম-আইন প্রণয়ন করা এবং বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(৩) **খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation)**—এই সংস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বন সম্পদের সদ্ব্যবহার, ক্ষুধার তাড়না দূরীকরণ, প্রভৃতি কাজে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করে। এই সংস্থার কার্যালয় রোমে অবস্থিত।

(৪) **রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)**—বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি নিষ্ঠা জাগাইয়া তোলা এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে প্যারিসে।

(৫) **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation)**—রাষ্ট্র সংঘের সব সদস্য-রাষ্ট্রই এই সংস্থার সদস্য। এই সংস্থার কাজ হইতেছে বিভিন্ন দেশ হইতে যাহাতে সংক্রামক ব্যধির উচ্ছেদ হয় সেইজন্য চেষ্টা করা ; জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সংস্থা সর্বতোভাবে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করে। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে জেনেভায়।

(৬) **পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক** (International Bank for Reconstruction and Development)—এই সংস্থা সাধারণতঃ বিশ্ব ব্যাংক নামে পরিচিত। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে যে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের সাহায্য করা এবং অনগ্রসর দেশগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য করাই এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য। অনগ্রসর দেশগুলিকে বৈদেশিক মূলধন দিয়া সাহায্য করার ক্ষেত্রে এই ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে। এই ব্যাংকের কার্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট অফ্ কলম্বিয়ার ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

(৭) **আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা** (International Finance Corporation)—এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে; ইহা বিশ্ব ব্যাংকেরই শাখারূপে কাজ করে। এই সংস্থার কাজ হইতেছে অনগ্রসর দেশগুলিতে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে অর্থ সাহায্য করা। এই সংস্থার কার্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

(৮) **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা** (International Development Association)—এই সংস্থাটিও বিশ্ব ব্যাংকের একটি এজেন্সী হিসাবে কাজ করে। অনগ্রসর দেশসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য, বিশেষতঃ, নদী উপত্যকা, জল সরবরাহ ও রাজপথ নির্মাণ, প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য এই সংস্থা হইতে সাহায্য পাওয়া যায়। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে ওয়াশিংটনে।

(৯) **আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা** (International Civil Aviation Organisation)—এই সংস্থার কাজ হইতেছে অসামরিক বিমানের আন্তর্জাতিক চলাচল আরও সহজ ও নিরাপদ করা। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে মণ্ট্রিলে।

(১০) **আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন** (International Postal Union)—আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের প্রধান কাজ হইতেছে সুষ্ঠু ভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ডাক পরিবহনের ব্যবস্থা করা। এই সংস্থার কার্যালয় বার্ণি-তে (Berne) অবস্থিত।

(১১) **আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগ ইউনিয়ন** (International Tele-Communication Union)—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সুষ্ঠু ভাবে বেতার-তরঙ্গ অন্যত্র পাঠাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইতেছে এই সংস্থার। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগণ এই সংস্থারও সদস্য।

(১২) **বিশ্ব আবহ সংস্থা** (World Metereology Organisation)—বিভিন্ন দেশে আবহ তথ্যাদি যাহাতে সহজ উপায়ে এবং দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয় সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকে বিশ্ব আবহ সংস্থা। এই

সংস্থার অন্যতম কাজ হইতেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা উন্নত করা। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

(১৩) **আন্তঃসরকার সমুদ্রযাত্রা উপদেষ্টা সংস্থা** নামে একটি সংস্থায় ১৯৫৯ সাল হইতে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ করা এবং জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাইতেছে। এই সংস্থার কার্যালয় লণ্ডনে অবস্থিত।

(১৪) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শুল্ক চুক্তি** (**General Agreement of Trade and Tariff**)—এই সংস্থার কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার শুল্ক প্রাচীর (tariff barriers) কমাইয়া দিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করা। ৪৪টি দেশ একটি চুক্তির মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার** (**International Monetary Fund**) রাষ্ট্রসংঘের অধীন নয় বলিয়া ইহাকে রাষ্ট্রসংঘের সহকারী সংস্থার তালিকাভুক্ত করা হয় নাই ; এই সংস্থা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। তবে বিশ্ব ব্যাংকের যাহারা সদস্য তাহাদের আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারেরও সদস্য হইতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য নহে, বিশ্বব্যাংকেরও সদস্য নহে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২১। আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতির অবসান করা, এক দেশের মুদ্রার সহিত অপর দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যাহাতে সহজভাবে নিরূপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং অনগ্রসর দেশগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করাই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মুখ্য কাজ। এই সংস্থার প্রধান সদর কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত।]

রাষ্ট্রসংঘের সনদের কি সংশোধন হওয়া উচিত ? (**Should the U. N. Charter be revised ?**)—রাষ্ট্রসংঘ যাহাতে আরও ভালভাবে ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করিতে পারে সেইজন্য ইহার সনদের নিম্নলিখিত সংশোধন হওয়া উচিত,—

কোন রাষ্ট্রেরই স্থায়ী সদস্যপদ থাকা উচিত নহে

(১) নিরাপত্তা পরিষদে কোন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র থাকা উচিত নহে ; এগারটি সদস্য-রাষ্ট্রকেই সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদে কোন রাষ্ট্রেরই ভেটো ক্ষমতা থাকা উচিত নহে

(২) নিরাপত্তা পরিষদে কোন সদস্য-রাষ্ট্রেরই ভেটো ক্ষমতা থাকা উচিত নহে। একান্তই যদি ভেটো ক্ষমতা রাখিতে হয়, তবে ইহার প্রয়োগ খুবই সীমিত করা উচিত। একমাত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করিবার জন্যই

এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত,—এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন করা যাইতে পারে।

(৩) একটি বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক কারণে কোন দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। প্রজাতন্ত্রী চীনকে ২২ বৎসর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। এই প্রকার নিয়ম থাকা উচিত যে যখনই কোন দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এবং সাধারণ সভার একটি বিরাট অংশ সেই দেশকে স্বীকার করিয়া লয় তখনই সেই দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

স্বাধীন সব রাষ্ট্রকেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত

(৪) রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন করিতে হয় হবে ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয় এবং সেই প্রস্তাবটি সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হইতে হয়। ইহার পর প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরিত হয় এবং সেখানে সব স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক ইহা সমর্থিত হইতে হইবে। তবেই রাষ্ট্রসংঘ সনদের কোন বিধান সংশোধিত হইতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন পদ্ধতি

দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের একমত হওয়ার উপর। এই পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একটি রাষ্ট্রও ভেটো প্রয়োগ করে তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদটি সংশোধিত হইতে পারিবে না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা, একটি রাষ্ট্রের একক ইচ্ছার উপর রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন হওয়া বা না-হওয়া নির্ভরশীল থাকা উচিত নহে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া লীগ অব্ নেশনস্ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের গঠনজনিত এবং প্রকৃতিগত কতিপয় ত্রুটি ছিল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি উন্নত রাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না। ইটালী এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে লীগ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই এবং ইহার ব্যর্থতার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও ত্বরান্বিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব্ নেশনস্ ভাঙিয়া যায় এবং ইহার স্থানে রাষ্ট্রসংঘ অথবা "United Nations" স্থাপিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিনের সহযোগিতায়। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন, স্যানফ্রান্সিসকো শহরে রাষ্ট্রসংঘের সনদ গৃহীত হয়। সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য হইল: (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, (২) পররাজ্য আক্রমণ এবং শান্তিভঙ্গের আশংকা দূরীকরণের জন্য

সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা করা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈয়ার করা, (৪) অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবীয় আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা, এবং (৫) ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকার করিয়া সকল জাতিকেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা ও মূল্য সংরক্ষণ এবং জনগণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়া সনদে লেখা আছে।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিভাগগুলি হইতেছে, সাধারণ সভা (General Assembly), নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justic), অছি পরিষদ (Trusteeship Council) এবং দপ্তরখানা (Secretariat)।

(১) সাধারণ সভায় সকল সদস্য-রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় লইয়া ইহারা আলোচনা করিতে পারে।

(২) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা হইতেছে এগার জন। তাহার মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র হইতেছে স্থায়ী সদস্য, যথা—ইংলণ্ড, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। তাহা ছাড়া আরও ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র আছে। সেইগুলি প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পরিষদ সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই সামরিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। এই পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের ভেটো-ক্ষমতা (veto power) আছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে কোন একটি নিরাপত্তা পরিষদের যে কোন প্রস্তাব ভেটো-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে;

(৩) সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ১৯টি সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করে এবং উহা উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ সংস্থা আছে; তন্মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (International Labour Organisation), খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা (Food and Agricultural Organisation) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা (World Health Organisation) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিমূলক সংস্থার (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে বিশ্ব ব্যাংকের (World Bank) ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) অছি-পরিষদের কাজ হইতেছে যে সকল দেশ রাষ্ট্রসংঘের অধীনে আসিবে সেগুলির শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য আন্তর্জাতিক অছি গঠন করা। ইহার উদ্দেশ্য হইল অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করে এবং আইন-সংক্রান্ত বিষয়-গুলির মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ে ১৫ জন বিচারপতি থাকেন।

(৬) সর্বশেষে, রাষ্ট্রসংঘের একটি দপ্তরখানা আছে। একজন প্রধান সচিবের (Secretary General) অধীনে দপ্তরখানার কাজ পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা—বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় রাষ্ট্র-সংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘের বিগত তের বৎসরের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াইতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা

Jenks—A History of Politics.
Joad—Modern Political Theory.
Key, V. O. Jr.—Politics, Parties and Pressure Groups.
Laski—Liberty in the Modern State,
The Danger of Being a Gentleman and Other Essays.
Grammar of Politics.
An Introduction to Politics.
American Presidency.
Parliamentry Government in Great Britain.
Leacock—Elements of Politics.
Lecky—Democracy and Liberty.
Lindsay B. D.—The Modern Democratic State.
Lipson—Great Issues in Politics.
Lloyd—Democracy and Its Rivals.
Locke, John—Two Treatises on Government.
Mabbot—The State and the Citizen.
Mac Iver—The Modern State.
Mac Iver—The Web of Government.
Mac Iver—Society, Its structure and changes.
Mac Iver and Page—Society.
Mayo, Henry B.—An Introduction to Democratic Theory.
Marx—Capital.
Communist Manifesto.
Mill, John Stuart—On Liberty.
Representative Government.
Mukherjee S. L.—Political Philosophy of John Stuart Mill.
Grammar of Politics, a Critique.
Oppenheim—International Law.
Organski—World Politics.
Popper—The Open Society and Its Enemies.
Readings in Recent Political Philosophy.
Ray and Bhattacharjya—Political Theory.
Rousseau—Social Contract.
Russell, Bertrand—Fact and Fiction.
Locke's Political Philosophy.
A History of Western Philosophy.
Sabine—"State" in Selections from the Encyclopædia of the Social Sciences.
A History of Political Theory.

Saltau—An Introduction to Political Science.
Seely—Introduction to Political Science.
Schumpeter—Capitalism, Socialism and Democracy.
Schuman, F. N.—International Politics.
Shaw, Bernard—Ideology and Utopia.
Sidgwick—Elements of Politics.
Spencer—Elements of Politics.
Strong, C. F.—Modern Political Constitutions.
Tagore, Rabindranath—Nationalism.
Treitschke—Politik.
Veuman—The Democratic and Authoritarian State.
Wheare K. C.—Federal Governments.
Wilson, Woodrow—The State.
Willoughby—The Nature of the State.
Zimmern—Nationalism.
The Great Issues of Politics.